কারাগারের রোজনামচা

শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

কারাগারের রোজনামচা

কারাগারের রোজনামচা

শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলা একাডেমি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা

অর্থায়ন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থবছর : ২০১৬-২০১৭ ॥ প্রকাশনা : ৩৩

কারাগারের রোজনামচা ॥ শেখ মুজিবুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৩/মার্চ ২০১৭
বাএ ৫৬০৮
[২০১৬-২০১৭ গসঅবি : ৭]

গ্রন্থস্বত্ব : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০০

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ

প্রকাশক ও কর্মসূচি পরিচালক
মোবারক হোসেন
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমি প্রেসের পক্ষে
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ
৬০/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ-নকশা
তারিক সুজাত

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত পোর্ট্রেট : রাসেল কান্তি দাশ

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

KARAGARER ROJNAMCHA : SHEIKH MUJIBUR RAHMAN [Prison Diary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman] Published by Mobarak Hossain, Director, Research, Compilation, Lexicography and Excyclopedia Division of Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : March 2017.

Price : Tk. 400.00 only. US $ 20

ISBN 984-07-5617-6

ভূ মি কা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিজের জীবনের সব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করেন।

বার বার গ্রেফতার হন তিনি। মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হয়রানি করা হয়। আইয়ুব-মোনায়েম স্বৈরাচারী সরকার একের পর এক মামলা যেমন দেয়, সেই মামলায় কোনো কোনো সময় সাজাও দেয়া হয় তাঁকে। তাঁর জীবনে এমন সময়ও গেছে যখন মামলার সাজা খাটা হয়ে গেছে, তারপরও জেলে বন্দি করে রেখেছে তাঁকে। এমনকি বন্দিখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন নাই, হয় পুনরায় গ্রেফতার হয়ে জেলে গেছেন অথবা রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে।

কারাগারের জীবন

ভাষা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শুরু করেন ১৯৪৮ সালে। ১১ই মার্চ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন এবং গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ তিনি মুক্তি পান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সমগ্র দেশ সফর শুরু করেন। জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রতি জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করে। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই আবার দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির জন্য সফর শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবির প্রতি তিনি সমর্থন জানান এবং তাদের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্দোলনে অংশ নেন। সরকার ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। জুলাই মাসে তিনি মুক্তি পান। এইভাবে কয়েক দফা গ্রেফতার ও মুক্তির পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা শেষে ভুখা মিছিল বের করেন। দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল করতে গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন।

এবারে তাঁকে প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে গ্রেফতার হন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এবারে প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় বন্দি থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটেই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি আবার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে তিনি ১৮ই জুন মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করে তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ১লা মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

তিনি যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন তা বাংলার মানুষের বাঁচার দাবি হিসেবে করেন, সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

একের পর এক দাবি নিয়ে জনগণের অধিকারের কথা বলার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন শহরে আটবার গ্রেফতার হন ও জামিন পান। নারায়ণগঞ্জে সর্বশেষ মিটিং করে ঢাকায় ফিরে এসেই ৮ই মে মধ্য রাতে গ্রেফতার হন। তাঁকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে জীবন কাটাতে হয়। শোষকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য দাবি তুলে ধরেছেন ফলে যখনই জনসভায় বক্তৃতা করেছেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে সরকার।

১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

১৮ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তায় বন্দি করে রাখে।

পাঁচমাস পর ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কাজ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য আসামিদের মুক্তিদানে বাধ্য হয়। কারণ, পূর্ববাংলার জনগণের সর্বাত্মক আন্দোলন এতই উত্তাল হয়ে উঠে যে, তাতে শুধু বিশাল গণঅভ্যুত্থানই না স্বৈরসামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার জনগণের আপোষহীন অকুতোভয় নেতা।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল জয় লাভ করে মেজরিটি পায়। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসক সরকার গঠন করতে দেয় না। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বাংলার মানুষ তাঁর কথায় সাড়া দেয়। তাঁর নির্দেশেই এ দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ মানসিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ২৫শে মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। এই ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং কারাগারে বন্দি করে রাখে। সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হানাদার বাহিনীর এই দমন পীড়ন ও পোড়ামাটি নীতি এবং গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এরই একটি পর্যায়ে আমরা এক মাসে ১৯ বার জায়গা বদল করেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাই নাই, আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, আমার ভাই লে. শেখ জামাল, বোন শেখ রেহানা, ছোট ভাই শেখ রাসেল, আমি ও আমার স্বামী ড. ওয়াজেদকে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হলো।

এক সময়ে পাকিস্তানি হানাদার শাসকগোষ্ঠী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছু স্বাভাবিক চলছে ঘোষণা দিল। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সবই ঠিকঠাক আছে। সমগ্র বিশ্বকেই তারা দেখাতে চাইল যে এই ভূখণ্ডে 'মিসক্রিয়েন্ট'দের তারা দমন করে ফেলেছে আর কোনো সমস্যা নাই, পাকিস্তান 'খতরা' থেকে বের

হয়ে এসেছে, আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করে বাংলাদেশের সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে।

১ম বার খাতাগুলি উদ্ধার

এই সময়ে এক মেজর সাহেব এসে বলল, "বাচ্চা লোগ 'সুকুল' মে যাও" (বাচ্চারা স্কুলে যাও)। ড. ওয়াজেদ পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জিতে চাকরি করতেন বলে তিনি নিয়মিত অফিসে যেতে পারতেন। ফলে বাইরে যাবার কিছু সুযোগ ছিল এবং যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত তাই যুদ্ধের সময়ও কিছু ছাড় পেতো। তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে হতো আর সময়মতো ফিরতে হতো। তবে হানাদার বাহিনী সব সময় নজরদারিতে রাখত।

যাহোক স্কুলে যাবে বাচ্চারা, জামাল, রেহানা আর রাসেল। আমি বললাম বই খাতা কিছুই তো নাই, কী নিয়ে স্কুলে যাবে আর যাবেই বা কীভাবে? জিজ্ঞেস করল বই কোথায়? বললাম, আমাদের বাসায়, আর সে বাসা তো আপনাদের দখলে আছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বাসা।

বলল, "ঠিক হ্যায় হাম লে যায়গে; তোম লোগ কিতাব লে আনা।"

ওরা ঠিক করল জামাল, রেহানা, রাসেলকে নিয়ে যাবে যার যার বই আনতে। আমি বললাম, আমি সাথে যাব। কারণ একা ওদের সাথে আমি আমার ভাইবোনদের ছাড়তে পারি না। তারা রাজি হলো।

আমার মা আমাকে বললেন, "একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক তোর আব্বার লেখা খাতাগুলো যেভাবে পারিস নিয়ে আসিস।" খাতাগুলো মার ঘরে কোথায় রাখা আছে তাও বলে দিলেন। আমাদের সাথে মিলিটারির দুইটা গাড়ি ও ভারী অস্ত্রসহ পাহারাদার গেল।

২৫শে মার্চের পর এই প্রথম বাসায় ঢুকতে পারলাম। সমস্ত বাড়িতে লুটপাটের চিহ্ন, সব আলমারি খোলা, জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। বাথরুমের বেসিন ভাঙা, কাচের টুকরা ছড়ানো, বীভৎস দৃশ্য!

বইয়ের সেলফে কোনো বই নাই। অনেক বই মাটিতে ছড়ানো, সবই ছেঁড়া অথবা লুট হয়েছে। কিছু তো নিতেই হবে। আমরা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাই, পাকিস্তান মিলিটারি আমাদের সাথে সাথে যায়। ভাইবোনদের বললাম, যা পাও বইপত্র হাতে হাতে নিয়ে নেও।

আমি মায়ের কথামতো জায়গায় গেলাম। ড্রেসিং রুমের আলমারির উপর ডান দিকে আব্বার খাতাগুলি রাখা ছিল, খাতা পেলাম কিন্তু সাথে মিলিটারির লোক,

কী করি? যদি দেখার নাম করে নিয়ে নেয় সেই ভয় হলো। যাহোক অন্য বই খাতা কিছু হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে একখানা গায়ে দেবার কাঁথা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেই কাঁথাখানা হাতে নিলাম, তারপর এক ফাঁকে খাতাগুলি ঐ কাঁথায় মুড়িয়ে নিলাম। সাথে দুই একটা বই ম্যাগাজিন পড়েছিল তাও নিলাম।

আমার মায়ের হাতে সাজানো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখে বার বার চোখে পানি আসছিল কিন্তু নিজেকে শক্ত করলাম। খাতাগুলি পেয়েছি এইটুকু বড় সান্ত্বনা। অনেক স্মৃতি মনে আসছিল।

যখন ফিরলাম মায়ের হাতে খাতাগুলি তুলে দিলাম। পাকিস্তানি সেনারা সমস্ত বাড়ি লুটপাট করেছে, তবে রুলটানা এই খাতাগুলিকে গুরুত্ব দেয় নাই বলেই খাতাগুলি পড়েছিল।

আব্বার লেখা এই খাতার উদ্ধার আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধের ফসল। আমার আব্বা যতবার জেলে যেতেন মা খাতা, কলম দিতেন লেখার জন্য। বার বার তাগাদা দিতেন। আমার আব্বা যখন জেল থেকে মুক্তি পেতেন মা সোজা জেল গেটে যেতেন আব্বাকে আনতে আর আব্বার লেখাগুলি যেন আসে তা নিশ্চিত করতেন। সেগুলি অতি যত্নে সংরক্ষণ করতেন।

খাতাগুলি তো পেলাম, কিন্তু কোথায় কীভাবে রাখব?

ঢাকার আরামবাগে আমার ফুফাতো বোন মাখন আপা থাকতেন। তার স্বামী মীর আশরাফ আলী, আব্বার সঙ্গে কোলকাতা থেকেই রাজনীতি করতেন, যেভাবেই হোক তার কাছেই পাঠাবো সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশেষে অনেক কষ্ট করে তার কাছে পাঠালাম। আমার বিশ্বাস তিনি যত্ন করে রাখবেন। কীভাবে যে পাঠিয়েছি সে কথা লিখতে গেলে আর এক ইতিহাস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে পরে লিখব।

আমার ফুফাতো বোন পলিথিন ও ছালার চট দিয়ে খাতাগুলো বেঁধে তার মুরগির ঘরের ভিতরে চালের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কখনও কেউ বুঝতে না পারে। কারণ পাকিস্তানি আর্মি সব সময় হঠাৎ হঠাৎ যে কোনো বাড়ি সার্চ করত। তবে ঐ বাড়ির সুবিধা ছিল যে আরামবাগ গলির ভিতর গাড়ি ঢুকতে পারত না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর সেই খাতাগুলি আমার বোন ও দুলাভাই মায়ের হাতে পৌঁছে দেন। বৃষ্টির পানিতে কিছু নষ্ট হলেও মূল খাতাগুলি মোটামুটি ঠিক ছিল।

২য় বার খাতা উদ্ধার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জীবিত কোনো সদস্য ছিল না সকল সদস্যকেই এই বাড়িতে হত্যা করা হয়েছিল। আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা,

আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও লে. শেখ জামাল, ছোট ভাই শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা ও রোজী, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল, পুলিশের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ১৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর পর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি সরকারি দখলে থাকে।

আমি ও আমার ছোটবোন রেহানা দেশের বাইরে ছিলাম। ৬ বছর বাংলাদেশে ফিরতে পারি নাই। ১৯৮১ সালে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করে আমি অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দেশে ফিরে আসি।

দেশে আসার পর আমাকে বিএনপি সরকার আমাদের এই বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। বাড়ির গেটের সামনে রাস্তার উপর বসে মিলাদ পড়ি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িঘর লুটপাট করে সেনাসদস্যরা। কী দুর্ভাগ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সেনারা জাতির পিতাকে হত্যা করে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আর জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। মে মাসের ৩০ তারিখ জিয়ার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর ১২ই জুন বাড়িটা আমার হাতে হস্তান্তর করে। প্রথমে ঢুকতে পা থেমে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন হুঁশ হয়, আমাকে দিয়ে অনেকগুলি কাগজ সই করায়। কী দিয়েছে জানি না যখন আমার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার মনে পড়ে আব্বার লেখা খাতার কথা, আমি হেঁটে আব্বার শোবার ঘরে ঢুকি। ড্রেসিং রুমে রাখা আলমারির দক্ষিণ দিকে হাত বাড়াই। ধূলিধূসর বাড়ি। মাকড়সার জালে ভরা তার মাঝেই খুঁজে পাই অনেক আকাঙ্ক্ষিত রুলটানা খাতাগুলি।

আমি শুধু খাতাগুলি হাতে তুলে নিই। আব্বার লেখা ডায়েরি, মায়ের বাজার ও সংসার খরচের হিসাবের খাতা।

আব্বার লেখাগুলি পেয়েছিলাম এটাই আমার সব থেকে বড় পাওয়া, সব হারাবার ব্যথা বুকে নিয়ে এই বাড়িতে একমাত্র পাওয়া ছিল এই খাতাগুলি। খুলনায় চাচির বাসায় খাতাগুলি রেখে আসি, চাচির ভাই রবি মামাকে দায়িত্ব দেই, কারণ ঢাকায় আমার কোনো থাকার জায়গা ছিল না, কখনো ছোট ফুফুর বাসা, কখনো মেজো ফুফুর বাসায় থাকতাম।

লেখাগুলি প্রকাশ করার কাজ শুরু

খাতাগুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। ড. এনায়েতুর রহিমের সঙ্গে আমি ও বেবী বই নিয়ে কাজ করতে শুরু করি, তিনি আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তাঁর পরামর্শমতো কাজ করি।

খাতাগুলি জেরোক্স কপি করে ও ফটোকপি করে একসেট রেহানার কাছে রাখি। বেবী টাইপ করানোর দায়িত্ব নেয়।

ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জয়েস রহিম অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি সবগুলি খাতা অনুবাদ করে দেন।

কিন্তু ২০০২ সালে তিনি হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের কাজ থেমে যায়।

এরপর ঐতিহাসিক প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন সাহেবের পরামর্শে কাজ শুরু করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন, বাংলা একাডেমির শামসুজ্জামান খান, বেবী মওদুদ ও আমি বসে কাজ শুরু করি। নিনু বাংলায় কম্পিউটার টাইপ করে দেয়, রহমান (রমা) কে দিয়ে ফটোকপি করার কাজ করি। বাড়িতেই আলাদা ফটোকপি মেশিন ক্রয় করি।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেয়া হয় এবং আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে। ২০০৮ পর্যন্ত বন্দি ছিলাম। আমি বন্দি থাকা অবস্থায় প্রফেসর ড. হারুন মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর পেয়ে আমি খুব দুঃখ পাই এবং চিন্তায় পড়ে যাই যে কীভাবে আব্বার বইগুলো শেষ করব। জেলখানায় বসেই আমি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ভূমিকাটা লিখে রাখি। ২০০৮ সালে মুক্তি পেয়ে আবার আমরা বই প্রকাশের কাজে মনোনিবেশ করি।

এই খাতাগুলির মধ্য থেকে ইতিমধ্যে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশ করা হয়েছে। সেই খাতাগুলি ফেরত পাবার ঘটনা আমি ঐ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছি।

এরপর আমরা আব্বার ডায়েরি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, স্মৃতিকথা এবং চীন ভ্রমণ নিয়ে কাজ শুরু করি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উপর প্রফেসর এনায়েতুর রহিম সাহেব বেশ কিছু গবেষণা করে যান এবং সেটাও প্রকাশের জন্য আমরা কাজ করতে থাকি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০১৩ সালে বেবী মওদুদ মৃত্যুবরণ করেন। আমি বড় একা হয়ে যাই। যাহোক বেবী বেঁচে থাকতেই আমরা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* যেটা ড. ফকরুল ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন সেটা আমরা প্রকাশ করেছি। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আমরা ১৯৬৬ সাল

থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ করবার প্রস্তুতি নিয়েছি। অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন।

'কারাগারের রোজনামচা'

বর্তমান বইটার নাম ছোট বোন রেহানা রেখেছে–'কারাগারের রোজনামচা'। এতটা বছর বুকে আগলে রেখেছি যে অমূল্য সম্পদ–আজ তা তুলে দিলাম বাংলার জনগণের হাতে।

ড. ফকরুল আলমের অনুবাদ করে দেওয়া ইংরেজি সংস্করণের কাজ এখনও চলছে।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেবার পর বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। সেই সময়ে কারাগারে প্রতিদিনের ডায়েরি লেখা শুরু করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখাগুলি এই বইয়ে প্রকাশ করা হলো।

একই সাথে আর একটি খাতা খুঁজে পাই–তারও ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১২ই অক্টোবর আব্বাকে গ্রেফতার এবং তাঁর রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান তখন তাঁর লেখা খাতাগুলির মধ্যে দুইখানা খাতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই খাতাটা তার মধ্যে একখানা, যা আমি ২০১৪ সালে খুঁজে পেয়েছি। SB'র কাছ থেকে পাওয়া এই খাতাটা। S. B. (Special Branch) এর অফিসাররা খুবই কষ্ট করে খাতাখানা খুঁজে দিয়েছেন, তাই তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই খাতাটা আরও আগের লেখা। সেই বন্দি থাকা অবস্থায় এই খাতাটায় তিনি জেলখানার ভিতরে অনেক কথা লিখেছিলেন। এই লেখার একটা নামও তিনি দিয়েছিলেন :

থালা বাটি কম্বল
জেলখানার সম্বল।

এই লেখার মধ্য দিয়ে কারাগারের রোজনামচা পড়ার সময় জেলখানা সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা হবে। আর এই লেখা থেকে জেলের জীবনযাপন এবং কয়েদিদের অনেক অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল সেসব কথা জানা যাবে।

জেলখানায় সেই যুগে অনেক শব্দ ব্যবহার হতো। এখন অবশ্য সেসব অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারপরও মানুষ জানতে পারবে বহু অজানা কাহিনি।

৬ দফা দাবি পেশ করে যে প্রচার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন সেই সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তাঁর গ্রেফতারের পর তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্র-পত্রিকার অবস্থা, শাসকদের নির্যাতন, ৬ দফা বাদ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। মানুষের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম তিনি করেছেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন।

বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না।

ধাপে ধাপে মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। উজ্জীবিত করেছেন।

৬ দফা ছিল সেই মুক্তি সনদ, সংগ্রামের পথ বেয়ে যা এক দফায় পরিণত হয়েছিল, সেই এক দফা স্বাধীনতা। অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিকল্পনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠী হয়তো কিছুটা ধারণা করেছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

৬ দফাকে বাদ দিয়ে কারা ৮ দফা করে আন্দোলন ভিন্নখাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, সে কাহিনিও এই লেখায় পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর শরীর যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যেত তিনি সে কথা আমাদের কখনো জানতে দেন নাই। আমি এই ডায়েরিটা পড়বার পর অনেক অজানা কথা জানার সুযোগ পেয়েছি। ভীষণ কষ্ট হয় যখন দেখি অসুস্থ–সেবা করার কেউ নেই, কারাগারে একাকী বন্দি অর্থাৎ Solitary confinement. কখনো কোনো বন্দিকে এক সপ্তাহের বেশি একাকী রাখতে পারে না। যদি কেউ কোনো শাস্তি পায়, সেই শাস্তি হিসেবে এই এক সপ্তাহ রাখতে পারে। কিন্তু বিনা বিচারেই তাঁকে একাকী কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি বাংলার মানুষের অধিকারের কথা বার বার বলেছেন।

বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন।

গাছপালা, পশু-পাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ মুরগিটার মৃত্যু তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছে সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন অতি চমৎকারভাবে।

কারাগারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ–দলের প্রতিটি সদস্যকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, তাদের কল্যাণে কত চিন্তিত থাকতেন সেকথাও অকাতরে বলেছেন। তিনি নিজের কষ্টের কথা সেখানে বলেন নাই। শুধু একাকী থাকার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

জেলখানায় পাগলা গারদ আছে তার কাছেরই সেলে তাঁকে বন্দি রাখা হয়েছিল। সেই পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন। এদের কারণে রাতের পর রাত ঘুমাতে পারতেন না। কষ্ট হতো কিন্তু নিজের কথা না বলে তাদের দুঃখের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মানবদরদি নেতা ছাড়া বোধহয় এই বর্ণনা দেওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কী অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চলত তা তিনি বুঝতেন, কিন্তু আমার মায়ের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। আমার দাদা-দাদি সময় সময় ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এই লেখায় পাওয়া যায়। যত বয়সই হোক আর যত বড় নেতাই তিনি হন, তিনি যে বাবা মায়ের আদরের 'খোকা' সে কথাটা আমরা উপলব্ধি করি যখন তিনি বাবা মায়ের কথা লিখেছেন। গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পিতা-মাতার প্রতি প্রদর্শন খুব কম লোক দেখাতে পারেন। তার উপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে জেল থেকে বের হয়ে বাবা মাকে দেখতে পারবেন কিনা, কারণ তাদের বয়স হয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে দেশ ও দেশের মানুষ ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। আর এই দায়িত্ব পালনে পরিবারের সমর্থন সবসময় তিনি পেয়েছেন। এত আত্মত্যাগ করেছেন বলেই তো আজ পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতি একটা রাষ্ট্র পেয়েছে। এই তুলনাহীন অর্জনের জন্যেই তিনি আজ এই জাতির পিতা। জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় পেয়েছে। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। একাকী একটা ঘরে দীর্ঘদিন বন্দি থাকেন। একটা ঘর গাঢ় লাল রঙের মোটা পর্দা, কাচে লাল রং করা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালানো থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন বন্দি থাকতে হয়েছে। এটাও চরম অত্যাচার, যা দিনের পর দিন তাঁর উপর করা হয়েছিল।

পাঁচ মাস পর একখানা খাতা পান লেখার জন্য। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে তাঁকে এমনভাবে একটি ঘরে বন্দি করে রেখেছিল যে রাত কি দিন তাও বুঝতে পারতেন না ও দিন তারিখ ঠিক করতে পারতেন না। তাই এই খাতায় কোনো দিন তারিখ দিয়ে তিনি লেখেননি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা নিয়ে যাবার বর্ণনা। বন্দিখানার কিছু কথা তিনি লিখেছেন, বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছিল যে মামলায় অভিযোগ ছিল তিনি সশস্ত্র বিপ্লব করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন–এতে আরও ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাকেও জড়িত করা হয়েছিল।

সেই সময় বন্দি অবস্থায় যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো অর্থাৎ ইন্টারোগেশন করা হতো সে কথাও লিখেছেন। এই কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। জনগণের জন্যই সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন। মনের জোর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাঁকে এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছিলেন।

প্রথম খাতাটা ১৯৬৬ সালে লেখা। আর দ্বিতীয়টা ১৯৬৭ সালে লেখা। এই সাথে আর কয়েকটি খাতায় ঐ সময়ের কথা লেখা ছিল সেগুলি সব ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর ঘরের বাইরে কোর্টে নিয়ে যেত। কাঠগড়ায় সকল আসামিকে দেখতে পেয়েছিলেন। সকলের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থাকতে পারতেন। পরিবারের সদস্য কতজন যেতে পারবে সে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে পাশ দেয়া হতো। যারা পাশ পেতো তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোর্টে যেতে পারতো। কারণ কোর্ট ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই বসতো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে খাতা দেওয়া হতো তার পাতাগুলি গুনে নাম্বার লিখে দিতো। প্রতিটি খাতা সেন্সর করে কর্তৃপক্ষের সই ও সিল দিয়ে দিত।

এই লেখাগুলি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির ডিজি সার্বক্ষণিক কষ্ট করেছেন। বার বার লেখাগুলো পড়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন বার বার সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর পরামর্শ আমার জন্য অতি মূল্যবান ছিল। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বাংলা একাডেমিকেই বইটি ছাপানোর জন্য দেয়া হয়েছে। সেলিমা, শাকিল, অভি সর্বক্ষণ সহায়তা করেছে। তাদের সহযোগিতায় কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইয়ের মূল প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে ছাপানো পর্যন্ত যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঠকদের হাতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই ডায়েরির লেখাগুলি যে তুলে দিতে পেরেছি তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথপ্রদর্শক। ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই *কারাগারের রোজনামচা* বই থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ডায়েরি পড়ার সময় চোখের পানি বাধ মানে না। রেহানা, বেবী ও আমি চোখের পানিতে ভেসে কাজ করেছি। আজ বেবী নেই তার কথা বার বার মনে পড়ছে। বাংলা কম্পিউটার টাইপ করে নিনু আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে কাজ করেছে তার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিনু যখন টাইপ করেছে তারও চোখের পানি সে ধরে রাখতে পারেনি। অনেকসময় কম্পিউটারের কী বোর্ড তার চোখের পানিতে সিক্ত হয়েছে। আমরা যারাই কাজ করেছি কেউ আমরা চোখের পানি না ফেলে পারিনি।

তাঁর জীবনের এত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। এ ডায়েরি পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার উৎস খুঁজে পাবে।

আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধে আব্বা লিখতে শুরু করেন। যতবার জেলে গেছেন আমার মা খাতা কিনে জেলে পৌঁছে দিতেন, আবার যখন মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে নিজে সযত্নে রেখে দিতেন। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা যদি না থাকত তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে পারতাম না। বার বার মায়ের কথাই মনে পড়ছে।

শেখ হাসিনা
২৫শে জানুয়ারি ২০১৭

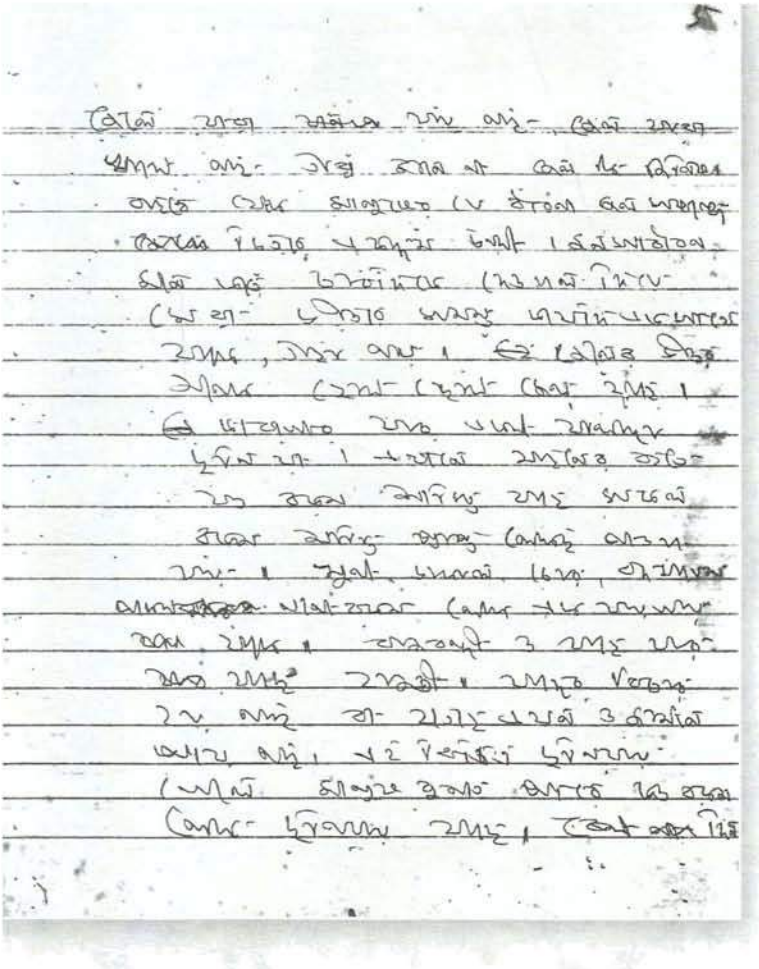

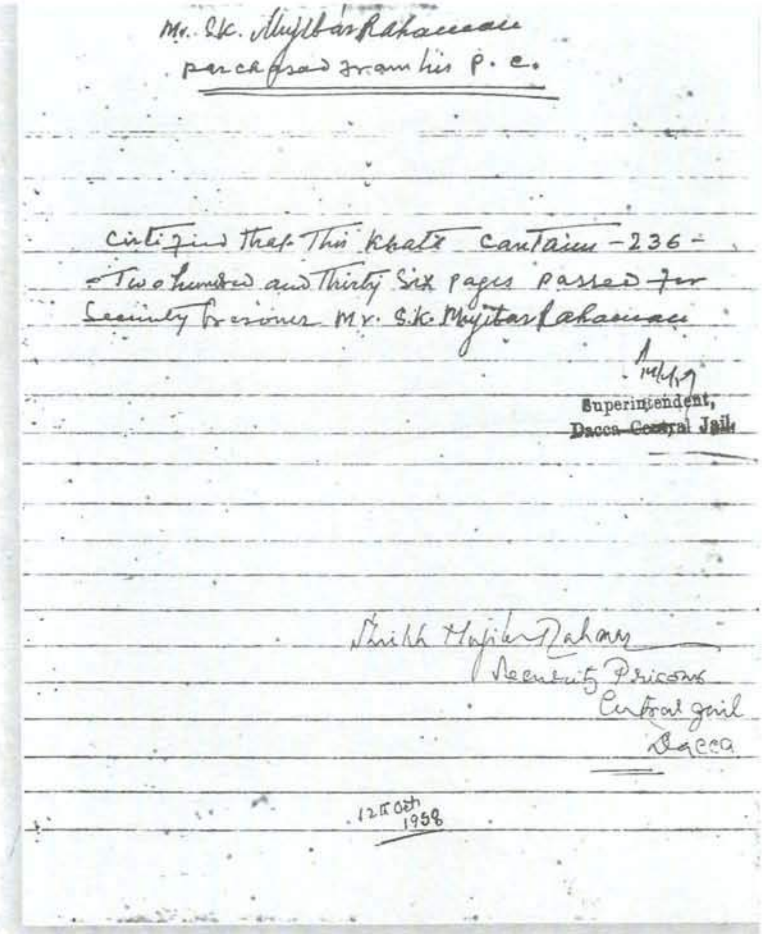

Mr. Sk. Mujibar Rahaman
purchased from his P. C.

Certified that this khata contains -236-
Two hundred and Thirty Six pages passed for
Security Prisoner Mr. S.K. Mujibar Rahaman

Superintendent,
Dacca Central Jail

Sheikh Mujibur Rahman
Security Prisoner
Central Jail
Dacca

12th Oct
1958

২/৬/৬৬

[illegible]

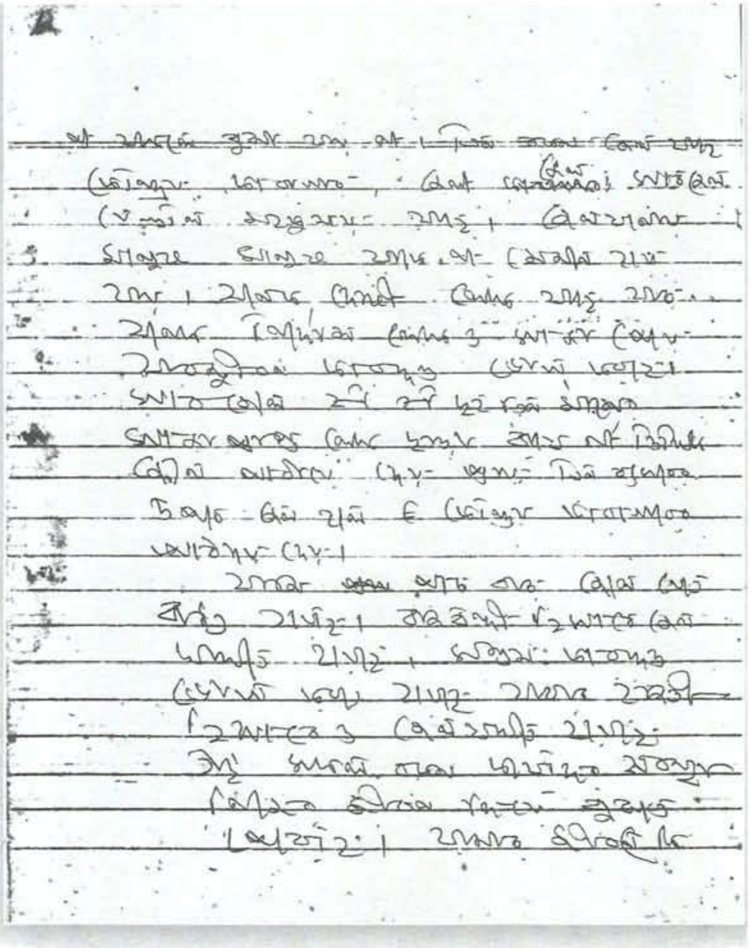

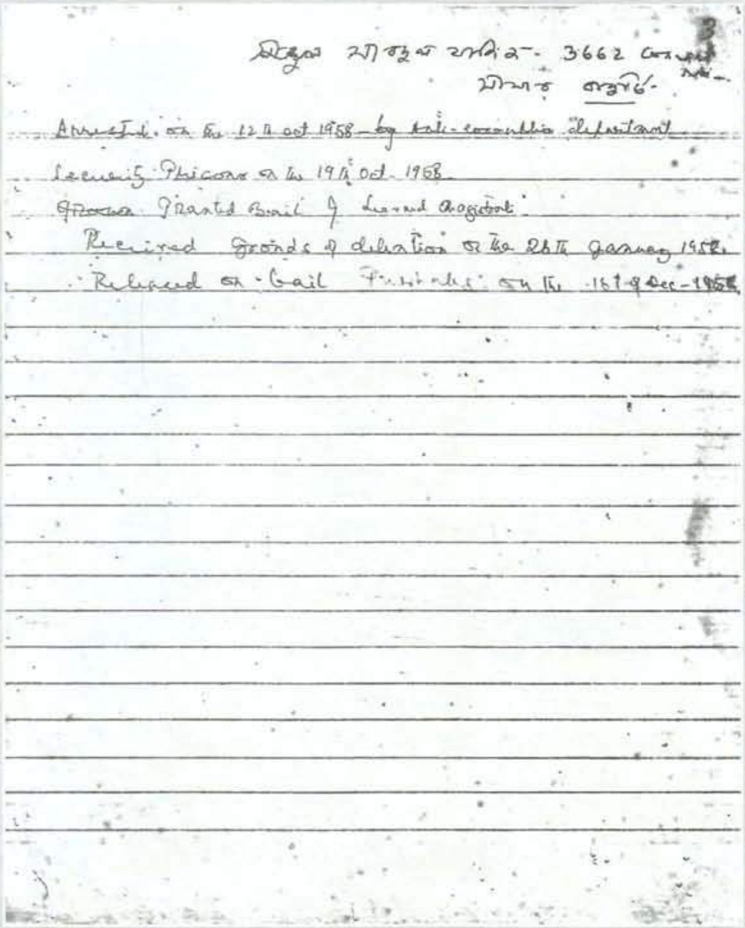
3662

Arrested on the 12th Oct 1958 by [illegible] department.
Security Prisoner on the 19th Oct 1958.
[illegible] Granted Bail by Learned Magistrate.
Received Grounds of detention on the 28th January 1958.
Released on Bail [illegible] on the [illegible] Dec 1958.

[illegible]

১৭।৭।৬৬

[illegible]

[illegible]

26/6/66

[illegible]

“৮ই ফেব্রুয়ারি ২ বৎসরের ছেলেটা এসে বলে, “আব্বা বালি চলো” । কি উত্তর ওকে আমি দিব । ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ওতো বোঝে না আমি কারাবন্দি । ওকে বললাম, “তোমার মার বাড়ি তুমি যাও । আমি আমার বাড়ি থাকি । আবার আমাকে দেখতে এসো ।” ও কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে!

দুঃখ আমার লেগেছে । শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা । অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে । কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখে নাই । তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে ।”

“থালা বাটি কম্বল
জেলখানার সম্বল”

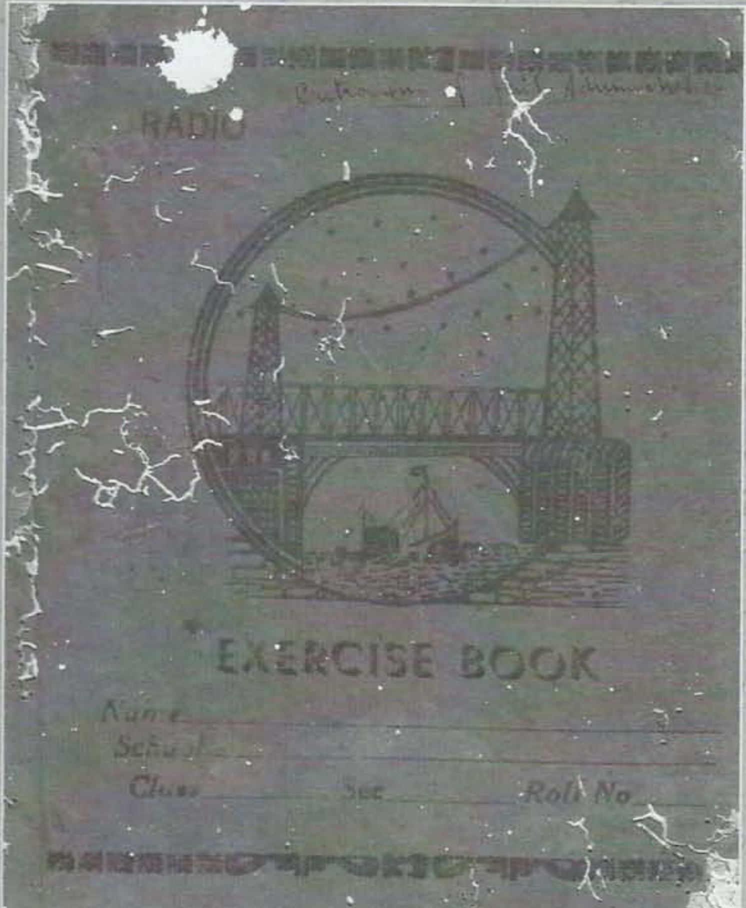

জেলের ভিতর
অনেক ছোট ছোট
জেল আছে।

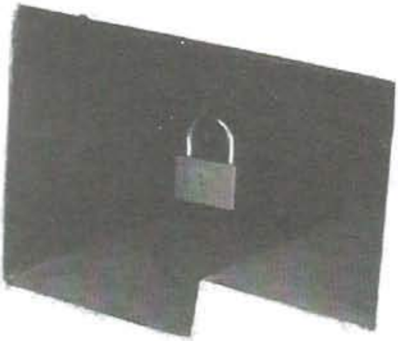

জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই—তারা জানে না জেল কি জিনিস। বাইরে থেকে মানুষের যে ধারণা জেল সম্বন্ধে ভিতরে তার একদম উল্টা। জনসাধারণ মনে করে চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, ভিতরে সমস্ত কয়েদি এক সাথে থাকে, তাহা নয়। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে।

কারাগার যার একটা আলাদা দুনিয়া। এখানে আইনের বইতে যত রকম শাস্তি আছে সকল রকম শাস্তিপ্রাপ্ত লোকই পাওয়া যায়। খুনি, ডাকাত, চোর, বদমায়েশ, পাগল—নানা রকম লোক এক জায়গায় থাকে। রাজবন্দিও আছে। আর আছে হাজতি—যাদের বিচার হয় নাই বা হতেছে, এখনও জামিন পায় নাই। এই বিচিত্র দুনিয়ায় গেলে মানুষ বুঝতে পারে কত রকম লোক দুনিয়ায় আছে। বেশিদিন না থাকলে বোঝা যায় না। তিন রকম জেল আছে। কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা জেল, আর সাবজেল—যেগুলি মহকুমায় আছে। জেলখানায় মানুষ, মানুষ থাকে না—মেশিন হয়ে যায়। অনেক দোষী লোক আছে; আর অনেক নির্দোষ লোকও সাজা পেয়ে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। সাবজেল দুইতিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত লোক ছাড়া রাখে না। ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় তিন বছরের উপর জেল হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাইয়া দেয়।

আমি পাঁচবার জেলে যেতে বাধ্য হয়েছি। রাজবন্দি হিসেবে জেল খেটেছি, সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে। আবার হাজতি হিসেবেও জেল খাটতে হয়েছে। তাই সকল রকম কয়েদির অবস্থা নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছি। আমার জীবনে কি ঘটেছে তা লিখতে চাই না, তবে জেলে কয়েদিরা কিভাবে তাদের দিন কাটায়, সেইটাই আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি, 'জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে'। জেলের কাজ কয়েদিরাই বেশি করে; অফিসারদের সাহায্য করে, আলাদা আলাদা এরিয়া আছে। হাজতিরা এক জায়গায় থাকে। সেখান থেকে তারা বের হতে পারে না। রাজবন্দিরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে। সেখান থেকে তারা বের হতে পারে না। কয়েদিদের জন্য আলাদা জায়গা আছে, ছোট ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যেই থাকতে হয়। আর একটা এরিয়া আছে যাকে বলা হয় সেল এরিয়া। যেখানে জেলের মধ্যে অন্যায় করলে সাজা দিয়ে সেলে বন্ধ করে রাখা হয়। আবার অনেক সেলে একরারীদের রাখা হয়। সেল অনেক রকমের আছে—পরে আলোচনা করব।

কয়েদিদের গুনতি দিতে দিতে অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। সকালে একবার গণনা করা হয়, লাইন বেঁধে বসিয়ে গণনা করে। জমাদাররা যখন সকালে

দরজা খোলে তখন একবার, আবার দরজা খোলার পরে একবার, ১১টার সময় একবার, সাড়ে ১২টায় একবার, বিকালে একবার; আবার সন্ধ্যায় তালাবন্ধ করার সময় একবার। প্রত্যেকবারই কয়েদিদের জোড়া জোড়া করে বসতে হয়। কয়েদিদের জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্ড আছে। কোনো ওয়ার্ডে একশত, কোনোটায় পঞ্চাশ, কোনোটায় পঁচিশ, আবার এক এক সেলে এক একজন, কোনো সেলে তিনজন, চারজন, পাঁচজনকেও বন্ধ করা হয়। তবে এক সেলে কোনোদিন দুইজনকে রাখা হয় না। কারণ, দুইজন থাকলে ব্যভিচার করতে পারে, আর করেও থাকে।

জেলের ভিতর হাসপাতাল আছে, ডাক্তারও আছে। অসুস্থ হলে চিকিৎসাও পায়। কাজ করতে হয়। যার যা কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। যারা লেখাপড়া জানে, তারা অফিসে রাইটারের কাজ করে। কেহ বাগানে, কেহ গুদামে, কেহ ফ্যাক্টরিতে, কেহ সুতা কাটে, কেহ পাক করে, কেহ ঝাড়ু দেয়, আর কেহ মেথরের কাজও করে। যত রকম কাজ সবই কয়েদিদের করতে হয়। সন্ধ্যার পরে কেউই বাইরে থাকতে পারে না। সন্ধ্যায় সকলকেই তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় বাইরে থেকে। ভিতরেই পায়খানা-প্রশ্রাবখানা আছে। সন্ধ্যার পূর্বেই লাইন ধরে বসে খানা শেষ করতে হয়। তালা বন্ধ করে সিপাহিরা বাইরে পাহারা দেয়। ভিতরে থাকে কয়েদিরা। কয়েদিরা যত দিন জেলে থাকে—সন্ধ্যার পরে অন্ধকার হলো, কি চাঁদের আলো, এ খবর খুব কম রাখে।

কয়েদিদের ভিতর আবার প্রমোশনও হয়। কালো পাগড়ি নাইটগার্ড, গেট-পাহারা ইত্যাদি। যে সাজা তাদের দেয়া হয় তার অর্ধেক জেলখাটা হয়ে গেলে তাদের পাহারার কাজ দেয়া হয়। পাহারাদের কালো ব্যাচ পরতে হয়। এরা দরজায় দরজায়, দেয়ালে দেয়ালে, পাহারা দেয়। আবার কেউ কয়েকজন কয়েদির মালিক হয়, এই কয়েদিদের কাজ করায়। সেলে ব্যাজের 'পাহারা' জেলের সকল জায়গায় যেতে পারে। কাউকে ডাকতে হলে, কোনো কয়েদিকে আনার দরকার হলে জমাদার সিপাহিরা এদের পাঠায়। এদের উপর থাকে, 'কনভিক্ট ওভারসিয়ার'—যাদের 'মেট' বলা হয়, এদের কোমরে চামড়ার বেল্ট থাকে। এরাও 'পাহারা'দের মতো কাজ করায়। কয়েকজন কয়েদি—তাদের উপর যে যার মেট থাকে—এদের দেখাশোনা করে। তিনভাগের দুইভাগ সাজা খাটা হলে 'মেট' হতে পারে। এর উপর নাইটগার্ড করা হয়। এরা কোমরে বেল্ট ও সিপাহিদের মতো বাঁশি পায়। দরকার হলে

এরা বাঁশি বাজাতে পারে এবং পাগলা ঘণ্টা দেওয়াতে পারে। যারা রাতে সিপাহিদের সাথে ডিউটি দেয় তাদের খাট-মশারি-বালিশ দেয়া হয়। তারা জেলের ভিতরে সকল জায়গায় ঘুরতে পারে। এর উপরে থাকে কালা পাগড়ি, তাদের কালা পাগড়ি পরতে হয়, এরা কোমরে বেল্ট ও বাঁশি পায়। এদের ক্ষমতা প্রায়ই সিপাহিদের সমান। এরা এক একটা এরিয়ার চার্জে থাকে এবং সেপাই জমাদারদের সাহায্য করে।

যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাদেরই এই 'পাওয়ার' দেয়া হয়। সকলকেই নাইটগার্ড করা বা কালা পাগড়ি দেয়া হয় না। যারা জেলের মধ্যে ভালভাবে থেকেছে, স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হয়, তাদেরই নাইটগার্ড করা হয়। কালা পাগড়ি ও নাইটগার্ডদের বাইরে ডিউটি দেয়া হয়। 'মেট' পাহারা ভেতরে পাহারা দেয়। যেখানে কয়েদিদের বন্ধ করে রাখা হয় সেখানে পাঁচজন করে মেট পাহারা থাকে। তারা দুই ঘণ্টা করে রাতে পাহারা দেয়। বাইরের থেকে সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করে ভেতর থেকে উত্তর দেয়। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে নাম্বার আছে। সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করে আর নম্বর বলে ভেতর থেকে উত্তর দিতে হয়।

যেমন একজন সিপাহি বলল, 'পাঁচ নাম্বার' সাথে সাথে ভেতর থেকে বলতে হবে, ঠিক আছে, পঞ্চাশ জানালা বাড়ি ঠিক। মানে হলো কয়েদি ৫০ জন, আর বাড়ি ঠিক আছে। আবার জানালাও ঠিক আছে। এমনি এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর—এমনি করে রাতভর সিপাহিরা ডাকতে থাকে, যার উত্তর কয়েদি পাহারা ও মেটেরা ভিতর থেকে দিতে থাকে। রাতে দুইঘণ্টা পর পর সিপাহি বদলি হয়ে যখন নতুন সিপাহি আসে, তারা এসে তালা ভালভাবে চারিদিক পরীক্ষা করে দেখে, পূর্বের সিপাহির কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে হয়। সিপাহি বদলির সাথে সাথে আবার ভিতরে পাহারাও বদলি হয়ে পূর্বের পাহারার থেকে কাজ বুঝে নেয়।

কয়েদিরাই কয়েদিদের চালনা করে ও কাজ করায়। কাজ বুঝিয়ে দিতে হয় আবার কাজ বুঝে নিতে হয়। কয়েদিদের ওপর যে অত্যাচার হয় বা মারপিট হয়, তাও কয়েদিরাই করে। ইংরেজের কায়দা, 'কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা হয়'। একটা সত্য ঘটনা না লিখে পারছি না। ঘটনাটা ঢাকা জেলে ঘটেছিল। একজন কয়েদির কয়েকটা চুরি মামলায় কয়েক বছর জেল হয়। চোর বলে গ্রামের লোক ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় এবং জেল দেওয়াইয়া দেয়। গ্রামের লোক কেউই ওকে দেখতে পারতো না। যারা জেল খাটার পরে 'পাহারা' হয় এবং পরে কনভিক্ট ওভারসিয়ার হয়—যাকে মেট বলা হয়, তারা বেল্ট পরতে

পারে। মেট হয়ে যখন কয়েকজন কয়েদির ভার পড়ল ওর ওপরে কাজ করাবার জন্য তখন ওর কথামতো তাদের চলতে হতো। তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে তার স্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখলো। তাতে লিখেছে, 'গ্রামে আমার কথা কেহই শুনতো না, আমাকে সকলে ঘৃণা করত, কিন্তু খোদার মেহেরবানিতে জেলখানায় আমার এত প্রতিপত্তি হয়েছে যে, আমার কথামতো কতগুলি লোককে কাজ করতে হয়। বসতে বললে বসতে হয়, দাঁড়াতে বললে দাঁড়াতে হয়, কথা না শুনলে কোমরের বেল্ট খুলে খুব মার দেই। কারও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ আমাকে খুব সম্মান দিয়েছে। এত বড়ো সম্মান সকলের কিসমতে হয় না। গ্রামের লোক আমাকে চোর বললে কি হবে, জেলে আমি একটা মাতুব্বার শ্রেণীর লোক। চুরি না করলে আর জেলে না আসলে এ সম্মান আমাকে কেউই দিত না। তুমি ভেবো না। এখানে খুব সম্মানের সাথে আছি।' সত্যিই এত বড় সম্মান ও কোনোদিন আশা করতে পারে নাই।

কয়েদিরা চিঠি যখন পাঠায় তখন পরীক্ষা করে দেখা হয় জেল অফিসে। যখন এই চিঠি পরীক্ষা করার জন্য খোলা হলো তখন তো সকলে চিঠি পড়ে হাসতে হাসতে সারা। চিঠি জেলার সাহেব, সুপার সাহেব সকলেই পড়লেন। পরের দিন তাকে হাজির করে তার বেল্টটা কেড়ে নেয়া হলো। তার মাতব্বরী শেষ। এই গল্পটা কোনো এক জেলার সাহেব আমাকে বলেছিলেন।

জেলে কতগুলি কথা ব্যবহার হয় যা বাইরের লোক সহজে বুঝতে পারবে না। আমি যখন প্রথম জেলে আসি তার পরদিন সকালে একজন কয়েদি 'পাহারা' এসে আমার ও আমার সাথী কয়েকজনকে বলল আপনাদের 'কেসটাকোলে' যেতে হবে। আমরা তো ভেবেই অস্থির। বাবা 'কেসটাকোল' কি জিনিস? কোথায় যেতে হবে? বললো ওখানে 'কেসটাকোল' হয়। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে চাই। বললাম চলো, আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো এক জায়গায়। সেখানে জেলসুপার সাহেব এসে নতুন কয়েদিদের সকল কিছু জেনে টিকিটে লিখে নেয়। কয়েদিরা অন্যায় করলে বিচার হয়। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন সুপার সাহেব বললেন, 'আপনারা চলে যান আপনাদের রুমে। আপনাদের ওজন, নামধাম আপনাদের ওখানে যেয়ে লিখে আনবে।' সিপাহি একজন আমাদের পৌঁছাইয়া দিল।

আমাদের সাথে কয়েকজন ডিভিশন কয়েদি ছিল তার মধ্যে শাহাবুদ্দিনকে আমি জানতাম, বাড়ি সিলেট। সিলেট গণভোটে কাজ করত, মুসলিম লীগের

একজন নামকরা কর্মী ছিল। বিখ্যাত কালাবাড়ী খুন মামলায় ২০ বছরের সাজা হয়েছে। শাহাবুদ্দিনের নাম ছিল পি এম শাহাবুদ্দিন। সকলে ঠাট্টা করে বলতো, 'পলেটিক্যাল মারদাঙ্গার শাহাবুদ্দিন'। জেলখানায় অনেকের পিছনে সে লাগতো, কারও ভাল দেখতে পারতো না। তবে লেখাপড়া জানতো। কয়েদিদের কাজ করে দিতো বলে কেহ কিছু বলতো না। শাহাবুদ্দিনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেসটাকোল কিরে ভাই?' ওতো হেসেই অস্থির। আমাকে বলল দেখেনতো, ইংরেজি ডিকশনারিতে আছে নাকি? আমি বললাম জীবনে তো শুনি নাই, থাকতেও পারে। ইংরেজি তো খুব ভাল জানি না। পুরনো ডিভিশন কয়েদিরা সকলেই হাসে। আমি তো আহাম্মক বনে গেলাম, ব্যাপার কী? পরে হাসতে হাসতে বললো, কেস ফাইল, কেস টেবিল, 'কেসটাকোল' না। কয়েদিরা একে এই নাম বলে ডাকে। কেস টেবিলে বিচার হয়। কয়েদিরা অন্যায় করলে শাস্তি পায়। কয়েদিদের অনুরোধ, দাবির কথা শোনে। চিঠিপত্র লেখে। নিজেকে আমি আহাম্মক মনে করেছিলাম। কেস টেবিল থেকে 'কেসটাকোল' নতুন একটা 'ইংরেজি' শব্দ কয়েদিরা জন্ম দিয়েছে। এরকম অনেক শব্দ ও নাম জেলখানায় আছে। পরে লিখব। সেন্ট্রাল জেলে অনেক রকম ডিপার্টমেন্ট আছে। কয়েদিদের ভাগ করে দেয়া হয়। এই ডিপার্টমেন্টকে 'দফা' বলা হয়।

জেলে শব্দকোষের কয়েকটি এ রকম :

রাইটার দফা—যারা লেখাপড়া জানে, অফিসের কাজ করে, চিঠিপত্র লিখে দেয়, হিসাব রাখে, আপীল লিখে দেয়, দরখাস্ত লিখে দেয়, চিঠিপত্র বিলি করে। কয়েদিদের খালাসের সময় হিসেব করে। কতদিন জেলখাটা হলো। হাসপাতালে কাজ করে, ঔষধপত্র হিসেব রাখে। একজন কর্মচারীকে কাজে সাহায্য করার জন্য একজন দুইজন অথবা বেশি রাইটার থাকে। এরা কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করে। মাল গুদামের হিসেব রাখে, কয়েদিদের বেতন ভাগ করে দেয়, বাজার থেকে কি কি কিনতে হবে—তাহাও লিখে কর্মচারীদের দস্তখত নিয়ে কন্ট্রাক্টরদের কাছে পাঠায়। যত গোলমাল, এই রাইটারই বেশি করে।

চৌকি দফা—যেখানে কয়েদিদের পাক (রান্না) হয়। হিন্দু এবং মুসলমানদের আলাদা আলাদাভাবে পাক হয়ে থাকে। এখানে বহু কয়েদি কাজ করে। পানি আনে, মাছ ও তরকারি কোটে, মরিচ বাটে, খাওয়া বিলি করে, যাবতীয় খাওয়ার ব্যাপার এই চৌকি থেকে হয়। বহু লোকের পাক হয়। ডিভিশন

চৌকি আলাদা হয়ে থাকে। ডিভিশন অর্থ হলো যে সমস্ত কয়েদিদের বাইরে অবস্থা ভাল, শিক্ষিত, সম্মানিত জেলে এসে পড়েছে তাদের ডিভিশন দেওয়া হয়। এক কথায় বলতে গেলে এদের উচ্চ শ্রেণী বলা চলে। এদের কনভিক্ট ডিভিশন-২ বলা হয়; ডিভিশন-১ও আছে। যারা হাজতি তারা ডিভিশন-১ পায়। যারা কনভিক্ট তাদের ডিভিশন-২ বলা হয়। আর আছে সাধারণ শ্রেণী যাদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি বলা হয়। ডিভিশন কয়েদিরা জুতা, জামা, খাট, মশারি পায়। আর জেলখানায় একটু মাতব্বরীও বেশি করতে চেষ্টা করে। আর করেও। কারণ প্রায়ই লেখাপড়া জানা ও অবস্থাসম্পন্ন লোক অথবা সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়ে সাজা পেয়ে জেলে এসেছে। এদের পাকও আলাদা হয়। কারণ এরা রোজই মাছ, তরকারি, অন্যান্য জিনিস সাধারণ কয়েদিদের থেকে বেশি পায়। এদেরই এক কথায় সুখী কয়েদি বলা চলে। চৌকি দফায় যারা কাজ করে ও মেট পাহারা যারা থাকে, পরিশ্রম করতে হয় তাদের বেশি। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় না। অনেক কিছু তৈয়ার করে পালাইয়া পালাইয়া খেয়ে থাকে, আর বিক্রিও করে। আশ্চর্য হবেন, বিক্রির ইতিহাস পরে আলোচনা করা যাবে। জেলখানায় পাওয়া যায় না এমন জিনিস খুব অল্পই আছে। তবে মেয়েলোক শুধু পাওয়া যায় না।

জলভরি দফা—বুঝতে বোধহয় কষ্ট হবে না, জলভরি কাকে বলে। কয়েদিদের মধ্যে একটা দফা আছে যারা পানি টানে ও ওয়ার্ডে পানি দেয়। বেশ শক্তিশালী লোক দেখে এই দফা পূরণ করা হয়। সকালে বাঁশের ভিতর দুইটা করে বড় বালতিতে পানি ভরে প্রত্যেক ওয়ার্ডে হাউজ আছে তাতে ভর্তি রাখতে হয়। এদের কষ্ট একটু বেশি, কারণ তিন তলা পর্যন্ত হাউজে পানি তুলতে হয়, সকালে ও বিকালে। যদি কোনো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, দারোগা, পুলিশ, দফাদার কয়েদি হিসাবে জেলে আসে তখন কয়েদিরা এক হয়ে তাদের দিয়ে পানি টানায় এবং নিচের থেকে তিন তলায় পানি টানায়।

ঝাড়ু দফা—এদের কাজ ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার করা। বুড়া বুড়া, অসুস্থ লোক দেখে এখানে দেওয়া হয়। দিনভর গাছের পাতা, সামান্য ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। এরাই সুখী বেশি কারণ কাজ নাই তবে ইদানীং নতুন সুপারেনটেনডেন্ট ঢাকা জেলে আসাতে এদের উপর কাজের চাপ একটু বেশি পড়েছে। কারণ তিনি গাছের পাতা দেখলে কয়েদিদের মেট পাহারাদের দিয়ে সেল বন্ধ করে শাস্তি দেন। তবে কয়েদিরাও চালাক কম না। একদিন বসে আছি হঠাৎ শুনতে পেলাম একজন কয়েদি আর একজন কয়েদিকে বলছে আরে ভাই, 'ঝাড়ু মার ঝাড়ু মার বড় সাহেব আসছে।' আমি

সহজে বুঝতে পারলাম না কেন বড় সাহেবকে ঝাড়ু মারতে চায়। পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ইনি খুব কড়া লোক। তাই কয়েদিরা ঝাড়ু মারে মাটিতে, বলে সুপার সাহেবের নামে। পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

বন্দুক দফা—একটা বিখ্যাত দফা আছে যার নাম কেহই বুঝবেন না, একে বন্দুক দফা বলা হয়। একদল কয়েদি আছে যারা মেথরের কাজ করে। মেথর হলে রোজ মাছ পাওয়া যায়। তেল পাওয়া যায়। আঁটি করে বিড়ি পাওয়া যায়, সাবানও পাওয়া যায়। লোভে পরে অনেকে মেথর দফায় কাজ করে, পায়খানা পরিষ্কার করে। আগে জুলুম করে, মারপিট করে মেথর করতে হতো। সহজে কেহ মেথর হতে চায় না। তাই অত্যাচার করার জন্য কয়েদিদের মধ্য থেকে দালাল ঠিক করে দেওয়া হতো। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বন্দুক দফা কেন বলা হয়? একটা গল্প আছে এর পেছনে। বাঁশ দিয়ে কাঁধে নিয়ে টিনে করে পায়খানার ময়লা দূরে নিয়ে লাল গাড়িতে ফেলতে হয়। তাই টিন ঘাড়ে করে টানতে টানতে দাগ হয়ে যায়। একজন কয়েদি মেথর দফায় কাজ করতে করতে তার কাঁধে দাগ হয়ে যায়। একবার তার ভাইরা তাকে দেখতে এসে কাঁধের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করে দাগ কিসের, তার উত্তরে মেথর কয়েদিটা বলে 'আমি বন্দুক দফায় জেলখানায় কাজ করি, সিপাহি সাহেবদের বন্দুক আমার বহন করে বেড়াতে হয়। তাই দাগ পড়ে গেছে।' সেই হতে এই দফার নাম বন্দুক দফা।

পাগল দফা—জেলখানায় আরেকটা দফার নাম পাগল দফা। জেলখানায় বহু পাগল আছে। এদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা আছে, এদের জন্য সকালে একজন সিপাহি, বিকেলে একজন। কয়েদিদের মধ্য থেকে মেট পাহারা কয়েকজন রাখা হয় এদের দেখাশোনা করার জন্য। অনেক কয়েদি পাগল হয়ে যায়, বেশি দিন জেল জীবন সহ্য করতে পারে না বলে। অনেক কয়েদি আপনজনকে হত্যা করে পাগল হয়ে যায়। এরা ভাল না হওয়া পর্যন্ত বিচার বন্ধ থাকে। ফরিদপুরের এক পুলিশের হাওলাদার তার স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ করে স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারপর সে পাগল হয়ে যায়। আবার অনেকে বাইরে পাগল হয়, আত্মীয় স্বজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নিয়ে জেলে পাঠাইয়া দেয়। অনেকে ভাল হয়, আবার অনেকে বেশি পাগল হয়ে যায়। দুনিয়ায় কত রকমের পাগল আছে জেলে আসলে বোঝা যায়। আমার কপাল ভাল কি মন্দ বলতে পারি না। তবে যেখানে পাগলদের রাখা হয় তার কাছেই আমাকে রাখা হয়েছিল। রাত হলে পাগলের পাগলামি বাড়ে। ৪০ সেলে পাগল রাখা

হয়। এক এক সেলে এক এক জনকে বন্ধ করা হয়। অনেকে চুপচাপ থাকে, আবার অনেকে সারারাত গান গায়—কত রকমের গান ঠিক নাই। যাকে এক কথায় পাগলের গান বলা যায়। মাঝে মাঝে থালা পিটায়, মাঝে মাঝে দরজা ধরে ধাক্কা শুরু করে। আর মাঝে মাঝে দু'একজন রাতভরে গালাগালি করে। কাকে করে বুঝতে পারি না—তবে গালাগালি চালিয়ে যায়।

বহু রাত্রে ঘুমাতে না পেরে ওদের চিৎকারে বিছানায় শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছে আমার। পাগলের উৎকট চিৎকারে কে ঘুমাতে পারে! এক পাগল ছিল, মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেত। যখন ক্ষেপত রাতভর, 'আল্লাহু আকবার' 'জিন্দাবাদ' এই দুই কথাই বলে রাত কাটিয়ে দিত। কেউ কেউ সিপাহিদের ডাকত বিড়ি খেতে, বলত "বাবু ও বাবু এদিকে আসেন"—ডাকতেই থাকত, কিছুক্ষণ ডাকার পরে যদি না আসে তাহলে বাবুর পরিবর্তে মা বোন তুলে গালি দিত। চল্লিশ সেলের দুই ধারে ছোট ছোট কামরা, সিপাহিদের বলে কয়ে ক্ষেপা পাগলদের অন্য পাশে বন্ধ করতে অনুরোধ করতাম। কিন্তু কখন যে কোনোদিকের কে ক্ষেপে উঠে কি করে বসবে তার ঠিক নেই। আজ একজন ঘুমাইয়া ছিল, রাতে আর একজন শুরু করল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে সবগুলিকে এক এক করে নিয়ে যায়, পানির হাউজে গোসল করায়। পাগল সহজে গোসল করতে চায় না, তাই জোর করে পানির ভিতর ফেলে দেয় আর চেপে ধরে। অনেক পাগল আবার চালাক, চুবানোর ভয়ে তাড়াতাড়ি কলের নিচে বসে নিজেই গোসল করে নেয়।

একদিন দাঁড়াইয়া পাগলের গোসল দেখছি। এক পাগলের গোসল হয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাচ্ছে। আর একজন পাগলকে কয়েকজন কয়েদি ধরে এনে গোসল করাচ্ছে। যে পাগলটা আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাচ্ছে সে আমাকে বলে, 'কি দেখেন, এগুলি সব পাগল, খুব পাগলামি করে।' আমি তো হেসেই অস্থির। নিজে যে পাগল তা ভুলে গেছে।

১৯৫৪ সালে জেলে গিয়ে এক পুরানা পাগলের সাথে দেখা হলো। ওকে আমি চিনতাম, কারণ বছরের মধ্যে প্রায় ১১ মাস ভাল থাকে, মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। যখন ভাল থাকে তখন খুব ভাল ভাল কথা বলে। ওদের যখন নিয়ে যাচ্ছে আমি দাঁড়াইয়া দেখছি, দেখি সেই পুরান পাগল। নাম তার কফিলউদ্দিন। জিজ্ঞাসা করলাম 'কি কফিলউদ্দিন কেমন আছো?' বললো, 'ভাল তো আছি, ছাড়ে তো না। আপনারা তো ছাড়ালেন না। আবার বুঝি

আসছেন।' আর কিছু বললাম না। সে চলে গেল। রোজ যখন আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যেতো তখন আমাকে দূর থেকে একটা আদাব করত। কফিলউদ্দিন আজও জেলে আছে—কতকাল থাকতে হয় জানি না। আর একজন ছিল আমাকে দেখলেই ইংরেজি বলতো। পরে খবর নিয়ে জানলাম, স্কুলের মাস্টার ছিল। পাগল হয়ে গেছে।

একদিন জেল গেটে যাচ্ছি আমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। যাবার পথেই ওদের দরজা। এক পাগল দাঁড়াইয়া আছে ওদের দরজায়। আমাকে দেখে বলে, 'কি খবর! সিগারেটগুলি একলাই খান আমাদের দিতে হয় না'। বললাম সিগারেট খাবা, এসে দিব। ফিরে এসে দেখলাম ওদের তালাবন্ধ করে দিয়েছে। ওকে সহজে সেলের বাইরে করে না কারণ খুব শক্তিশালী। ক্ষেপে গেলে মেরে ধরে অস্থির করে দেয়। এক সিপাহি বসে বসে ডিউটি দিতে ছিল। ও আস্তে আস্তে এসে কাছে বসেছে, হঠাৎ সিপাহির হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে সিপাহিকে মারতে শুরু করল। সিপাহির মাথা ফেটে গেল। সিপাহি দৌড় দিয়ে কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করল। পরে অনেক সিপাহি ও কয়েদি এসে ওর কাছ থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। এক ঘন্টা পর্যন্ত ওর কাছে কেউ যেতে পারে নাই। দুই একজন সিপাহি আছে যাদের দেখলে পাগলরা ক্ষেপে যায়। তাই তাদের ডিউটি পাগল খাতায় দেয়া হয় না। পাগলের সঙ্গে রাগ করলে, গালাগালি করলে তারা আরও ক্ষেপে যায়। একমাত্র ঔষধ পানি। যদি বলা যায়, কাল সকালে তোকে পানির ভিতর ফেলে দেব তখনই ভয় পায়। আমি মাঝে মাঝে বিড়ি কিনে পাগলদের দিতাম, বড় খুশি হতো বিড়ি পেলে। এবার দিতে পারি নাই, কারণ আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে বের হওয়া বা কারও সাথে কথা বলা নিষেধ।

শয়তানের কল—আর একটা দফার নাম শয়তানের কল জিজ্ঞাসা করলাম, শয়তানের কল কি? কম্বল ফ্যাক্টরী। ঢাকা জেলে একটা কম্বল ফ্যাক্টরী আছে, ভাল ভাল কম্বল তৈয়ার হয়। বিশেষ করে জেলখানায় কয়েদিদের তিনটা করে কম্বল শীতের দিনে দেওয়া হয়, আর গরমের দিন দুইটা। ঢাকা জেলের কম্বল ফ্যাক্টরী সমস্ত জেলের কয়েদিদের কম্বল সাপ্লাই করে। এখানে কয়েদিদের কাজ করতে হয়। উল, তুলা বাইরে থেকে কিনে আনা হয়। যারা বেশিদিন জেলে আছে তাদেরই এখানে কাজ শেখানো হয়। এরা কম্বল তৈয়ার করে বাইরেও বিক্রি করে। আমি এক কয়েদিকে জিজ্ঞেস করলাম, শয়তানের কল বলো কেন? বলে, হুজুর তুলা যখন ওড়ে তখন আমাদের দিকে চাইলে চিনতে পারবেন না; সমস্ত চুল, মুখ, কাপড় তুলার কণায় ও

ধুলায় ভরে যায়। সন্ধ্যায় গোসল করে তবে আমরা খেতে পারি। সাফ সুতরা হয়ে গোসল না করলে আমাদের চিনতে পারবেন না, মাথা, মুখ, সারা শরীরে তুলা লেগে আমাদের চেহারা শয়তানের মতো হয়ে যায় বলে, শয়তানের কল নাম দেওয়া হয়েছে।

দরজি খাতা—ঢাকা জেলে চাদর, কয়েদিদের কাপড়, মোড়া, টেবিল, চেয়ার, খাট, গদি অনেক কিছুই এখানে তৈয়ার হয়। একজন ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্ট এর চার্জে থাকে। একে কয়েদিরা ডিপটি বলে। দরজি খাতা খুব বড়ো এখান থেকে পুলিশ লাইনেরও পোশাক বানাইয়া দেওয়া হয়।

মুচি খাতা—মুচি খাতা আছে যেখানে জুতা তৈয়ার হয়। তবে একে আরও উন্নত ধরনের করা যায় যদি ভাল মেশিন সাপ্লাই করা হয় এবং কয়েদিদের কিছু বেতন দেয়ার বন্দোবস্ত করা যায়। কয়েদিরা কাজ করতে চায় না, ফাঁকি দেয়—শুধু দিন গোনে। আজ একদিন গেল, কাল দুই দিন—এমনি। যদি এরা বুঝতে পারে বেশি কাজ করলে টাকা পাওয়া যাবে তাহলে বেশি কাজ করত।

অনেক সত্য ঘটনা আমি দিবার চেষ্টা করব—যাতে বুঝতে পারা যাবে, কেমন করে জেলে আসার পরে খাবারের অভাবে স্ত্রী তালাক দেয়া হয়। একটা না, বহু ঘটনা আছে। প্রথম প্রথম জেলে এসে অনেক কথা বুঝতেই আমার কষ্ট হতো, যেমন একদিন এক, 'পাহারা' এসে বলল তার 'সিকম্যান' যেতে হবে। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি, কিছুই বুঝতে পারি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সিকম্যান' কিরে? বলে হুজুর 'সিকম্যান' জানেন না, যেখানে ওষুধ পাওয়া যায়, আমার যেতে হবে ওষুধ আনতে। আর কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, এসব জেলের নিজস্ব ভাষা, আমি বুঝতে পারবো না।

ডিভিশন কয়েদি ছিল বরিশালের বারী সাহেব ও ওহাব সাহেব। আমরা এক সাথেই থাকতাম। বারী সাহেব হাসপাতালে রাইটারের কাজ করতেন আর ওহাব সাহেব ফ্যাক্টরীতে রাইটারের কাজ করতেন। দুইজন খালাতো ভাই। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। প্রায় আট বছর জেলে আছে। জমিজমার ব্যাপারে একটা খুন হয়ে যায়। তার দণ্ড এই জেল। ওহাব সাহেব একটা ছেলে রেখে এসেছে। জোয়ান সুপুরুষ। বিধবা মা ছিলেন, মারা গেছেন জেলে আসার পর। মাত্র স্ত্রী আর ছেলেটা, এক বছরের রেখে আসছে আর দেখা হয় নাই। বারী সাহেবের ছেলেমেয়ে আছে, মেয়েটার বিবাহ হয়েছে জেলে আসার পরে। খুব চিন্তিত থাকেন সকল সময়। কোনো রকমের

কথাবার্তায় উত্তর নাই, গোলমালের ভিতর নাই। চুপচাপ থাকেন। ওহাব সাহেব ভীষণ গোঁয়ার লোক, রাগ হয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এরা যখন কাজ করে ফিরে এলেন তখন, 'সিকম্যানের' কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বারী সাহেব বললেন, 'সিকম্যান' মানে হাসপাতাল, কয়েদিরা সিকম্যান বলে। বুঝলাম ব্যাপারটা।

জেলখানায় হাসপাতাল আছে, পূর্বেই বলেছি। সেন্ট্রাল জেলে, বিশেষ করে ঢাকা জেলে ভাল হাসপাতাল। দোতলা দালান, প্রায় একশ' রোগীর স্থান হতে পারে, তিনজন ডাক্তার আছে, একজন কম্পাউন্ডার, সপ্তাহে দুইবার সিভিল সার্জন আসেন। তারই চার্জে জেল হাসপাতাল। ঔষধ যথেষ্ট থাকে, ডাক্তারের হুকুম মতো যে কোনো খাদ্য কয়েদিদের দিতে বাধ্য। একে 'মেডিকেল ডাইট' বলা হয়। কয়েদিদের ওজন কম হয়ে গেলে ডাক্তাররা 'ডাইট' দিয়ে থাকেন, তবে সকল ডাক্তার না। হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত হয়ে যদি রোগ ভাল না হয়, তবে জেলের মেডিকেল অফিসার ইচ্ছা করলে মেডিকেল কলেজে পাঠাতে পারে। দুঃখের বিষয় কয়েদিদের কপালে ভাল ঔষধ কম জোটে। কারণ ভাল ব্যবহারের ডাক্তার যারা—যারা কয়েদিদেরও মানুষ ভাবে, আর রোগী ভেবে চিকিৎসা করে, তারা বেশিদিন জেলখানায় থাকতে পারে না।

অনেক ডাক্তার দেখেছি এই জেলখানায় যারা কয়েদিদের 'ডাইট' দিতে কৃপণতা করে না, অসুস্থ হলে ভাল ঔষধ দেয়। আবার অনেক ডাক্তার দেখেছি যারা কয়েদিদের কয়েদিই ভাবে, মানুষ ভাবে না, রোগ হলে ঔষধ দিতে চায় না। পকেটে করে ঔষধ বাইরে নিয়ে বিক্রি করে। ঘুষ খায়, চিকিৎসা করার নামে। আবার টাকা পেলে হাজতিদের মাসের পর মাস হাসপাতালে ভর্তি করে রাখে, ব্যারাম নাই যদিও। এভাবে বাইরের থেকে জামিনের চেষ্টা করা যায়। ম্যাজিস্ট্রেট যখন জেলখানায় দেখতে যায় কয়েদিদের অবস্থা, তখন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি দেখায়ে দেয়। এতে জামিন পেয়ে যায়। বাইরে থেকে বিচারাধীন আসামীর কেউ হয়তো কোনো ডাক্তারের সাথে দেখা করে টাকা পয়সা দিয়ে গেছে, বলে গেছে জামিন হলে আরও দেব। যার অসুখ নাই তাকে মাসের পর মাস হাসপাতালে সিট দিয়ে রেখে দিয়েছে, আর যে সত্যিই রোগী তার স্থান নাই। এটা বাইরেও হয়ে থাকে, শুধু জেলে না, তবে এখানে একটু বেশি হয়।

আবার এমন ডাক্তার দেখেছি যারা জেলখানায় পানিও মুখে দেয় না, ঘুষ তো দূরের কথা। রোগীদের ভালভাবে চিকিৎসা করে, রাতদিন পরিশ্রম করে। আবার এমন ডাক্তার জেলে দেখেছি, সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি, নামাজ

পড়তে পড়তে কপালে দাগ পড়ে গেছে—দেখলে মনে হয় একজন ফেরেস্তা। হাসপাতালের দরজা বন্ধ করে কয়েদিরোগীদের ডাইট থেকে ডিম, গোস্ত, রুটি খুব পেট ভরে খান, আর ঔষধও মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে বিক্রি করেন।

হাসপাতালে রোগীদের জন্য আলাদা পাক হয়। এখানটায় হলো খাওয়ার আড্ডা। কয়েদিরা কথা বলতে সাহস পায় না, তাই তাদের মুখের গ্রাস অনেকেই খেয়ে থাকেন। একজন ডাক্তারকে আমি জানতাম, মুখে খুব ভদ্রলোক। আসতে সালাম, যাইতে সালাম, খবর নিয়ে জানলাম তিনি এক প্যাকেট সিগারেটও ঘুষ খান।

জেলে কোনো ঘটনা চাপা থাকে না। যে কোনো ঘটনা জেলখানায় আধা ঘণ্টার ভিতর আড়াইহাজার কয়েদির কানে চলে যাবে।

আমাকে ও মওলানা সাহেবকে মেডিকেল 'ডাইট' বাঁচাইয়া রেখেছিল দ্বিতীয়বার। পরে খবর নিয়ে শুনলাম, নুরুল আমিন সাহেব নাকি জেল সুপারেনটেনডেন্ট সাহেবকে বলে রেখেছিলেন যে আমাদের যেন কোনো খাওয়ার, থাকার কষ্ট না হয়। সেজন্য বোধহয় একটু যত্ন পেয়েছিলাম।

পাকিস্তান হওয়ার পরে রাজবন্দিদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ইংরেজ আমলে ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজবন্দিদের কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতো না। তাদের ব্যবহার করা হতো সাধারণ কয়েদিদের মতো। কাহাকেও তৃতীয় শ্রেণীর মতো ব্যবহার করত, আবার কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর মতো ব্যবহার করত। আইবিদের ইচ্ছা। আমার মনে আছে, এক এমবিবিএস ভদ্রলোক ডাক্তারকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি করে দুই বৎসর রাখা হয়েছিল। আমার এক ভাগ্নে মেডিকেল কলেজে পড়তো যাকে গ্রেপ্তার করে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি করে জেলে রাখা হয়েছিল আমার চোখের সামনে। ওর দিকে আমি চাইতে পারতাম না। দু'একবার জেল পালানো বা জেলের আইন মানে না, মারপিট করে—ডেঞ্জারাস কয়েদিদের রাখা হতো যেখানে সেই জেলে তাকেও রাখা হয়েছিল। আমাকেও দুই-চারবার এই সমস্ত সেলে থাকতে হয়েছে। তাই রাজবন্দিরা মেডিকেল ডাইট না পেলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু সকল সময় তাদের কপালে তা জুটতো না। হাসপাতালে রাজবন্দিদের ভর্তি করলে তাড়াতাড়ি রোগ ভাল হোক আর খারাপ হোক, সেদিকে খেয়াল না করে তাড়াইয়া দেওয়া হতো। ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে কয়েদিদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। যত রকম রোগ আমরা সাধারণ মানুষ জানি তা জেলখানায় আছে। টিবি রোগীকেও রাখার ও চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত জেলের ভেতর করা আছে।

ডাক্তারদের থেকেও বেশি চুরি করে একশ্রেণীর কয়েদি—যারা ডাক্তারদের রাইটার। এরা কম্পাউন্ডারের কাজও করে। জেলখানায় ডাক্তাররা ইনজেকশন দেওয়া ভুলে যায়। কারণ কয়েদিদের দিয়েই অধিকাংশ কাজ করাইয়া থাকে। তবে সকল ডাক্তার না। অনেকে আবার খুব পরিশ্রমও করে রোগীদের ভাল চিকিৎসার জন্য।

রাজবন্দিদের সাধারণ কয়েদিদের সাথে রাখা হতো না। এদের জন্য ছোট ছোট জেল আছে ঢাকা ও অন্যান্য জেলে। আবার সকল রাজবন্দিকে এক জায়গায় রাখা হতো না, কোথাও দুইজন, কোথাও একজন, কোথাও পঞ্চাশ জন, কোথাও একশ' জন এইভাবে রাখা হতো। এক স্থানের রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে অন্য স্থানের রাজনৈতিক বন্দিদের এক জেলে থেকেও পাঁচ বছরে একবার দেখা হয় নাই এমন ঘটনাও আছে। পূর্বেই বলেছি, অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দিদের ডিভিশন না দেয়ায় সাধারণ কয়েদিদের যা দেয়া হতো, এদেরও তাই দেয়া হতো।

১৯৫০ সালে সমস্ত রাজবন্দি প্রায় ৬০ দিন অনশন ধর্মঘট করে সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করে। ১৯৫১ কি ৫২ সালেও হতে পারে ঠিক বলতে পারি না। জেল কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক বন্দিদের উপর বিশেষ করে ক্ষমতা দেখাতে পারে না, কারণ আইবি-এর হুকুম নিয়ে চলতে হয়। কোথায় কাকে কিভাবে রাখতে হবে তাহাও আইবি বলে দেয়। সেই মতো কাজ করতে হবে জেল কর্তৃপক্ষের। যদি কেউ কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে হঠাৎ দেখবেন তাকে অন্য জেলে পাঠাইয়া দেয়া হইয়াছে।

রাজনৈতিক বন্দিদের সচরাচর এক জেল থেকে অন্য জেলে চালান দেওয়া হয়। ইংরেজ আমলে খাবার ও থাকার বন্দোবস্ত অনেক ভাল ছিল। এমনকি ফ্যামিলি এলাউন্সও দেওয়া হতো। মাসে টাকা বাড়িতে পৌছাইয়া দিতো সরকার। জেলবন্দির স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের অথবা তাদের বৃদ্ধ পিতা মাতাদের এখন তো জান বাঁচানোই কষ্টকর। এ নিয়ে জেলখানায় অনেক গোলমাল করার পরে সরকার এদের দুইটা গ্রেড করে দেন। প্রথম দেওয়া হয় গ্রেড ওয়ান, গ্রেড টু। গ্রেড ওয়ান যারা তাদের রোজ ২ ছটাক মাছ, সকালে ২ টুকরা রুটি আর চা। মাখন, ডিম কিছুই দেওয়া হতো না।

এখানে আমি বলছি ১৯৫২ সালের কথা। ভাল তরকারিও কিছু দেওয়া হতো না। যারা ডিভিশন কয়েদি তারাও সকালে রুটির সাথে মাখন পেত, কিন্তু

আমাদের দেওয়া হতো না। ১৫ দিনে একদিন সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। সপ্তাহে একটা চিঠি লিখতে দিত। তা আবার আইবি অফিস হয়ে যেত। স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখলে আইবি কর্মচারীরা পড়তেন। প্রেমের চিঠিও তারা পড়ে আনন্দ পেতেন। জেলে থেকে যদি কাউকে কিছু আনন্দ দেওয়া যায় ক্ষতি কি! জেলবন্দির কাছে লেখা চিঠিতে যদি কিছু রাজনীতি বা ঐ ধরনের কথা থাকত তবে সে চিঠি রাজবন্দিদের দেওয়া হতো না; যদি দেওয়া হতো মাঝে মাঝে কালো কালি দিয়ে এমনভাবে মাখাইয়া দেওয়া হতো, তা আর পড়ার উপায় থাকত না। এমন কি আমার স্ত্রীর ও বাবার চিঠি অনেকগুলি আছে যার অর্ধেক কালো কালি দিয়ে মুছে দেওয়া, বোধ হয় বাবা সান্ত্বনা দিয়েছেন অথবা বলেছেন, 'চিন্তা করিও না'।

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় একজন আইবি কর্মচারী বসে থাকত, আর জেলের পক্ষ থেকেও একজন ডিপুটি জেলার উপস্থিত থাকতেন। মাত্র ২০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এর মধ্যে যাবতীয় আলাপ করতে হবে। কথা আরম্ভ করতেই ২০ মিনিট কেটে যায়। নিষ্ঠুর কর্মচারীরা বোঝে না যে স্ত্রীর সাথে দেখা হলে আর কিছু না হউক একটা চুমু দিতে অনেকেরই ইচ্ছা হয়, কিন্তু উপায় কি? আমরা তো পশ্চিমা সভ্যতায় মানুষ হই নাই। তারা তো চুমুটাকে দোষণীয় মনে করে না। স্ত্রীর সাথে স্বামীর অনেক কথা থাকে কিন্তু বলার উপায় নাই। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো স্ত্রীকে নিষেধ করে দেই যাতে না আসে। ১৯৪৯ সাল থেকে ৫২ সাল পর্যন্ত আমার স্ত্রীকে নিষেধ করে দিয়েছিলেম ঢাকায় আসতে, কারণ ও তখন তার দুইটা ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশের বাড়ি থাকত।

১৯৪৯ সাল থেকে ৫০ সালে ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য একটা মামলা চলে। আমার, শামসুল হক সাহেব, মওলানা সাহেব, ফজলুল হক ও আব্দুর রউফের বিরুদ্ধে। মামলাটা হয় লিয়াকত আলী খান ঢাকা আসলে আমরা একটা সভা করে শোভাযাত্রা বের করি। শোভাযাত্রা লাঠি চার্জ করে ভেঙে দেওয়া হয়, আর শামসুল হক সাহেব ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পরে মওলানা সাহেবকে আর দেড়মাস পরে আমাকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদের জামিন দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের তিনজনকে রাজনৈতিক বন্দি করা হয়। তাই আমাদের জামিন হয় না। আমরা নিরাপত্তা বন্দি হয়ে যাই। যখন সরকারের ইচ্ছা ছাড়বে। বিনা বিচারে বন্দি। মুক্তি পাওয়াটা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এক বৎসর মামলা চলল। মওলানা সাহেব ও হক সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হলো। আর আমাদের বাকি তিনজনকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো তিন মাস করে। নিরাপত্তা বন্দিও রইলাম, সাথে

সাথে সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে লাগলাম। আপীল করা হলো। আমাকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেওয়া হলো। হক সাহেব ৭/৮ মাস পরে মুক্তি পান। মওলানা সাহেব ও আমি ছিলাম এক জেলে। আমাদের অন্য রাজবন্দিদের সাথে রাখা হতো না। আমরা যদি ওদের সাথে থাকি তবে কম্যুনিস্ট হয়ে যাবো–এই হলো ভয়। কম্যুনিস্ট রাজবন্দি ছিল বেশি। আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হলো। মওলানা সাহেব একলা রইলেন, যখন বিদায়ের সময় হলো মওলানা সাহেব কেঁদে দিলেন। বুঝলাম, বুড়ার মনে ব্যথা।

আমাকে গোপালগঞ্জ চালান দেওয়া হলো, কারণ সেখানে আর একটা মামলার আসামী–সেটা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। গোপালগঞ্জ পৌঁছে খবর পেলাম, আমার মা-বাবা ও স্ত্রী ঢাকায় আমাকে দেখতে গেছেন। সাবজেলে আমাকে রাখা হলো না, কারণ জায়গা নাই; পাঠাইয়া দেওয়া হলো ফরিদপুর জেলে। মামলার তারিখ পড়ে গেছে। ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে ভাড়া দেওয়া হতো ইন্টারক্লাসের, নিজের টাকা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস করে নিলাম। সিপাহি বেচারারা কোনোদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই, খুবই আদর করেছে ও ভদ্র ব্যবহার করেছে। যে টাকা পথ খরচ সরকার দিতেন তাতে একবেলা খাওয়া হয়, স্টীমারে আর এক বেলা খাওয়া হতো না। তাই নিজের টাকা দিয়ে খেয়ে নিতে হতো।

ফরিদপুর জেলে এসে একলা পড়লাম। রাজবন্দিরা আছে। তাদের আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে। আর আমাকে রাখা হয়েছে একলা এক জায়গায়। হাসপাতালের একটা রুম ছেড়ে দিল, সেখানেই থাকলাম। প্রথমে হাসপাতাল থেকে খাবার দিত, পরে অন্য নিরাপত্তা বন্দিরা চার পাঁচজন এক জায়গায় থাকত, তারা নিজেদের পাক দেখাশোনা করত। আমাকে পরে সেখান থেকে খাবার আনাইয়া দেওয়া হতো। আমাকে ফরিদপুর জেলায় আনার পরে কাজ দেওয়া হলো, সুতা কাটা, কারণ এখন আর আমি রাজবন্দি নই, কয়েদি। সুতা কাটতে হতো। আর কয়েদির কাপড় পরতে হতো। তিন মাস খেটে ফেললাম, আমারও সাজা খাটা হয়ে গেল। আবার রাজনৈতিক বন্দি হয়ে গেলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম আমি আপীলে খালাস হয়ে গেছি। সাজাও খাটা হয়ে গেছে, আবার আপীলেও খালাস হলাম। এত কথা লেখা দরকার হতো না। একই জেলে আরও রাজবন্দি আছে, তারা এক ঘরে থাকে, তাদের সামনেই পাক হয়। আর আমাকে সেই একই জেলে একাকী থাকতে হচ্ছে। দোষ কি জানি না। জেলের আইন ভঙ্গ করি নাই, তবুও একাকী থাকতে

হচ্ছে। তবে মাসে শুধু একবার গোপালগঞ্জ যেতে হয় ফরিদপুর থেকে। স্টিমার, নৌকা, গাড়িতে বেশ একটু খোলা বাতাস খাইতাম। যদিও কথা বলা নিষেধ, তবু আস্‌সালামুআলাইকুম তো নিষেধ না। আমাকে কিছু কিছু মানুষ চিনতো। তাই সকল জায়গায়ই কিছু চেনাশোনা মানুষ পাওয়া যেতো, আস্‌সালামুআলাইকুম করেই শেষ করতাম, তা না হলে সিপাহিদের চাকরি যাবে। কারণ আইবি কর্মচারীও আছে। একবার আমাকে কে যেন মিষ্টি দিয়েছিল মাদারীপুর স্টেশনে। সেই মিষ্টি কেন আমি খেলাম তাতে সিপাহিদের কৈফিয়ত দিতে দিতে জান সারা হয়ে গেছে। একজন নাকি সাসপেন্ড হতে যাচ্ছিল, হাত পাও ধরে বেঁচে গেছে তাই ওদের জন্য কারও সাথে আলাপও করতাম না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করত বলতাম, 'আমি কয়েদি, কথা বলা নিষেধ'। আমার জন্য ওদের ক্ষতি হবে কেন!

'আইন দফা'—জেলে একটা 'আইন দফা' ছিল। এইটাই হলো সকলের চেয়ে কষ্টকর দফা। একটু মেজাজ দেখানো কয়েদি হলেই, সাজা দেওয়ার জন্য আইন দফা পাশ করা হতো। এদের গরুর মতো ঘানিতে ঘুরতে হতো। আর একটা পরিমাণ ঠিক ছিল, সেই পরিমাণ তেল ভেঙে বের করতে হতো। পিছনে আবার পাহারা থাকত, যদি আস্তে হাঁটতো অমনি পিটান। এটা ইংরেজ আমলেই বেশি ছিল, তবে পাকিস্তান হওয়ার পরে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে। সেন্ট্রাল জেলে এটা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪৯ সালে; তবে জেলা ও সাবজেলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চলে। শক্তিশালী লোকগুলি ঘানি টেনে এক বছরের ভিতর এত দুর্বল হয়ে পড়তো যে সে কথা কি বলব!

আমি যখন ফরিদপুর জেলে যাই তখন দেখতে পেলাম মানুষ দিয়ে ঘানি ঘুরাইয়া তেল বাহির করা হয়। একদিন জেলার সাহেবকে আমি বললাম, 'সরকার হুকুম দিয়েছে কয়েদি দিয়ে ঘানি ঘুরানো চলবে না, আপনার জেলে এখনও চলছে কেন'? তিনি বললেন '২/১ দিনের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে, গরু কিনতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। উপরে লিখেছি, অনুমতি এলেই কয়েদিদের পরিবর্তে গরু দিয়ে করা হবে।' সত্যই জেলার সাহেব আমি থাকতেই বন্ধ করে দিলেন। না দিলে হয়তো আমার প্রতিবাদ করতে হতো অথবা সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে হতো। একটা লোক ঘানি ঘুরাতে ঘুরাতে অসুস্থ হয়ে একবার হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে কষ্টের কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হুজুর দিনভরে গরুর মতো ঘুরে রাতে যখন শুতে যাইতাম তখনও মনে হতো ঘুরছি, ঘুমাতে পারতাম না, দেখেন সেই যে শরীর নষ্ট হয়ে গেছে আর ভাল হয় নাই। খোদা আপনাকে বাঁচাইয়া

রাখুক, আপনি জেলে না আসলে আর কতদিন যে গরুর মতো ঘুরতে হতো বলতে পারি না।'

জেলখানায় কথা এক মিনিটে প্রচার হয়ে যেতো।

ডালচাকি দফা—ডালচাকি নামে একটা দফা আছে। এদের ডাল ও গম ভাঙতে হয়। আজও আছে এটা। ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেয়। যাদের 'good' মার্কা স্বাস্থ্য তাদের রোজ একমন করে ডাল ভাঙতে হয়, আর যাদের স্বাস্থ্য 'মিডিয়াম' তাদের আধামন ডাল রোজ ভাঙতে হয়। গমও ভাঙতে হয়। প্রত্যেকের রোজ দশ সের করে গম ভাঙতে হয়।

হাজতি দফা—এখানে হাজতিদের রাখা হয়—যাদের জামিন হয় নাই, মামলা চলছে। ঢাকা জেলে তিনতালা একটা দালানে এদের রাখা হয়। ছয়টা রুম আছে। কোনো লোক যখন হাজতে থাকে—যার মামলা চলতে থাকে, তখন সমস্ত রাত কারও ঘুমাবার উপায় থাকে না। রাত ভরে নামাজ, জেকের, মিলাদ। তজবি জপে 'আল্লাহু আল্লাহু' করতে থাকে।

১৯৪৯ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করে সকালে জেলে এনে হাজতে রাখলো; কারণ আমাকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। আরও কয়েকজন রাজবন্দি ছিল নিচের একটা রুমে। তাদের কাছে আমাকে রাখা হলো। আরও হাজতিও ছিল সেই রুমে। খাবার দিল ডাল, একটা তরকারী, আর ভাত—কি আর করা যাবে, খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম—খেয়ে নিলাম। যা পাক করেছে, তেলের গন্ধ, ময়লা—বিশেষ করে চাউলের ভিতর কাঁকর, ডাল দিয়ে চারটা মুখে দিলাম। জান তো বাঁচাতে হবে।

দুপুর বেলা দেখা এক মওলানা স্যাহেবের সঙ্গে, কোরানে হাফেজ, তাঁর বাবাও খুব বড় পীর ছিলেন, কুমিল্লায় বাড়ি। হাজতিদের মধ্যে নামাজ পড়বার আগে বক্তৃতা করছেন, ওয়াজ করছেন, হাজতিরা বসে শুনছে। আমি দূরে দাঁড়াইয়া তাঁর বক্তৃতা শুনছি। তিনি বলছেন খুব জোরে 'দরুদ শরীফ' পড়। শয়তান দূর হয়ে যাবে। জোরে পড়। অনেকক্ষণ বক্তৃতা করলেন; সুন্দর চেহারা, অল্প বয়স, চমৎকার বলার কায়দা। তবে জামাটা খুব বড়। ঐটা দেখেই মনে সন্দেহ হলো। একদম পা পর্যন্ত জামা। বোধ হয় ছয় সাত গজ হবে কমপক্ষে। তজবি হাতেই আছে। মাঝে মাঝে চক্ষু বুজে কথা বলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই মওলানা সাহেব কি মামলায় এসেছেন।' আমাকে এক 'পাহারা' বললো, 'জানেন না, 'রেপ্ কেস'; একটা ছাত্রীকে পড়াতো তার

উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, মসজিদের ভিতর। মেয়েটার ১২/১৩ বৎসর বয়স, চিৎকার করে উঠলে লোক এসে দেখে ফেলে। তারপর ধরে আচ্ছামত মারধর করে। জেলে এসে কয়দিন তো হাসপাতালেই থাকতে হয়েছে। আমি বললাম 'হাজতে এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেছে।' বেটা তো খুব ভণ্ড। জমাইছে তো বেশ।

'সন্ধ্যার পরে আমাদের তালাবন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের উপরের কোঠায় সেই হাফেজ সাহেব থাকতেন। মগরবের নামাজের পর চলল তার 'মিলাদ' অনেকক্ষণ, তারপর দরুদ, তারপর চলল কোরান তেলাওয়াৎ। তিনি যে কোরানে হাফেজ সেইটাই দেখাতে ব্যস্ত আছেন, বলে আমার মনে হলো। মামলায় তাঁর চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি দরখাস্ত করেছিলেন ডিভিশন পাওয়ার জন্য। যদিও তার গ্রামের রিপোর্টে জানা গিয়েছিল তিনি সম্মানী ঘরের থেকে এসেছেন। তবে তাকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই, কারণ তিনি পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী।

ফরিদপুর জেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম হাফেজ সাহেবকে ডিভিশনের কয়েদিরা এনেছেন তার কাছে কোরান পড়তে। আমার সাথে আলাপ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম 'এমন কাজটা করলেন ছাত্রীর সাথে, তাও আল্লাহর ঘর মসজিদের ভিতর।' তিনি বললেন "মিথ্যা মামলা, এ কাজ আমি কোনো দিন করতে পারি!" তবে নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বেশি কথা বলে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে। অনেক মওলানা সাহেব মুরিদানদের বাড়িতে বেশি মুরগির গোশত খান। তাই শক্তিও বেশি, এজন্য এক বিবাহতে হয় না, তিনটা চারটা বিবাহ করেন। এটা এদের অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ কাজ কর্ম করতে হয় না, ভিক্ষার টাকাতেই সংসার করেন, তাই তাকত বেশি। আবার অনেক মওলানা মৌলবী সাহেবরা আছেন যাঁরা কাজ করেন, পরের জন্যে দেওয়া অর্থ কড়ি নেন না, আর বিবাহও একটা করেন। কারণ তাদের মন পবিত্র।

ছোকরা দফা—জেলখানায় আর একটা দফা বড় ভয়ানক ব্যাপার। সেটা হলো ছোকরা দফা। অল্প বয়সের কয়েদি ও হাজতিদের এক জায়গায় রাখা হয়, আলাদা করে। সাধারণ কয়েদিদের কাছে রাখতে দেওয়া হয় না। খুব কড়াকড়ি করা হয়। ছোকরাবাজি জেলে বেশি হয়। অনেকে ২০, ১০, ১২.. ৫... ৭... ৪.. ৩ বৎসর জেল নিয়ে আসে। নওজোয়ান অনেক থাকে, নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে এই সমস্ত কুকর্ম করে বেড়ায়। রীতিমত টাকা

পয়সা খরচও করে এবং ছোকরা রাখে। জোগাড় করে ছোকরাদের ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায়। ছোকরাবাজিতে ধরা পড়লে খুব অপমানও করা হয়। একবার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। একটা লোক ছোকরাবাজিতে ধরা পড়ে। তাকে কয়েদিরা মুখে কালি, গলায় জুতার মালা আর একজন লাঠি নিয়ে মারতে মারতে সারা জেল ঘুরায়। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে নিয়ে আসে। লোকটা উপরের দিকে চাইছে না, আমি তো প্রথমে বুঝতে পারি নাই–পরে জিজ্ঞাসা করলে একজনে বলল সমস্ত ঘটনা। বলল এতো কিছুই না, আরও অনেক মার ওর কপালে আছে। এ বিষয়ে কড়াকড়িও খুব বেশি, এ কাজ তা সত্ত্বেও চলে বেশি। তাই ছোকরা চাইলে সহজে কাউকে দেওয়া হয় না। মেট পাহারা সিপাহিরা কড়া নজরে রাখে।

আমরা যেখানে থাকতাম কিছুদিন আমাদের ঘরের পাশের ঘরে ছোকরাদের রাখা হতো। দিনে আমরা যেখানে বেড়াতাম সেখানেই ওরা বেড়াতো। ৬ বৎসর বয়স থেকে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্তত পক্ষে তখন প্রায় ৫০ জন হাজতি কয়েদি ছিল। ছোট ছোট ছেলে ডাকাত বা চোরের দলে 'খোজারু' ছিল। এরা কারও বাড়িতে যেয়ে খোঁজ নিয়ে আসত। এদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। কারও বাড়িতে চাকর থাকত, কয়েকদিন পরে পালাইয়া যেয়ে সমস্ত খোঁজ খবর দিত চোরের দলকে। আবার অনেকগুলি আছে পকেট মার। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। একটা ৮ বৎসরের ছেলে পকেট মারার জন্য তিনবার জেলে এসেছে। কিছুদিন জেল দেয়, ছোট ছেলে বলে ছাড়া পায়, তারপর আবার বাইরে যেয়ে পকেট মারে। পকেট মারের বড় দল আছে। ভাল ভাল শিক্ষিত অর্থশালী সর্দারও আছে। পকেট মেরে নিয়ে এক জায়াগায় ভাগ হয়। আবার কেহ কেহ একলাই করে।

একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'হুজুর কি যে বলেন, একদিনে আমার ব্যয় হয় ১০/১৫ টাকা, আমি কেন আর একজনের বাড়িতে কাজ করব। তার চাইতে ভাল একটা দান মারবো, থানায় কিছু দিব, চুপ হয়ে যাবে। যদি হাতেনাতে ধরা পড়ি তবেই তো বিপদ। পকেটমারের আর কয়দিন জেল হয়?' এই সমস্ত ছেলেরা একবার জেলে আসলে এদের জেলের ভয় ভেঙে যায়। অনেক বুড়ালোক বহুদিন জেলে আছে, ছোট ছোট ছেলেদের দেখলে বোধ হয় তাদের নিজের ছেলেদের কথা মনে পড়ে, তাই এদের অনেককে খুব আদর করে, না খাইয়া খাওয়ায়। এদের স্নেহ পিতৃস্নেহ।

জেলে আসলে অন্য পকেটমারদের বা ডাকাতদের কাছে থেকে বেশ ট্রেনিং পায়, বাইরে যেয়ে আরও বড় ডাকাত হয়। জেল দিয়ে লোকের চরিত্র ভাল হয়েছে বলে আমি জানি না।

একবার জেলে আমি শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। আমি একলা থাকতাম, অন্য রাজবন্দিদের আমার সাথে রাখা হতো না। একটা ঘরে যাকে দেওয়ানী বলা হয়–সেখানে আমি থাকতাম। আমার দেখাশুনা ও পাক করার জন্য দুইজন কয়েদি ছিল। একজনের নাম নবাব আলি, গ্রাম-শংকর, পোঃ-বোয়াইল, থানা-ধামরাই, জিলা-ঢাকা। আর একজনের নাম হোসেন খাঁ, গ্রাম-সরাকাঠি, পোঃ-শ্যামপুর, জিলা-বরিশাল। প্রথমজনের ১০ বৎসরের আর দ্বিতীয়র ৭ বৎসরের জেল হয়েছে খুনের মামলায়। বাইরে কাজ করছে। সিপাহি বলে পাহারা দিচ্ছে বাইরে।

এটা ১৯৪৮ সালের ঘটনা, বোধ হয় ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ একজন 'কয়েদি পাহারা' আমার পা জড়াইয়া ধরে শুধু বলছে 'আমাকে বাঁচান। আমাকে মেরে ফেললো।' আমার কাছে কোনো কয়েদির রাখার বা কথা বলার হুকুম নাই। আমি হঠাৎ চমকাইয়া উঠে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি ব্যাপার! তুমি এখানে কি করে এলে? কি হয়েছে বলো।' সে কাঁপছে আর বলছে 'একজনকে মেরেছি, এখন আমাকে ধরে নিয়ে মারবে। বিচারে যে শাস্তি হয় তাতে আমার আপত্তি নাই, তবে আমাকে না মারে।' এর মধ্যে সিপাহি ছুটে এসে একে ধরে ফেলেছে। মেট, পাহারা, জমাদার সকলে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় পালালো। পরে ওকে ধরে নিয়ে গেল কেস টেবিলে। সেখানে সুবেদার আছে, আমি বলে দিলাম জমাদারকে ওকে যেন না মারা হয়। কারণ ও যখন চলে এসেছে আমার কাছে আশ্রয় নিতে, ওকে মারবেন না। জমাদার, সিপাহি, মেট 'পাহারা' আমার কথা শুনলো। এর মধ্যে দেখি একজন কয়েদিকে ৫/৬ জন কয়েদি ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। ভীষণভাবে জখম হয়েছে। কয়েদিটা ঘুমাইয়া ছিল। সে অন্য জায়গায় কাজ করত তাকে লোহার একটা লাঠি দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায়ই মুখে আঘাত করে, একটা দাঁত পড়ে যায়, আর কতগুলি নড়ে যায়। আর যে এসে আমার পা ধরেছে, যে মারলো তার নাম হলো আলি হোসেন। বিশ বৎসর সাজা, যাকে বলা হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায় আর যাকে মেরেছে তার নাম হলো মাহতাব, বাড়ি ঢাকা।

এদের মধ্যে গোলমাল চলেছে বহুদিন থেকে, কারণ দুইজনই একজন ছোকরা কয়েদিকে পছন্দ করত। আলি হোসেন ছোকরাটাকে সকল সময় যত্ন

করত, খাওয়াতো। বিড়ি দিত, কিন্তু ছোকরাটা মাহতাবের কাছেই থাকত। ওর কাছে বেশি যেতো, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলেই চলে যেত মাহতাবের কাছে। রাতেও মাহতাব যেখানে পাহারা দিত সেখানেই ও থাকত। তাই রাগ হয়ে মাহতাব যখন ভাত খেয়ে ঘুমায়েছিল ওর নিজের জায়গায় তখন অন্য জায়গা থেকে আলি হোসেন সিপাহি জমাদারদের ফাঁকি দিয়ে সেখানে যেয়ে মেরে এক দৌড়ে পালাইয়া আমার কাছে চলে আসে। ধরা পড়লে বেশ 'ধোলাই' করা হতো। ধোলাই কথা ব্যবহার হয় জেলখানায়; বেশ মতো যাকে মারা হয় তাকে এককথায় 'ধোলাই' করা বলে। এই রকম অনেক ঘটনাই জেলে ঘটে থাকে।

ঢাকা জেলে প্রায় দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার কয়েদি ও হাজতি আছে।

১৯৫০ সালে যখন জেলে ছিলাম তখন একজন কয়েদির সাথে আলাপ হয়। নাম তার লুদু ওরফে লুৎফর রহমান। ঢাকা শহরের লুৎফর রহমান লেনে তার বাড়ি। আমি তাকে ১৯৫৪ সালে দেখে যাই, আবার যখন ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' জারি হয় এবং আমাকে গ্রেপ্তার করে–জেলে এসে দেখি লুদু আছে। সে নিজকে সকলের চেয়ে সিনিয়র কয়েদি হিসেবে জাহির করত এবং দাবিও করত। জেলের সাধারণ আইন কানুন তার কণ্ঠস্থ ছিল। কথায় কথায় আইন ঝাড়তো। তার মতের বিরুদ্ধে কিছু হলেই সে সুপার ও জেলার সাহেবের কাছে নালিশ করত। সে 'বি-ক্লাস' কয়েদি ছিল। সাধারণ কয়েদিরা তাকে ভয় করে চলত। কারণ সে খুব সাহসী, সহজে কাউকে মানতো না। আমি যেখানে থাকতাম সেখানে সে পানি দিত ও ঝাড়ু খাতায় কাজ করত। একজন জেল ওয়ার্ডার আমার ওখানে ডিউটি দিত। লোকটা অমায়িক ও ভদ্র, নাম তার কাদের মিয়া। সে লুদুকে বলতো, 'লুদু ভাল হও, আর চুরি করো না।' আমি ঘরে বসে বই পড়তাম, তাদের কথা ভেসে ভেসে আমার কানে আসত। আমি তাদের আলাপ চুপচাপ করে শুনতাম।

লুদুকে আমি ডেকে বললাম, 'লুদু তোমার জীবনের ঘটনাগুলি আমাকে বলবা'। লুদু বললো, 'হুজুর আমার জীবনের কথা নাই বা শুনলেন, বড় দুঃখের জীবন। প্রায় ২০ বৎসর আমার জেলখানাতে হয়েছে। ১৩ বৎসর বয়স থেকে চুরি ও পকেট মারতে শুরু করেছি। কেন যে করেছিলাম আজও জানি না। তবে মাঝে মাঝে ভাবি কেন এই পথ নিয়েছিলাম। জীবনটা দুঃখেই গেল। বোধ হয় জীবনে আর শান্তি হবে না। চোর ও পকেটমারের জীবনে শান্তি হয় না।' লুদু বলতে বলতে চোখের পানি ফেলেছিল, বোধহয় অনেক দুঃখের কথা তার মনে ভেসে এসেছিল।

লুদু বলতে লাগল, আর আমি ঘটনাগুলি লিখতে শুরু করলাম। একটা সামান্য চোরের জীবন আমি কেন লিখছি—এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করতে পারেন। আমি লিখছি এর জীবনের ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে, যারা গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করবেন, তারা বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজের দুরবস্থা এবং অব্যবস্থায় পড়েই মানুষ চোর ডাকাত পকেটমার হয়। আল্লাহ কোনো মানুষকে চোর ডাকাত করে সৃষ্টি করে না। জন্ম গ্রহণের সময় সকল মানুষের দেল একভাবেই গড়া থাকে। বড় লোকের ছেলে ও গরিবের ছেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, যেদিন জন্মগ্রহণ করে। আস্তে আস্তে এক একটা ব্যবস্থায় এক একজনের জীবন গড়ে ওঠে। বড়লোক বা অর্থশালীর ছেলেরা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল শিক্ষা পায়। আর গরিবের ছেলেরা জন্মের পরে যে অবস্থা বা পরিবেশে বেড়ে উঠে এবং যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের স্বভাব চরিত্রই তারা পায়।

লুদুর বাবার অবস্থা নেহাত খারাপ ছিল না। খেয়ে পরে সুখেই ছিল। কিন্তু সাতটা বিবাহ করে এবং বহু ছেলেমেয়ে জন্ম দেয়। সাথে সাথে কিছু বদ অভ্যাসও ছিল—মদ, তাড়ি খেয়ে টাকা উড়াইতো। তারপরে যাহা বাঁচতো রবিবার পকেটে করে ঘোড় দৌড় খেলায় তাহাও শেষ করে ফতুর হয়ে আসত। এইভাবে আস্তে আস্তে সংসার ভেঙে পড়তে লাগল। অভাব অভিযোগ দেখা দিল। লুদুর মা ছিল তার বাবার প্রথম স্ত্রী। এরা চার ভাইবোন ছিল। অন্য পক্ষেরও আরও নয়জন ছেলেমেয়ে ছিল। ফলে সংসারে ভীষণভাবে অভাব দেখা দিল।

লুদুর বড় ছিল এক ভাই, সে রাজমিস্ত্রির কাজ নিয়েছিল। যা কিছু উপার্জন করত নিজেই ব্যয় করত, আর বাবার কিছু গুণও পেয়েছিল। ঘোড় দৌড়, জুয়াও শুরু করল।

লুদুর বাবা অন্য বিবাহ করার জন্য তার মাকে দেখতে পারতো না। তাই বাধ্য হয়ে লুদু মাকে নিয়ে আলাদাভাবে বাস করতে লাগল। সেই সময় লুদুকে দর্জির কাজ শিক্ষা করার জন্য ওর বড় ভাই এক দর্জির দোকানে দিল। প্রায় এক বছর থাকার পর ওর বাবা তাকে ফিরাইয়া আবার রাজমিস্ত্রির সাথে জোগালির কাজ করতে দিল। একাজে যা কিছু পেত তাতে সংসার চলত না।

এই সময় ওর বাবার মৃত্যু হলো, বড়ভাই সংসারের মালিক হলো। লুদু লেখাপড়া শিখতে চায়। তাই বড় ভাইকে বলল তাকে স্কুলে দিতে। কিন্তু বড় ভাইয়ের সংসারে টানাটানি, তার টাকার প্রয়োজন। ওদের ওপর অত্যাচার করতে লাগল। বাধ্য হয়ে একদিন লুদু ও তার ছোট ভাই বাড়ি ত্যাগ করে

নানার বাড়ি চলে গেল। নানাবাড়িও ঢাকা শহরে। নানার বাড়িতে খায় আর ঘুরে বেড়ায়। এই সময় সে দেখতো একদল যুবক চাখানায় চা খায়, আড্ডা মারে, জুয়া খেলে, দুই হাতে টাকা উড়ায়।

ওর নানার বাড়ির পাশেরই একটা যুবক চুরি করত। তার নাম গোপাল। গোপালের সাথে লুদুর পরিচয় হয়। তার সাথে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতো। সে লুদুকে বলল, 'কি করিস, তুই আমার সাথে কাজ করলে তোর বেশ কিছু টাকা পয়সা হবে।' লুদুকে সকল কথা গোপাল খুলে বলল। একদিন ঠিক হলো গোপাল ওকে নিয়ে রাতে চুরি করতে যাবে। ভয় পেলে চলবে না। যা বলবে তাই করতে হবে। এইভাবে মাঝে মাঝে গোপালের সাথে চুরি করত। গোপাল ওকে কিছু কিছু টাকা দিতো। তার হাতে টাকা আসাতে তার খুব ফুর্তি হলো। বেশ ব্যয় ট্যয় করত চা সিগারেট খাইতে, দু'একখানা ভাল কাপড়ও পরতো। কিছুদিন গোপালের সঙ্গে চুরি করার পরে বোধহয় ১৩/১৪ বৎসর বয়সে নিজেই একদিন চুরি করতে লোভ হলো। একলাই চুরি করবো, তবে সকল টাকা একারই হবে। প্রথমে চুরি বেশ সুন্দরভাবে করে আসতে লাগল। সাহস বেড়ে গেল। এইভাবে তিন মাস পর্যন্ত মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে একলাই চুরি করত। কিছু টাকা যখন লুদুর হাতে এল তখন সে তার ছোট ভাইকে স্কুলে দিল।

এই সময় একবার একা চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়ল। বেশ কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে থানায় দেওয়া হলো। দারোগা সাহেব হাজতে পাঠাইয়া দিয়া একটা মামলা দায়ের করলেন। প্রায় তিন মাস হাজত খাটতে হলো। এই সময় লুদুর সাথে অনেক পুরানো চোরের পরিচয় হয় এবং তাদের কাছ থেকে চুরির নতুন নতুন ফন্দিও কিছু শেখে। ম্যাজিস্ট্রেট লুদুর অল্প বয়স বিবেচনা করে তাকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন। শর্ত হলো, যদি লুদুর বড় ভাই একশ' টাকার জামিন হয়, এক বছরের মধ্যে যদি আর কোনো চুরি বা খারাপ কাজ না করে তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। লুদুর বড় ভাই তার মায়ের কান্নাকাটিতে রাজি হয়ে একটা বন্ড লিখে দিয়ে ওকে খালাস করে নিয়ে যায়।

কয়েক মাস ভাল থাকার পরে আবার চুরি করতে আরম্ভ করে। কারণ, টাকার তার প্রয়োজন। দুই তিন মাস পর আবার চুরি করতে যায়। জেলের এক চোরের সাথে তার আলাপ হয়েছিল, সে খালাস পেয়ে লুদুকে নিয়ে চুরি করতে যেয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। এইবার লুদুর নয় মাস কারাদণ্ড হয়।

জেলখানায় ছোট ছোট ছেলেদের কয়েদিরা খুব ভালবাসে। অনেকে নিজের

ছেলেমেয়েকে ফেলে আসে তাই পিতৃবাৎসল্য জেগে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেদের দেখলে এরা না খাইয়া সেই বাচ্চাদের খাওয়ায়।

আর একদল—যারা ছোকরাবাজ তারাও এদের পিছনে লাগে। ভাল ভাল জিনিস জোগাড় করে খাওয়ায়। বিড়ি তামাকের অভাব হয় না। জঘন্য লোকগুলো এই ছেলেগুলিকে খারাপ করে ফেলে।

জেলে নয়মাস লুদুর কোনো কষ্ট না হওয়াতে তার মনে ধারণা হলো যে, জেল তো কিছুই না। এখানে আসলে আরামই পাওয়া যায়। সাথে সাথে পেশাদার চোরদের কাছ থেকে অনেক রকমের চুরির ফন্দি সে শিখে নেয় এবং দল সৃষ্টি করে। বাইরে এসে সকলে এক হয়ে চুরি করে। যখন নয় মাস পরে খালাস হলো, তাকে পুলিশের নজরে রাখার জন্য এক বৎসরের হুকুম হলো। প্রতি রাতে ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত পুলিশ তাকে ডেকে দেখতো সে ঘরে আছে কিনা।

জেলখানায় আসার আগে কি করে পকেট মারতে হয়, তা সে শিখে এসেছিল। রাতে যখন পুলিশ তার ঘরে পাহারা দেয়, তখন দিনেই পকেট মারা ভাল মনে করলো সে। লুদু পকেট কাটতে শুরু করলো। প্রায় পাঁচ মাস এইভাবে চলল। এই সময় একদিন পুলিশ এসে তাকে থানায় ডেকে নিয়ে বলল, 'তুই কি করিস সে খবর রাখি; তোকে এবার ধরতে পারলে জেল দেওয়াব তিন বছরের জন্য আর বেতের বাড়ি তোর খেতে হবে। তুই কেন আমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করিস না।' তখন লুদু ভাবল যে থানার সাথে বন্দোবস্ত না করলে বিপদ হবে। যখন দারোগা সাহেব বললেন 'দেখা সাক্ষাৎ কেন করিস না', তখন বুঝতে পারলো যে কিছু দিতে হবে।

একদিন পকেট মেরে বেশ কিছু টাকা পেয়ে লুদু ভাবলো দেখা যাক দারোগা সাহেব কি করেন। বাজার থেকে বড় একটা মাছ, কিছু পটল, কিছু আলু, আর দশটা টাকা নিয়ে দারোগা সাহেবের বাসায় গিয়ে চাকরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব বাড়ি আছে কি না'? সে উত্তর দিল ঘরে আছে। 'তাকে বল যে লুদু আসছে দেখা করতে। লুদু—সেই লুৎফর রহমান লেনের পকেটমার।' দারোগা সাহেব বেরিয়ে এসে বললেন, 'কি জন্য আসছিস, এইগুলি আবার কি?' লুদু দেখল, দারোগা সাহেব খুব খুশি হয়েছেন। লুদু বলল, হুজুর সামান্য জিনিস এনেছি, গরিব মানুষ কোথায় পাবো! দারোগা তার চাকরকে বললো এগুলো ভেতরে নিয়ে যাও। দশটা টাকাও লুদু দিল। টাকা পকেটে রেখে দারোগা

বললেন, 'বোধহয় ভাল দান মেরেছ, তা মাত্র দশ টাকা কেন? বেশি কিছু দেও।' লুদু বলল, 'সামান্যই পেয়েছিলাম, আমার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। মাঝে মাঝে কিছু দেবার চেষ্টা করব।' দারোগা সাহেব বললেন, 'সপ্তাহে কত দিবি বল?' লুদু বলল, 'তা কেমন করে বলব, কিছু মারতে পারলেই আপনার জন্য নিয়ে আসব।' দারোগা সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তবে হাওয়ালদার, সিপাহিদের দেওয়ার জন্য সপ্তাহে ১০ টাকা দিবি। আর চুরি করলে, তার কিছু ভাগ আমাকে দিয়ে যাবি। কারণ খবর আমার কাছে আসবে। তোকে আর রাতে ডাকা হবে না, কাজ চালাইয়া যা।' দারোগা হাওয়ালদারদেরকে বলে দিল আমাকে আর রাতে ডাকাডাকি না করতে। আমি রাতে চুরি করতাম, আর দিনে পকেট মারতাম। বেশ টাকা পয়সা আমার হাতে আসতে লাগল। জুয়া খেলা, তাড়ি খাওয়াও শুরু করলাম।

'এইভাবে মাত্র পাঁচ মাস কাটালাম। হঠাৎ একদিন পকেট মারতে যাই রেলওয়ে স্টেশনে। রেলওয়ে যে জিআরপি পুলিশের আন্ডারে একথা আমি তখন জানতাম না। এদেরও যে হাত করতে হয় এ ধারণা আমার ছিল না। আমি পকেট মারতে যেয়ে ধরা পড়ে গেলাম টাকা সমেত। আমাকে জিআরপি অফিসে নিয়ে খুব বানানো হলো। তারপরে বলল, 'নতুন বুঝি পকেট মারিস, কোনো খবর টব্বর রাখিস না।' একজন পুলিশ এসে আমাকে বলল, 'তোর বাড়ি কোথায়? টাকা খরচ করতে পারবি?' লুদু বলল, 'কিছু তো পারি।' 'যদি ব্যয় করতে রাজি হইস, তবে তোকে ছাড়াইয়া দিতে পারি দারোগা সাহেবকে বলে। পুলিশটা ১০০ টাকা চাইলো দারোগা সাহেবের জন্য, আর নিজের জন্য পঁচিশ টাকা।' লুদু তাকে বললো, 'অত টাকা তো ঘরে নাই, তবে ৭০ টাকা দারোগা সাহেবকে দেন, আর আপনি ২০ টাকা নেন।' রাজি হলো, আমি আমার ছোট ভাইয়ের ঠিকানা দিয়ে থানার ঐ সিপাহিকে পাঠালাম। সিপাহি আমার ভাইকে নিয়ে হাজির হলো। দারোগা সাহেবকে টাকা দিলে তিনি সিপাহিকে কি যেন বলে বিদায় দিলেন। একটু পরে আমাকে ছেড়ে দিলেন।

এইভাবে জিআরপি পুলিশকে হাত করলাম। রোজ পকেট মারতাম। সকালে স্টেশনে, জিআরপিকে ভাগ দিতাম। আর বিকালে পকেট মারতাম সদরঘাট, তার ভাগ দিতাম কোতওয়ালী থানায়। এইভাবে দুই বৎসর চলল।

এর মধ্যে একটা বাসে পকেট মারতে চেষ্টা করেছি, দেখি এক ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে আছে; আমি হাত টান দিয়ে নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক আমাকে চোখ ইশারা দিল পকেট মারতে। প্রথম ধকল যখন কেটে গেল তখন আবার পকেট মারলাম। আমি যখন নামলাম ঐ ভদ্রলোকও দুইজন লোক নিয়ে নামল। আমি

তাদের নিয়ে এক রেস্টুরেন্টে গেলাম। পকেট মেরে খামের মধ্যে ৭০০ টাকা রেখেছিলাম, আমি হাত সাফাই করে সরাইয়া ছিলাম ৪০০ টাকা, খামের মধ্যে থাকলো ৩০০ শ' টাকা। লুদু বললো, এই দুই ভদ্রলোক তাকে বলেছিল, এরা সিআইডি। টাকা ভাগ হলো, লুদুর ১০০, আর ওদের ২০০। কথা ঠিক হলো এইভাবে বাসে গাড়িতে পকেট মারবে, আর এরা লুদুকে বাঁচাইয়া দিবে। লুদু যখন পকেট মারত এরা প্রায়ই তার সাথে থাকত। কয়েকবার ধরা পড়েছে, এরা বলে কয়ে ছাড়াইয়া দিয়াছে। 'মাইরের হাত থেকেও আমাকে অনেকবার রক্ষা করেছে। এভাবে সিআইডি অফিসও আমার হাতে হয়ে গেল। আমি বেপরোয়াভাবে পকেট মারা ও চুরি করা শুরু করলাম। লুদু বলল, এই সময় আমি লোহারপুলের কাছে সূত্রাপুর বাজারে পকেট মারতে চেষ্টা করায় হাতেনাতে গ্রেপ্তার হই। সূত্রাপুর থানায় আমি কিছু দেই নাই, দিলেও বোধহয় উপায় ছিল না। কারণ যাদের হাতে ধরা পড়েছি তারা বাইরের লোক। এই কেসে তিন মাস হাজতখানায় খাটার পর আমার দেড় বছরের জেল হয়।

আমি জেলে এসে এবার ভালই পাকা হলাম। গলার ভিতর 'খোকড়' বা ভাণ্ডার করা শিখলাম। পেশাদার ডাকাত, চোরদের গলায় একপ্রকার গর্ত করা থাকে; এরা গলার ভিতর ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করে খোকড় করে। এই খোকড়ে ৫/৭টা মোহর অথবা ৮ থেকে ১০টা গিনি একসাথে রাখা যায়। কাঁচা টাকা প্রায় ৭-৮টা এক সাথে রাখা যায়। এমনকি ১০০ টাকার নোট সিগারেটের কাগজ দিয়ে মুড়ে দুই তিনখানা একসাথে রাখা যায়। না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। এরা টাকা রাখে কারণ, জেলে এসে সিপাহি জমাদারদের টাকা দিয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এরা গাঁজা, আফিম, চরস সরাব সবকিছু কিনে এনে খায়। এই টাকা খরচ করে জেল কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদেরও মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়।

চোর-ডাকাতকে যখন থানায় থানায় মারপিট করে তখন একখানা গিনি বের করে দিলে আর মার খেতে হয় না। জামিনও পাওয়া যায়। লুদু এই সময় 'খোকড়' তৈয়ার করার চেষ্টা করতে লাগল। 'খোকড়' দুই রকমের; কাঁচা ও পাকা। কাঁচা খোকড় বন্ধ হয়, বেশি কিছু রাখা যায় না। গলা টিপলে মাথায় মারলে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পাকা খোকড় থেকে চেষ্টা করলেও টাকা বা গিনি বের করা যায় না—যে পর্যন্ত নিজে থেকে বের করে দেয়। লুদু কাঁচা খোকড় করার জন্য গলার ভিতর সীসা গোল করে সুতা বেঁধে গলার মধ্যে রেখে দিত। সুতা দাঁতের সাথে বাধা থাকে, যাতে ভেতরে না চলে যায়। এইভাবে অনেকদিন রাখলে একটা গর্ত হয়। এই গর্তের উপর সোনা রাখতে পারলে আস্তে আস্তে পাকা হয়ে যায়। তা না হলে বাইরে যেয়ে

ডাক্তার দ্বারা অপারেশন করে পাকা করা হয়। লুদু কাঁচা খোকড় তৈয়ার করল। এই সময় জেলে ছোকরা নিয়ে ছোরা-মারামারি করায় দশজনকে বদলি করল। এই জেলেই লুদুকে বাকি দিনগুলি খাটতে হলো।

লুদু বলে, এই বার জেল থেকে একবারে পাকা চোর হয়ে ফিরে এলাম। পাকা 'খোকড়' করলাম, দলবল খোঁজ করে তিনজন একসাথে হলাম। ঠিক করলাম, ঢাকা শহরে পকেট কেটে বেশি দিন বাইরে থাকা যাবে না। বিদেশেই যেতে হবে। তিনজন এক সাথে হয়ে সিলেট জেলায় গেলাম। সিলেট তখন আসামের ভিতর। লুদু বলল, তারা চামড়ার ব্যাপারী সেজে শ্রীমঙ্গলে এক বাড়িতে আশ্রয় নিল। দুই একটা চামড়া কিনতো, লবণ লাগাতো আর পকেট মারতো। এখানে সেই বাড়িওয়ালার এক মেয়েকে সে বিবাহ করে। কয়েকদিন পরে আবার ধরা পড়ে মৌলভীবাজার জেলে যেতে হলো। মেয়েপক্ষ যখন খবর পেল লুদু একটা দাগী চোর, তখন জেলে গিয়ে তার কাছ থেকে মেয়েটার তালাক নেওয়াইল। এখানে লুদুর ৯ মাস জেল হলো। এরপর আরও কয়েকবার জেল হয়।

১৯৪৯ সালে যখন আমি জেলে তখন লুদুর সাথে আমার পরিচয় হয়। ১৯৫২ সালে লুদু মুক্তি পায়, আবার ১৯৫৩ সালে গ্রেপ্তার হয়। এইবার ওর নয় বৎসর জেল হয়, তিনটা মামলা মিলে। ভালভাবে জেলে থাকলে ৬ বৎসর খেটে বের হতে পারতো।

কিন্তু তার স্বভাব মোটেই পরিবর্তন হয় নাই। খোকড় তার করতেই হবে। বি ক্লাস কয়েদি সকলেই তাকে সমীহ্ করে চলে। মার যে সে কত খেয়েছে তার সীমা নাই। একদিন বললো, 'কানে একটু কম শুনি, কারণ অনেক চড় কানে পড়েছে। শরীরের কোনো জায়গাই বাদ নাই মার খেতে।'

আমার মনে হতো মার না খেলে লুদুর ভাল লাগে না। কাউকেও সে ভয় করে না, জেলে তাকে সকলেই সমীহ্ করে চলে। সুপারেনটেনডেন্ট যখন সাত দিনে একদিন ফাইল দেখতে আসে, লুদু সালাম করে দাঁড়াইয়া বলে, 'আমার নালিশ আছে হুজুর।' পূর্বের সুপাররা নাকি বি ক্লাস কয়েদির কথা বেশি শুনতো না। নিয়ামতুল্লা সাহেব সকলের কথা মনযোগ দিয়ে শোনেন। আমি যখন জেলে, একদিন সুপার সাহেবকে আধাঘণ্টা দাঁড়া করে লুদু নালিশ করল। জেলার থেকে শুরু করে সুবেদার, ডাক্তার সকলের বিরুদ্ধেই সে বলল। কিছু কিছু সত্য কথাও বলেছিল। সে জানতো এই নালিশ করার পর

তার বিপদ হবে। কিন্তু পরোয়া নাই। কারণ, তাকে রাতে সেলে থাকবার হুকুম দিয়েছে। দিনে সেল এরিয়ার বাইরে যাওয়ার হুকুম নাই। পানি টানে, ঝাড়ু দেয়, কাজ সে বেশি করে না। তার ইচ্ছা মতো চলে।

আমার বাগানে সে ঝাড়ু দিতো মাঝে মাঝে; গাছেও মাঝে মাঝে পানি দিত। আমি বললে আপত্তি করত না।

এবার লুদুর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। সে বলে, 'আর পকেট মারবো না, ভালভাবে থাকবো'। জেল হলে এখন তার আর ভাল লাগে না। তার স্ত্রীর কথা বলে মাঝে মাঝে দুঃখ করত। কারণ, শাশুড়ি নাকি তার স্ত্রীকে নিয়ে দুইবার তালাকের জন্য এসেছে। লুদু রাজি ছিল, তার স্ত্রী শোনে না, সে তার মাকে বলে 'দেখেই তো বিয়ে দিয়েছিলে যে ও চোর। তবে এখন কেন তালাক নিতে বল। আমার কপালে যা আছে তাই হবে। ও কতদূর যায় শেষ না দেখে ওকে ছাড়ব না।' এই কথা লুদু বলে দুঃখ করে, আর বলে নিজের জন্য দুঃখ নাই, দুঃখ হলো ওর জীবনটা শেষ করে দিলাম। একটা ছেলে ছিল তাও মারা গেছে, ও কী করে থাকবে জানি না।

লুদু জেলের বাহির হয়ে কি করবে জানি না, তবে কথায় বার্তায় মনে হয়, ওর জীবনের উপর একটা ধিক্কার এসেছে।

২রা জুন ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম রাত্রে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে। কয়েদিরা, সিপাহিরা আলোচনা করছে। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুঝতে বাকি রইল না আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে এসেছে, ৭ই জুনের হরতালকে বানচাল করার জন্য। অসীম ক্ষমতার মালিক সরকার সবই পারেন। এত জনপ্রিয় সরকার তাহলে গ্রেপ্তার শুরু করেছেন কেন! পোস্টার লাগালে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, মাইক্রোফোনের অনুমতি না দেওয়া, অনেক অত্যাচারই শুরু করেছে। জেলের এক কোণে একাকী থাকি, কিভাবে খবর জানব?

এদিকে কয়েদি ডিআইজি যথা জেল সুপারেনটেনডেন্ট সাহেব আজ সেল এরিয়ায় আসবে। সিপাই জমাদার সকলেই ব্যস্ত। আমাকে সেল এরিয়ায়ই রাখা হয়েছে। এখানে আমার ঘরটা ছাড়া সবই সেল। এখানে অনেক একরারী এবং সাংঘাতিক প্রকৃতির কয়েদি আছে। যারা একবার জেল থেকে পালিয়েছিল অথবা পালাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের এই এরিয়ায় রাখা হয়। ডিআইজি সাহেব এক এক সপ্তাহে এক এক দিক পরিদর্শন করেন। কারও কোনো অসুবিধা হলে, কাকেও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করলে, তাঁর কাছে অভিযোগ করা যেতে পারে। কারও কোনো দুঃখ থাকলে তাও বলা যায়। যদি কোনো জেল কর্মচারী কোনো কয়েদির উপর অত্যাচার করে তাহলে তারাও নালিশ করতে পারে। তা ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তাও দেখেন তিনি।

আজ সেল এরিয়ায় তিনি আসবেন। আমি জেলে আসার পর জেল আইজি সাহেব যখন এসেছিলেন তাঁর সাথে এসেছিলেন। আর একদিন রাত্রে যেদিন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তিনি নিজেই সিভিল সার্জন সাহেবের সাথে দেখতে এসেছিলেন আমাকে, তখন রাত্র ১০টা।

আজ জেল সুপার পরিদর্শন করতে আসবেন, তাই হৈ চৈ পড়ে গেছে। চুনা লাগাতে লাগলো। পায়খানা পরিষ্কার করতে শুরু করল কয়েদিরা। সাজ সাজ রব। আমার মেট ও কয়েদিরা ঘরটাকে পরিষ্কার করল। রোজই কিছু কিছু করে। তবে আজ আলাদাভাবে। যদি কোনো আবর্জনা থাকে তবে মেট ও কয়েদিদের দণ্ড দেওয়া হয়। জেলের মধ্যে কয়েদির দণ্ড সবচেয়ে দুঃখের। এতে যে দিনগুলিতে কাজ করে মার্কা পায় সেগুলি কেটে দেওয়ার ক্ষমতা জেল কর্তৃপক্ষের আছে।

শুনলাম ১২/১৩ জন রাতে এসেছে। নাম কেউ বলতে পারে না বা বলতে পারলেও বলবে না। খবরের কাগজে কারও কারও নাম উঠবে। একই জেলে থেকেও কারও সাথে কারও দেখা হওয়া তো দূরের কথা, খবরও পাওয়ার সাধ্য নাই নতুন লোকের পক্ষে। তবে আমি পুরানা লোক—বহুবার এই জেলে অতিথি হয়েছি। এই জেলের সকলেই আমাকে জানে। নিশ্চয়ই বের করে নেব।

ডিআইজি সাহেব জেলের ডেপুটি জেলারসহ সকলকে নিয়ে আসলেন। আমার ঘরেও এলেন, একটু বসলেনও। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছেন'? বললাম শরীর অনেকটা ভাল, কোনো অসুবিধা নাই। কারণ, বলে কোনো লাভ নাই যে আমাকে কেন আলাদা করে একাকী রেখেছেন? গোয়েন্দা বিভাগ নাকি আদেশ করেছে। ভবিষ্যতে দরকার হলে কেউই স্বীকার করবে না, সে আমি জানি। যাহোক, তারপর তিনি উঠে গেলেন। আমি আমার জায়গায় বসে রইলাম। চিন্তা একই, কে কে এল!

আবদুল মোমিন এডভোকেট, প্রচার সম্পাদক আওয়ামী লীগ, ওবায়দুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হাফেজ মুছা, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি, মোস্তফা সরোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, সহ-সভাপতি ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ, রাশেদ মোশাররফ, সহ সম্পাদক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ কর্মী হারুনুর রশিদ ও জাকির হোসেন। দশ সেলে এদের রাখা হয়েছে। এত খারাপ সেল ঢাকা জেলে আর নাই। এখানে আমাদের প্রথম রাখা হয়েছিল। আমরা প্রতিবাদ করে ওখান থেকে চলে আসি। বাতাস ঐ সেলে ভুল করেও ঢোকে না। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ডেপুটি জেলার সাহেবকে বললাম। শুনলাম মোমিন সাহেব ডিআইজি সাহেবকে বলেছেন।

মোস্তফা সরোয়ারের ব্যবসার খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। পাটের ব্যবসা, একদিন না থাকলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। খুব আঘাত পেলাম। এই নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য আন্দোলন যে পিছাইয়া যাবে না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। বুঝলাম সকলকেই আনবে জেলে। ধরতে পারলে কাউকে ছাড়বে না। মীজান ফিরে এসেছে এই একটা ভরসা। অনেকে আবার ভয়েতে ঘরে বসে যাবে, সে আমার জানা আছে। হাফেজ মুছা সাহেব বুড়া মানুষ, কষ্ট পাবেন হয়তো, পূর্বে কোনো দিন জেলে আসেন নাই। তবে শক্ত মানুষ। চৌধুরী সাহেব বেচারা খুবই নরম। আর সকলেই শক্ত আছে। আন্দোলনের ক্ষতি হবে এই ভাবনা আমার মনটাকে একটু চঞ্চল করেছে।

কোনোমতে খেয়ে বসে রইলাম, খবরের কাগজ কখন আসবে! কাগজ এল। বহুদিনের গোলমালের পরে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে আপোষ হয়ে গেছে। বন্ধুভাবে বসবাস করার কথা যুক্তভাবে ঘোষণাও করেছে।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে খবর এসেছে পুলিশ বাহিনী নিজেরাই দিনের বেলায় ৭ই জুনের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় তো করছেই। এই তো স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি!

এক অভিনব খবর কাগজে দেখলাম, মর্নিং নিউজ কাগজে ন্যাপ নেতা মিঃ মশিয়ুর রহমানের ফটো দিয়ে একটা সংবাদ পরিবেশন করেছে। ইত্তেফাক ও অন্যান্য কাগজেও খবরটি উঠেছে। তিনি ছয় দফার দাবি সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ছয় দফা কর্মসূচী কার্যকর হইলে, পরিশেষে উহা সমস্ত দেশে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবে। এমন কি তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হতেন তাহা হলে ছয় দফা বাস্তবায়িত হতে দিতেন না।' এদের এই ধরনের কাজেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধরা পড়ে গেছে জনগণের কাছে। জনগণ জানে এই দলটির কিছু সংখ্যক নেতা কিভাবে কৌশলে আইয়ুব সরকারের অপকর্মকে সমর্থন করছে। আবার নিজেদের বিরোধী দল হিসেবে দাবি করে এরা জনগণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। এরা নিজদেরকে চীনপন্থী বলেও থাকেন। একজন এক দেশের নাগরিক কেমন করে অন্য দেশপন্থী, প্রগতিবাদী হয়? আবার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চিৎকার করে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে যদি তদন্ত করা যায় তবে দেখা যাবে, মাসের মধ্যে কতবার এরা পিন্ডি করাচী যাওয়া-আসা করে, আর পারমিটের ব্যবসা বেনামীভাবে করে থাকে। এদের জাতই হলো সুবিধাবাদী। এর পূর্বে মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে।

মওলানা সাহেবকে আমি জানি, কারণ তিনিই আমার কাছে অনেকবার অনেক প্রস্তাব করেছেন। এমন কি ন্যাপ দলে যোগদান করেও। সেসব আমি বলতে চাই না। তবে 'সংবাদে'র সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী সাহেব জানেন। এসব কথা বলতে জহুর ভাই তাঁকে নিষেধও করেছিলেন। মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে এক কথা বলেন, আর পূর্ব বাংলায় এসে অন্য কথা বলেন। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে কেউ তাঁকে বেশি জানে না। তবে রাজনীতি করতে

হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত।

বিকাল হয়ে গেল। কাগজ রেখে উঠে পড়লাম। একটু পরে দরজা বন্ধ করতে এল। ঘরে ঢুকে বই পড়তে শুরু করলাম। কাজ তো একটাই। খাওয়া শেষ করে এসে শুয়ে পড়া।

ভোর দুইটায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এক পাগল ক্ষেপে গিয়েছে। খুব জোরে চিৎকার করছে আর গালাগালি করছে। সন্ধ্যার সময় এক পাগল চিৎকার করছিল, তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে অনুরোধ করায় তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কখন কোন পাগল ক্ষেপে উঠে বুঝবে কেমন করে? আর কি ঘুম হয়! বৃষ্টি হয়েছে, বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে।

৩রা জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

ঘুমে যখন আর পড়তে পারি নাই তখন তালা খুলে দেওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়লাম। দেখি জমাদার সাহেব লুঙ্গি পরা দুইজন লোক নিয়ে পুরানা বিশ সেলের দিকে যাচ্ছেন। বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা মাথায়, বুঝলাম আরও কিছু আমদানি হয়েছে। জেলে নতুন কয়েদি এলে 'আমদানি' বলে, আর চলে গেলে 'খরচ' বলে। আমার বারান্দা থেকে দেখা যায় পুরানা বিশ সেলে দুইজনকে রেখে জমাদার সাহেব ফিরে চলেছেন। বললাম, বোধ হয় রাতে ঘুমাতে পারেন নাই? সোজাভাবে জিজ্ঞাসা করলে বলবে না। বলল, আপনার জন্য কি আর শান্তিতে জেলের চাকরি করতে পারব! রাত দুইটা থেকে এই একই অবস্থা। একে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। জেলের কয়েদিরা দুনিয়ার খবর রাখে। বৃষ্টি থেমে গেলে খবর পেলাম দুইজন এসেছে ১০ সেলে। 'এই দুইজনও শেখ সাহেবের দলের'—কয়েদিরা বলাবলি করতে থাকে। নাম কি করে জানবো? পরে খবর পাওয়া গেল, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল হক সাহেব, আর একজন আওয়ামী লীগের সদস্য নন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন জীবন ভরে, নাম আবদুল মাজেদ সরদার। পুরানা ঢাকার নাম করা সরদার। বেলা ১২টার সময় তাকে আবার মুক্তি দেওয়া হলো। কারণ বুঝতে কারও বাকি থাকে না!

আজ আর লেখাপড়ায় মন দিতে পারছি না। কি হবে বাইরে, কর্মীদের কি অবস্থা, অত্যাচার ও গ্রেপ্তার সমানে চলছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর।

দিন ভরই ছটফট করতে লাগলাম, কাগজ পাব কখন? একটা বেজে গেল, দুইটাও বেজে গেল, মনে মনে ভীষণ রাগ হলাম। জমাদার সাহেবকে খবর দিলাম। বললাম, কাগজ এখনও আসে নাই কেন? ভীষণ অন্যায় কথা। সকালে কাগজ আসে, আর এখন আড়াইটা প্রায় বাজে। তিনি জেল অফিসে চলে গেলেন। খবর নিয়ে এসে বললেন, ডিপুটি সাহেবের সই হয় নাই। দস্তখত না হওয়া পর্যন্ত কাগজ জেলের ভিতর আসে না, এখানেও সেন্সর হয়। তিনটার সময় কাগজ এল। অর্ধেক কাগজ কালো কালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। পড়ার উপায় নাই। যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের নামও ঢেকে দিয়েছে। শুধু ইত্তেফাক নয়, আজাদ ও পাকিস্তান অবজারভার কাগজেও কালি দিয়ে দিয়েছে, অথচ জেল কর্তৃপক্ষের সেন্সর করার কোনো অধিকার নাই। জেলের মধ্যে কোনো ঘটনা, বা কোনো আসামি পালাইয়া গেলে, কেউ অনশন করলে কালি দিয়ে বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু অন্য কিছু করা তাদের উচিত না। আমি জেলার সাহেব ও ডিপুটি সাহেবকে খবর দিলাম এর প্রতিবাদ করার জন্য। কাগজ দিতে যদি না চান, মানা করে দেন, কিন্তু কাগজ নষ্ট করবেন কেন!

শুনলাম জেলার সাহেব অসুস্থ, অফিসে আসেন নাই। ডিপুটি সাহেব পরে আসবেন। বিকাল বেলা যে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম তাও আজ করতে পারলাম না। কারণ আমার সহকর্মীদের যে অবস্থায় রেখেছে—তাদের ডিভিশনও দেওয়া হয় নাই। আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমার যখন তিনদিন পরে ডিভিশন আসে, তখন এদের কথা তো ঢাকার নতুন ডিসি সাহেবের মনেই না থাকবার কথা। কারণ তাকে মোনায়েম খাঁ সাহেব ময়মনসিংহ থেকে বদলি করে এনেছেন। তার 'কীর্তি' অনেকেরই জানা আছে। আর আশা করি মনেও থাকবে। পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না।

হায়রে দেশ! হায়রে রাজনীতি! লুমুম্বার হত্যার পিছনে যারা ছিল তারাই আজ ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দিল। কঙ্গোর একজন প্রধানমন্ত্রীসহ চারজন সাবেক মন্ত্রীর প্রকাশ্য জায়গায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ২০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদের দাবা খেলা এখনও চলছে। জেনারেল মোবুতু যে পথ বেছে নিয়েছে সে পথ বড় কন্টকাকীর্ণ। রক্তের পরিবর্তে রক্তই দিতে হয়। একথা ভুললে ভুল হবে। মতের বা পথের মিল না হতে পারে, তার জন্য ষড়যন্ত্র করে বিরুদ্ধ দলের বা মতের লোককে হত্যা করতে হবে এ বড় ভয়াবহ রাস্তা। এ পাপের ফল অনেককেই ভোগ করতে হয়েছে।

শরীরটা ভাল লাগছে না। সেল এরিয়ার সবই বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমাকে বন্ধ করা হবে। দরজা বন্ধ হলো, কিছু সময় বসে রইলাম চুপ করে। মেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাই খেতে গেলে, "স্যার আর একটু নেন, একটু মাছ, একটু তরকারী।" বেচারা আমাকে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। "এতবড় শরীর আধা পোয়া চালের ভাত খাবেন না, তাহলে বাঁচবেন কেমন করে?" শুধু ভাবি, তোমাদের এই স্নেহের প্রতিদান কি করে দিতে পারব?

আমার বাবুর্চি একটু চালাক চতুর ছেলে, কেরামত নাম। বলে, "স্যার আপনি তো জানেন না—যেখানে দুইশত তিনশত কয়েদি থাকে তারা নামাজ পড়ে আপনাকে দোয়া করে। তারা বলে, আপনি ক্ষমতায় থাকলে তাদের আর চিন্তা থাকতো না।" দুঃখ হয়, এদের কোনো কাজেই বোধ হয় আমি লাগব না। অনেক গল্প শুনলাম—কয়েদিরা কি বলে সে সম্পর্কে। তবে একথা সত্য, যখন আমি জেল অফিসে যাই তখন কয়েদিদের সাথে দেখা হলে, জেল অফিসারদের সামনেই আমাকে সালাম দিতে থাকে। যারা দূরে থাকে তারাও এগিয়ে আসে। বুড়া বুড়া দু'একজন বলেই ফেলে, 'বাবা, আপনাকে আমরা দোয়া করি'।

খেতে যে পারি না, তার বিশেষ কারণ জেলের পাক। কয়েদিরা পাকায়—ভালই লাগে না। তবুও খেতে হবে, তবুও বাঁচতে হবে। যারা এই দুই দিনে জেলে এসেছে, তাদের ডিভিশন দেয় নাই, কিভাবে কোথায় রেখেছে—জানার উপায় নাই।

ঠান্ডা ছিল, বৃষ্টি হয়েছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। যদি জেলের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটাতে পারতাম তা হলে কত ভালই না হতো!

৪ঠা জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

সকালে বাইরে বসে আছি। একজন লোক, ঝাড়ুদফায় কাজ করত, অসুস্থ হয়ে জেল হাসপাতালে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে এসেই আমার কাছে এল। এসে বললো, "আমাকে আপনি ছেড়ে দেন, আপনি বললেই জেল থেকে বের করে দিবে।" আমি বললাম, "আমি তো তোমার মতো একজন কয়েদি, আমার ক্ষমতা থাকলে আমিই বা জেলে আসব কেন?" সে বলে : "আপনি কলম মাইরা দিলেই কাজ হয়ে যায়।" বললাম, "কলম আছে, কিন্তু মাইরা দিবার ক্ষমতা নাই।" সে কি শোনে, তাকে ছাড়াতেই হবে? সে আমাকে বলে, "আমি ১৪/১৫ বৎসর জেল খাটলাম, আমাকে ছাড়ছে না।"

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ৫/৬ বৎসর খেটেছে। মাথা একটু খারাপ আছে। প্রথমে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, পরে বিশ বৎসর সাজা দেওয়া হয়েছে। বাবা ছোটকালে মারা গেছে। মা জেলে আসবার পরে মারা গেছে। দিনভর নামাজ পড়ে, আর সকলকে দোয়া করে। সকলেই ওকে ক্ষেপায়, কিন্তু ও ক্ষেপে না, আস্তে আস্তে কথাগুলি বলে। সাজা কত খেটেছে সেটা ঠিক মতো উঠায় নাই। সময় পেলেই আমার কাছে আসে, আর ঐ এক কথা। পরে বুঝলাম অন্যান্য কয়েদিরা ওকে ফুসলায়, 'সাহেবকে ধর, ভাল করে ধর, খালাস হয়ে যাবি।' শুধু কি কয়েদিরা, সিপাই, জমাদারও ওকে বলে, যাও শীঘ্র ঐ সাহেবের (আমার) কাছে, কাজ হয়ে যাবে। আর যায় কোথায়! এসে হাজির! ওকে আর বুঝাইয়া লাভ নাই কারণ ও বুঝবে না।

আজ বাবুর্চিকে বললাম, "আমিই পাকাব, তুমি সব ব্যবস্থা করে আমাকে ডাক দিও।" পড়তে বসলাম। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতেছে। ঘরেই থাকতে হবে। বাইরে যাওয়ার উপায়ও নাই। রোজই কিছু কিছু লোক ধরে আনছে। ঢাকা শহরের বাসিন্দাই বেশি—হরতাল বানচাল করার জন্য।

৯টার সময় বাবুর্চি এল আমাকে ডাকতে। গেলাম পাকের ঘরে, বসলাম চেয়ার নিয়ে। যদিও বাইরে কোনোদিন পাক করার সময় আমি পাই না। আর প্রয়োজনও কোনোদিন হয় নাই। তবু জেলে এসে যখন একা থাকতাম তখন পাক করতাম। সময় তো কাটানো যায়। ডাল আগেই পাকাইয়াছে। পটল ভাজি করলাম। ইলিশ মাছ পাক করলাম। নিজেই পাক করেছি, সে জন্য মন্দ লাগল না।

খবরের কাগজ এসে গেল—দেখে আমি শিহরিয়া উঠলাম, এদেশ থেকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ চিরদিনের জন্য এরা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে! জাতীয় পরিষদে, 'সরকারী গোপন তথ্য আইন সংশোধনী বিল' আনা হয়েছে। কেউ সমালোচনামূলক যে কোনো কথা বলুন না—কেন মামলা দায়ের হবে। ডিপিআর তো আছেই, সিকিউরিটি অব পাকিস্তান আইন তো আছেই। এ ছাড়া ১২৪ ধারাও আছে।

বক্তৃতা করার জন্য, ১২৪ ধারা ৭(৩) (ইস্ট পাকিস্তান স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্স) এবং ডি পি আর রুল দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মোটমাট পাঁচটি মামলা আর অন্যান্য আরও তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রফেসর ইউসুফ আলী ভাল বক্তৃতাই করেছেন। বক্তৃতা করলে কি হবে, কে কার কথা শোনে! সরকারের পক্ষ থেকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ডিপিআর দিয়ে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। তাসখন্দে শান্তি চুক্তি করে এসে আরও অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু করেছে। নিশ্চয়ই এই আইনও তারা ব্যবহার করবে বিরুদ্ধ দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ দেশকে তারা কোথায় নিতে চায় বুঝতে আর বাকি নাই। যে কোনো বক্তৃতা বা বিবৃতিকে সরকার অপব্যাখ্যা করে মামলা দায়ের করতে পারে।

ইত্তেফাক দেখে মনে হলো ৭ই জুনের হরতাল সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ছাপাতে পারবে না বলে সরকার হুকুম দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আরও হুকুম দিয়েছিল, 'এক অংশ অন্য অংশকে শোষণ করেছে এটা লখতে পারবা না। ছাত্রদের কোনো নিউজ ছাপাতে পারবা না। আবার এই যে হুকুম দিলাম সে খবরও ছাপাতে পারবা না।' ইত্তেফাকের উপর এই হুকুম দিয়েছিল। এটাই হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! আমরা তো লজ্জায় মরে যাই। দুনিয়া বোধ হয় হাসে আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেখে! যে দেশে মানুষের মতামত বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে কেমন করে? যারা আজও বুঝছে না, জীবনেও বুঝবে না।

আমার ভয় হচ্ছে এরা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতেছে। আমরা এপথে বিশ্বাস করি না। আর এ পথে দেশে মুক্তিও আসতে পারে না। কিন্তু সরকারের এই নির্যাতনমূলক পন্থার জন্য এদেশের রাজনীতি 'মাটির তলে' চলে যাবে। আমরা যারা গণতন্ত্রের পথে দেশের মঙ্গল করতে চাই, আমাদের পথ বন্ধ হতে চলেছে। এর ফল যে দেশের পক্ষে কি অশুভ হবে তা ভাবলেও শিহরিয়া উঠতে হয়! কথায় আছে, 'অন্যের জন্য গর্ত করলে, নিজেই সেই গর্তে পড়ে মরতে হয়'।

বড় সুখের খবর, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রুশরা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। রুশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব কায়েম হউক এটাই আজ সাধারণ মানুষের কামনা।

ইন্দোনেশিয়া দুনিয়াকে বেশ খেলা দেখাল। সে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে রেজিস্ট্রি করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই পাকিস্তানের আপন মার পেটের ভাই।

বন্ধু শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই, বাইরে পড়তে সময় পাই নাই। যা হোক আওয়ামী লীগ কর্মীরা আর ছাত্র তরুণ কর্মীরা কাজ করে যেতেছে। বেপরোয়া গ্রেপ্তারের পরও ভেঙে পড়ে নাই দেখে ভালই লাগছে। রাজনৈতিক কর্মীদের জেল খাটতে কষ্ট হয় না যদি বাইরে আন্দোলন থাকে।

আজাদ কাগজ দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। প্রথম লিখেছে, 'উজিরসভা হইতে জনাব ভুট্টোর পদত্যাগ আসন্ন।' মোটেই আশ্চর্য হলাম না—যখন চিন্তা করলাম। এটাই তো স্বাভাবিক। ডিকটেটররা যখন দরকার হয় খুব ব্যবহার করে, আর যখন দরকার ফুরিয়ে যায়, ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফেলে দেয়। ছেঁড়া কাপড় তো অনেক সময় দরকারে লাগে, স্বৈরশাসকদের সে দরকারও হয় না। একদম বিদায়। টু শব্দ করার ক্ষমতা নাই।

প্রায় তিনটার সময় বিজলি পাখা খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু গরম যায় না। অনেক খবর দিলাম, জেল অফিসে। সন্ধ্যার সময় এসে ঠিক করে দিয়ে গেল। বিকাল বেলা পাকের ঘরে যেয়ে মুরগি পাক করে নিয়ে এলাম। বেশি ভাল হয় নাই, কারণ মশলা ঠিক করে দিতে পারি নাই।

সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু পরে ভিতরে যেতে হবে। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। রুমে বসে লেখাপড়া করা ছাড়া উপায় কি! তাই পড়লাম বইটা নিয়ে। পরে আপন মনে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলাম। মনে পড়ল আমার বৃদ্ধ বাবা-মার কথা। বেরিয়ে কি তাঁদের দেখতে পাব? তাঁদের শরীরও ভাল না। বাবা বুড়া হয়ে গেছেন। তাঁদের পক্ষে আমাকে দেখতে আসা খুবই কষ্টকর। খোদার কাছে শুধু বললাম, "খোদা তুমি তাঁদের বাঁচিয়ে রেখ, সুস্থ রেখ।"

৫ই জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

ঘুম থেকে উঠে বাইরে যেয়ে বসলাম। জমাদার এসেছেন। শুনলাম পাগলদের গোসল করান হচ্ছে, একটু এগিয়ে যেয়ে দেখি সব উলঙ্গ। এক একজনকে ধরে এনে এনে চৌবাচ্চার ভিতরে ঠেসে ধরছে। ভাল করে গোসল করায় ওদের। কতকাল যে ওরা এভাবে পড়ে আছে আর কতকাল থাকবে কে জানে! মাঝে মাঝে ভাল হয়, আবার মাঝে মধ্যে খারাপ হয় এবং পাগলামি করে। এদের কেহ আপনজনকে খুন করে এসেছে, কেহ বা পাগল হয়ে খুন করেছে। কেহ বা বাইরে পাগল হয়ে গেছে, পরিবারের লোকেরা সামলাতে না পেরে জেলখানায় দিয়ে গেছে। একবার জেলে এলে খুব কম লোকই ভাল হয়েছে। দুই একজন ভাল হলেও তাদের ছাড়তে এত দেরি করে ফেলে যে—আবারও পাগল হয়ে যায়। এ খবরও আমি পেয়েছি। দুই একজন ভাল হয়ে বাইরেও চলে গিয়াছে, তবে বেশির ভাগ আজিমপুর কবরস্থানেই যেয়ে থাকে। একবার জেলের গল্প করতে করতে আমার একমাত্র সহধর্মিণীকে বলেছিলাম, "যদি কোনোদিন পাগল হয়ে যাই তবে পাগলা গারদে বা জেলের পাগলখানায় আমাকে দিও না।"

ফণীকে ডেকে আনলাম। ফণীও কিছুদিন পাগল ছিল এখন ভাল হয়েছে। গান মন্দ গাইতে পারে না। বললাম, ফণী বাবু গান গাও। সে দেহতত্ত্ব, মারফতী, কীর্তন মন্দ গায় না। দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াতো। যখন সে গান গায় মনে হয় কোথায় যেন চলে গিয়াছে আর এ দুনিয়ায় নাই। একটার পর একটা গান গেয়ে চলে। কত গান যে সে জানে তার কোনো ঠিক নাই। অফুরন্ত ভাণ্ডার। আজকাল রোজই তার গান শুনি। কারণ আমি যেখানে থাকি সেখানে সে ঝাড়ু দফায় কাজ করে।

জমাদার ও সিপাহি সাহেবরাও তার গান শোনে। সকলেই ওকে স্নেহ করে, কারণ সরল লোক। মনে আর মুখে একই কথা। এ সমস্ত গান আমি যখন ছোট ছিলাম অনেক শুনেছি। জেলের মধ্যে এমন গান খুব ভালই লাগে। ওর তো কাজ আছে আমার তো কাজ নাই। ওকে ছেড়ে দিতে হলো। ঘরে এসে আবার সংশপ্তক বইয়ের মধ্যে নিজকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

আজ খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে গেলে গরমও পড়ে। পাখা খারাপ হয়ে গেছে খবর দিয়েছি মিস্ত্রী পাঠাতে। দিনভর বৃষ্টি। আজ আবার ন্যাপের

জনসভা। সভাটি হওয়া প্রয়োজন। বহুদিন পরে এরা মিটিং করছে। মওলানা ভাসানী সাহেবের ভুল নীতির জন্য এই দলটি জনসমর্থন যা কিছু ছিল তাও হারাইয়া ফেলেছে দিন দিন।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে। আরও আটজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে বিভিন্ন জায়গায়। দমননীতি সমানে চালাইয়া যেতেছে সরকার। নির্যাতনের মধ্য দিয়ে গণদাবি দাবাইয়া দেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে, গণতান্ত্রিক পথেই মোকাবিলা করা উচিত। যে পথ অবলম্বন করেছে তাতে ফলাফল খুব শুভ হবে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছে। ছয় দফা দাবি যখন তারা দেশের কাছে পেশ করেছে তখনই প্রস্তুত হয়ে গিয়াছে যে তাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। এটা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়, জনগণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম। যথেষ্ট নির্যাতনের পরেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা দেশের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাই। তবুও পোস্টারগুলি পুলিশ দিয়ে তুলে ফেলান হতেছে। ছাপানো পোস্টার জোর করে নিয়ে যেতেছে সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে।

আমার মনে হয় মোনায়েম খান সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান গিয়ে কোনো কোনো বন্ধুর কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন এটা পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তান নহে! আন্দোলন করা এবং নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা এরা রাখে। তিনি অনেক বড় বড় কথা বলেন। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বকেই চলেছেন। মানুষের স্মৃতিশক্তি কিছুটা আছে, এত তাড়াতাড়ি তারা ভুলে যায় না। তিনি যখন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ও নূরুল আমীন সাহেবের সমর্থক ছিলেন তখন ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের কর্মকর্তাও ছিলেন। মুসলিম লীগের নমিনী হিসেবে গণপরিষদের সদস্য হয়ে করাচীতে গিয়ে প্রত্যেক কাজে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দাবাইবার জন্য। ময়মনসিংহে গুণ্ডা ভাড়া করে আমাদের কর্মীদের উপর অত্যাচার করেছেন। পূর্ব-বাংলার যে-কোনো আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াতেন, সেকথা ভোলেন কি করে? ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি রফিকউদ্দিন ভূঁইয়াকে আড়াই বৎসর পর্যন্ত জেলে রাখার জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন। নূরুল আমীন সাহেব তার কথা মতোই ময়মনসিংহে কাজ করতেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগে ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত

এই দীর্ঘ ১১ বৎসরের মধ্যে ৯ বৎসর মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় ছিল। তখন তিনি মুসলিম লীগের সভ্য হয়েও একদিনও পূর্ব বাংলার শোষণের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নাই। শুধু সমর্থন করেন নাই, ভাতা নিয়ে সমর্থন করেছেন। তিনি যখন ইসলামের নাম করে সত্য কথা না বলে, এমন কি মাথায় কিস্তি টুপি দিয়ে রাজনীতিবিদদের গালাগালি করেন তখন হাসি পায়। বাইরে থাকতেও কোনোদিন এদের কথার উত্তর দিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই। কারণ আমি জানি এদের চাকরি আইয়ুব খান সাহেবের দয়ার উপর নির্ভর করে। তাঁকে খুশি রাখলে সব ঠিক, জনমতের এরা কি ধার ধারে?

খবরের কাগজ এল। পাকিস্তান অবজারভার দেখে ভাবলাম বোধহয় খবর একটু এরা ছাপে আজকাল। আমি নিজে অবজারভার সকল সময়ই পড়ি। একবার কয়েকদিনের জন্য রাগ হয়ে বন্ধ করেছিলাম বাইরে থাকতে। আবার নিলাম, কারণ যাহাই হউক না কেন পূর্ব বাংলার কাগজ। মর্নিং নিউজের মতো পশ্চিমা শিল্পপতিদের মুখপাত্র নয়। এবং সরকারের অন্ধ সমর্থকও নয়। আজাদ কাগজ সকল সময়ই কিছু কিছু সংবাদ বহন করে। মতের মিল না থাকতে পারে, সংবাদপত্র কেন সংবাদ দিবে না। বিকাল পর্যন্ত কাগজই পড়লাম। এখন একমাত্র চিন্তা কর্মীরা নেতা ছাড়া আন্দোলন চালাইয়া যেতে সক্ষম হবে কিনা! আমার বিশ্বাস আছে আওয়ামী লীগের ও ছাত্রলীগের নিঃস্বার্থ কর্মীরা, তাদের সাথে আছে। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নেতা—যারা সত্যই শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করে—তারাও নিশ্চয়ই সক্রিয় সমর্থন দেবে। এত গ্রেপ্তার করেও এদের দমাইয়া দিতে পারে নাই। ৭ই জুন হরতালের জন্য এরা পথসভা ও মিছিল বের করেই চলেছে। পোস্টার ছিঁড়ে দিলেও নতুন পোস্টার লাগাইতেছে, প্যামফ্লেট বাহির করছে। সত্যই এতটা আশা আমি করতে পারি নাই।

বিকাল বেলা বাইরে বসেই চা খেয়ে নিলাম। তারপর স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। একটু পরেই আবার বৃষ্টি এল। সন্ধ্যার পূর্বে বৃষ্টি বন্ধ হলো। একটু বাইরে যেয়ে হাঁটাহাঁটি করছি এমন সময় দেখলাম, হাসপাতাল থেকে কে যেন আমাকে সালাম দিতেছে। অনেক দূরে চেনা যায় না। চোখে চশমা ছিল না। তবে ভাবলাম নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের কেহ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছে। চশমা আনতে বললাম। চশমা পরে দেখলাম, আরে এতো আমাদের শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের

সহ-সভাপতি। আমাকে ইশারা দিয়ে দেখাল, পেটে হাত দিল। বুঝলাম পেটের কোনো যন্ত্রণা এবং জ্বর হয়েছে। বেচারা আর কোনোদিন জেলে আসে নাই। এই প্রথম জেল তার মধ্যে আবার অসুখ হলে ভেঙে পড়বে। পরের দিন খবর নিলাম অনেকটা ভাল আছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। ঘরে এলাম, তালা বন্ধ হলো। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ঘরেই থাকতে হবে। মাথার ভিতর শুধু ৭ই জুনের চিন্তা। কি হবে! তবে জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। জনমত আমার জানা আছে।

৬ই জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ব বাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয়দফা সমর্থন করবে। তবে মোনায়েম খান সাহেব যেভাবে উস্কানি দিতেছেন তাতে গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা যে তিনি করছেন। এটা বুঝতে পারছি। জনসমর্থন যে তার সরকারের নাই তা তিনি বুঝেও, বোঝেন না।

ঘরে এসে বই পড়তে শুরু করে আবার মনটা চঞ্চল হয়ে যায়, আবার বাইরে যাই–কেবল একই চিন্তা! এইভাবে সারা সকালটা কেটে গেল। খাওয়া-দাওয়া কোনোদিকেই আমার নজর নাই। ভালও লাগছে না কিছুই। যা হোক দুপুর বেলা খাওয়ার পূর্বেই কাগজগুলি এল।

ধরপাকড় চলছে সমানে। কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। যশোর আওয়ামী লীগ অফিস তল্লাশি করেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মশিয়ুর রহমান প্রতিবাদ করেছেন। জনাব নূরুল আমীন সাহেব আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মুক্তি দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শত্রুবিনাশের জন্য রচিত আইনে দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার দেশবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে।' ঢাকার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যরা এক যুক্ত বিবৃতিতে আমাকে সহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করিয়াছে, আর ৬দফার দাবিকে সমর্থন করিয়াছে এবং জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছে।

৯ জন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিও ধরপাকড়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং তাদের মুক্তি দাবি করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ, শ্রমিক, ছাত্র ও যুব কর্মীরা হরতালকে সমর্থন করে পথ সভা করে চলেছে। মশাল শোভাযাত্রাও

একটি বের করেছে। শত অত্যাচার ও নির্যাতনেও কর্মীরা ভেঙে পড়ে নাই। আন্দোলন চালাইয়া চলেছে। নিশ্চয়ই আদায় হবে জনগণের দাবি।

গভর্নর নারায়ণগঞ্জ জনসভায় আবার হুমকি ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করলে কঠোর হস্তে দমন করবেন। আইন শৃঙ্খলা আওয়ামী লীগ কোনোদিন ভাঙতে চায় নাই। তারা বিশ্বাসও করে না ঐ রাজনীতিতে। কিন্তু যিনি আইন শৃঙ্খলার মালিক হয়ে আইন শৃঙ্খলা ভাঙতে উস্কানি দিতেছেন তার বিচার কে করবে? যার সরকার বেআইনি এবং অন্যায়ভাবে কর্মীদের হয়রানি করছেন, গ্রেপ্তার করছেন তার বিচার কবে হবে? মোনায়েম খান সাহেবের জানা উচিত ১৯৪৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা অনেকবার জেলে গেছেন, মিথ্যা মামলার আসামিও হয়েছেন। পূর্বের সরকার এবং মুখপাত্ররা এ রকম হুমকি অনেকবার দিয়েছেন।

সরকার কর্মীদের বন্দি করেও অত্যাচার করেছে, ২৪ ঘণ্টা তালা বন্ধ করে রেখেছে জেলের মধ্যে। নারায়ণগঞ্জে মোস্তফা সারওয়ার, শামসুল হক ভূতপূর্ব এম পিএ, হাফেজ মুছা সাহেব, আবদুল মোমিন এডভোকেট, ওবায়দুর রহমান, শাহাবুদ্দিন চৌধুরীর মতো নেতৃবৃন্দকে 'সি' ক্লাস করে রাখা হয়েছে। কি করে এই সরকার সভ্য সরকার বলে দাবি করতে পারে আমি ভেবেও পাই না!

আজাদ যেটুকু সংবাদ পরিবেশন করিতেছে তাহাতে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। আমি একা থাকি, আমার সাথে কাহাকেও মিশতে দেওয়া হয় না। একাকী সময় কাটানো যে কত কষ্টকর তাহা যাহারা ভুক্তভোগী নন বুঝতে পারবেন না। আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সহ্য করার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। ভাবি শুধু আমার সহকর্মীদের কথা। এক এক জনকে আলাদা আলাদা জেলে নিয়ে কিভাবে রেখেছে? ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনোদিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে যেতে নাও পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদী ভোগ করতে পারবে। কারাগারের পাষাণ প্রাচীর আমাকেও পাষাণ করে তুলেছে। এ দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মা-বোনের দোয়া আছে আমাদের উপর। জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমেই আদর্শের জয় হয়।

বিকালে বাগানে কাজ করতে শুরু করলাম। সময় তো আমার কাটে না। আলাপ করার লোক তো নাই। লাউয়ের দানা লাগাইয়াছিলাম, গাছ হয়েছে।

ঝিংগার গাছও বেড়ে উঠেছে। ফুলের বাগানটিকে নতুন করে সাজাইয়া গোছাইয়া করতে শুরু করেছি। বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। আজকাল সকলেই প্রশংসা করে। নতুন জীবন পেয়েছে ফুলের গাছগুলি।

৭ই জুন ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস, রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলেছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামী লীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়ে ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই জনগণ বে-আইনী কিছুই করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের রয়েছে। কিন্তু এরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে দিবে না।

আবার খবর এল টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠি চার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিরা কয়েদিদের বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। তবে জেলের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল গুজবও রটে।

অনেক সময় এসব গুজব সত্যই হয়, আবার অনেক সময় দেখা যায় একদম মিথ্যা গুজব। কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে জেল অফিসে এসেছে। তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাই বেশি। রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। ১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয়দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায় —এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।

এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি! বিকালে আবার গুজব শুনলাম গুলি হয়েছে, কিছু লোক মারা গেছে। অনেক লোক জখম হয়েছে। মেডিকেল হাসপাতালেও একজন মারা গেছে। একবার আমার মন বলে, হতেও পারে, আবার ভাবি সরকার কি

এতো বোকামি করবে? ১৪৪ ধারা দেওয়া হয় নাই। গুলি চলবে কেন? একটু পরেই খবর এল ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মিটিং হতে পারবে না। কিছু জায়গায় টিয়ার গ্যাস মারছে সে খবর পাওয়া গেল।

বিকালে আরও বহুলোক গ্রেপ্তার হয়ে এল। প্রত্যেককে সামারী কোর্ট করে সাজা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাহাকেও একমাস, কাহাকে দুই মাস। বেশির ভাগ লোকই রাস্তা থেকে ধরে এনেছে শুনলাম। অনেকে নাকি বলে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম ধরে নিয়ে এল। আবার জেলও দিয়ে দিল। সমস্ত দিনটা পাগলের মতোই কাটলো আমার। তালাবন্ধ হওয়ার পূর্বে খবর পেলাম নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, কার্জন হল ও পুরানা ঢাকার কোথাও কোথাও গুলি হয়েছে, তাতে অনেক লোক মারা গেছে। বুঝতে পারি না সত্য কি মিথ্যা! কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। সেপাইরা আলোচনা করে, তার থেকে কয়েদিরা শুনে আমাকে কিছু কিছু বলে।

তবে হরতাল যে সাফল্যজনকভাবে পালন করা হয়েছে সে কথা সকলেই বলছে। এমন হরতাল নাকি কোনোদিন হয় নাই, এমনকি ২৯শে সেপ্টেম্বরও না। তবে আমার মনে হয় ২৯শে সেপ্টেম্বরের মতোই হয়েছে হরতাল।

গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি –যে এক টিন তামাক বাইরে আমি ছয়দিনে খাইতাম, সেই টিন এখন চারদিনে খেয়ে ফেলি। কি হবে? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনিভাবে দিন শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা জেলে আছি। তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা ও শ্রমিকরা যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালবাসা দেওয়া ছাড়া আমার দেবার কিছুই নাই।

মনে শক্তি ফিরে এল এবং আমি দিব্যচোখে দেখতে পেলাম 'জয় আমাদের অবধারিত'। কোনো শক্তি আর দমাতে পারবে না।

অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম তো আসে না। নানা চিন্তা এসে পড়ে। এ এক মহাবিপদ। বই পড়ি, কাগজ উলটাই–কিন্তু তাতে মন বসে না।

ভুলে গেছি, বিকালে কয়েক মিনিটের জন্য জেলার সাহেব আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর শরীরও ভাল না দেখলাম। আজ অসুখ থেকে উঠে

এসেছেন। আমার মন ভাল না তাই বললাম, কিছু কথা আছে দুই একদিন পরে আসবেন। তিনি বললেন, 'আসবো'। বিদায় নিলেন।

দৈনিক আজাদ পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন ভালই করেছে, 'আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ প্রদেশে হরতাল'। 'হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আওয়ামী লীগের একক প্রচেষ্টা।' প্রোগ্রামটাও দিয়েছে ভাল করে।

পাকিস্তান অবজারভার হেড লাইন করেছে 'হরতাল' বলে। খবর মন্দ দেয় নাই।

মিজানের বিবৃতিটি চমৎকার হয়েছে। হলে কি হবে, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।'

৮ই জুন ১৯৬৬ ॥ বুধবার

ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাত ভর গ্রেপ্তার করে জেল ভরে দিয়েছে পুলিশ বাহিনী। সকালেও জেল অফিসে বহু লোক পড়ে রয়েছে। প্রায় তিনশত লোককে সকাল ৮টা পর্যন্ত জেলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ বৎসর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকও আছে। কিছু কিছু ছেলে মা মা করে কাঁদছে। এরা দুধের বাচ্চা, খেতেও পারে না নিজে। কেস টেবিলের সামনে এনে রাখা হয়েছে। সমস্ত দিন এদের কিছুই খাবার দেয় নাই। অনেকগুলি যুবক আহত অবস্থায় এসেছে। কারও পায়ে জখম, কারও কপাল কেটে গিয়াছে, কারও হাত ভাঙ্গা এদের চিকিৎসা করা বা ঔষধ দেওয়ার কোনো দরকার মনে করে নাই কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল অন্য জায়গায়, সেখান থেকে সন্ধ্যার পর জেলে এনে জমা দেওয়া শুরু করে। দিনভরই লোক আনছিল, অনেক। কিছু সংখ্যক স্কুলের ছাত্রও আছে। জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। আবার কেহ কেহ খুবই খারাপ ব্যবহারও করেছে। বাধ্য হয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে জানালাম, অত্যাচার বন্ধ করুন। তা না হলে ভীষণ গোলমাল হতে পারে। মোবাইল কোর্ট করে সরকার গ্রেপ্তারের পরে এদের সাজা দিয়ে দিয়েছে। কাহাকেও তিন মাস, আর কাহাকেও দুই মাস, এক মাসও কিছুসংখ্যক ছেলেদের দিয়েছে। সাধারণ কয়েদি, যাদের মধ্যে অনেকেই মানুষ খুন করে অথবা ডাকাতি করে জেলে এসেছে তারাও দুঃখ করে বলে, এই দুধের বাচ্চাদের গ্রেপ্তার করে এনেছে! এরা রাত ভর

কেঁদেছে। ভাল করে খেতেও পারে নাই। এই সরকারের কাছ থেকে মানুষ কেমন করে বিচার আশা করে?

জেল কর্তৃপক্ষ কোথায় এত লোকের জায়গা দিবে বুঝে পাই না! ছোট ছোট ছেলেদের আলাদা করে রাখতে হয়। এরা জেলে আসার পরে খবর এল ভীষণ গুলিগোলা হয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে। সমস্ত ঢাকা শহরে টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে, লাঠিচার্জও করেছে। চুপ করে বসে নীরবে সমবেদনা জানান ছাড়া আমার কি করার আছে! আমার চরিত্রের মধ্যে ভাবাবেগ একটু বেশি। যদিও নিজকে সামলানোর মতো ক্ষমতাও আমার আছে। বন্দি অবস্থায় এই সমস্ত খবর পাওয়ার পরে মনের অবস্থা কি হয় ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবে না।

মেটের পীড়াপীড়িতে নাস্তা খেতে বসেছিলাম। খেতে পারি নাই। দুপুরে ভাত খেতে বসেছি একই অবস্থা। সঠিক খবর না পাওয়ার জন্যই মন আরও খারাপ। খবরের কাগজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাগজ আসতে খুব দেরি হতেছে, ২টার সময় কাগজ এল। আমি পূর্বে যা অনুমান করেছি তাই হলো। কোনো খবরই সরকার সংবাদপত্রে ছাপতে দেয় নাই।

ধর্মঘটের কোনো সংবাদই নাই। শুধু সরকারি প্রেস নোট। ইত্তেফাক, আজাদ, অবজারভার সকলেরই একই অবস্থা। একেই বলে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'! ইত্তেফাক মাত্র চার পৃষ্ঠা। কোনো জেলার কোনো সংবাদ নাই। প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল যে পুরাপুরি পালিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায় সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

খবরের কাগজগুলি দেখে আমি শিহরিয়া উঠলাম। পত্রিকার নিজস্ব খবর ছাপতে দেয় নাই। তবে সরকারি প্রেসনোটেই স্বীকার করেছে পুলিশের গুলিতে দশজন মারা গিয়াছে। এটা তো ভয়াবহ খবর। সরকার যখন স্বীকার করেছে দশজন মারা গেছে, তখন কতগুণ বেশি হতে পারে ভাবতেও আমার ভয় হলো! কত জন যখম হয়েছে সরকারি প্রেসনোটে তাহা নাই। সমস্ত দোষই যেন জনগণের। যেখানে উসকানি দিতেছে সরকারের প্রতিনিধিরা, আওয়ামী লীগ সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, 'শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ দিবস পালন করতে চাই'। এবং সে অনুযায়ী তারা কর্মীদের নির্দেশও দিয়েছে। এখন জনগণকে দোষ দিয়ে লাভ নাই। যেখানে পুলিশ ছিল না সেখানে কোনো গণ্ডগোল হয় নাই। চকবাজার ও অন্যান্য জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট হয়েছে। সে খবর পেয়েছি।

বেলা ১১টার সময় ১৪৪ ধারা জারি করে আর সাথে সাথে গুলি শুরু হয়। পূর্বে জারি করলেই তো কর্মীরা আর জনসাধারণ জানতে পারতো। যখন আওয়ামী লীগ তার প্রোগ্রাম খবরের কাগজে বের করে দিল তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল, ১০টায় শোভাযাত্রা, বিকালে সভা শেষে আবার শোভাযাত্রা। তখন তো ১৪৪ ধারা জারি করে নাই। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় সরকারের দালালেরা ও কিছুসংখ্যক অতি উৎসাহী কর্মচারী কোনো এক উপর তলার নেতার কাছ থেকে পরামর্শ করে এই সর্বনাশ করেছে।

সরকার যদি মিথ্যা কথা বলে প্রেসনোট দেয়, তবে সে সরকারের উপর মানুষের বিশ্বাস থাকতে পারে না। জীবন ভরে একই কথা শুনিয়াছি 'আত্মরক্ষার জন্যই পুলিশ গুলি বর্ষণ করতে বাধ্য হয়।' এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে? যারা মারা গেল তাদের ছেলেমেয়ে, মা-বাবা তাদের কি হবে? কত আশা করে তারা বসে আছে, কবে বাড়ি আসবে তাদের বাবা। কবে আসছে তাদের ছেলে। রোজগারের টাকা আসবে মাসের প্রথম দিকে। এরা জেলে বন্দি, সহসা আর ফিরে যাবে না, টাকাও আর পৌছবে না সংসারে। একথা ভেবে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছি আমি। কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। কেন মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য পরের জীবন নিয়ে থাকে?

তবে এদের ত্যাগ বৃথা যাবে না। এই দেশের মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করবার জন্য যখন জীবন দিতে শিখেছে তখন জয় হবেই, কেবলমাত্র সময় সাপেক্ষ। শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষকরা কাজ বন্ধ করেছে। ব্যবসায়ীরা দোকান পাট বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়েছে। এতবড় প্রতিবাদ আর কোনোদিন কি পাকিস্তানে হয়েছে?

ছয় দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি—পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যে আর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশি দিন করতে পারবেনা, সে কথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামে গঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষু রাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণীর ছয়দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত।

যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করল, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার

জন্য যেভাবে এ দেশের ছাত্র-জনসাধারণ জীবন দিয়েছিল তারই বিনিময়ে বাংলা আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। রক্ত বৃথা যায় না। যারা হাসতে হাসতে জীবন দিল, আহত হলো, গ্রেপ্তার হলো, নির্যাতন সহ্য করল তাদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নীরব প্রাণের সহানুভূতি ছাড়া জেলবন্দি আমি আর কি দিতে পারি! আল্লাহর কাছে এই কারাগারে বসে তাদের আত্মার শান্তির জন্য হাত তুলে মোনাজাত করলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এদের মৃত্যু বৃথা যেতে দেব না, সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। যা কপালে আছে তাই হবে। জনগণ ত্যাগের দাম দেয়। ত্যাগের মাধ্যমেই জনগণের দাবি আদায় করতে হবে।

সমস্ত দিন পাগলের মতোই ঘরে বাইরে করতে লাগলাম। যদি কেহ বন্দি পশুপক্ষী দেখে থাকেন তারা অনুভব করতে পারবেন। শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে আনছে। তাদের দুরবস্থা চিন্তা করতে ভয় হয়। রাস্তায় যাকে পেয়েছে তাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। খালি গা—কাপড় নাই, একদিন একরাত পর্যন্ত থানায় বা অন্য কোথাও আটকাইয়া রেখেছিল। খাবারও দেয় নাই। গোসল নাই। সাজা দিয়ে নিয়ে এসেছে। এদের কিছু লোককে কয়েদির কাপড় পরাইয়া দিয়েছে। আমি যেখানে ছিলাম তার পার্শ্বেই পুরানা বিশ সেলে রাতে ৮২ জন ছেলেকে নিয়ে এসেছে, বয়স ১৫ বৎসরের বেশি হবে না কারও। অনেকের মাথায় আঘাত। অনেকের পায়ে আঘাত, অনেকে হাঁটতে পারে না। হাকিম বাহাদুর বোধ হয় কারও কথা শোনেন নাই, জেল দিয়ে চলেছেন। রাতে জানালা দিয়ে দেখলাম এই ছেলেগুলিকে নিয়ে এসেছে। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, "জমাদার সাহেব এদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিবেন। বোধ হয় দুই দিন না খাওয়া।" মানুষ যখন অমানুষ হয় তখন হিংস্র জন্তুর চেয়েও হিংস্র হয়ে থাকে। রাত্রে আমি ঘুমাতে পারলাম না। দুই একজন জমাদার ও সিপাই এদের উপর অত্যাচার করছে। আর সবাই এদের আরাম দেবার চেষ্টা করেছে। কয়েদিরা ছোট ছোট ছেলেদের খুব আদর করে থাকে। নিজে না খেয়েও অনেককে খাওয়াইয়া থাকে। অনেকে নিজের গামছা দিয়েছে। যারা এদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের কথা আমার মনে রইলো। নাম আমি লেখব না।

রাত কেটে গেল। একটু ঘুম আসে, আবার ঘুম ভেঙে যায়।

৯ই জুন ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

ভোর বেলা বাহির হয়েই চোখে পড়ল পুরানা বিশে যাদের রাখা হয়েছে তারা দরজার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি আস্তে আস্তে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম ওদের অবস্থা। বলল, করুণ কাহিনী। রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। সারা দিন রাত থানায় একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। এত লোক থানা হাজতে রেখেছে যে বসতে পর্যন্ত পারে নাই, সেখানেই পায়খানা, প্রস্রাব করেছে। যখন এদের ধরে আনে তখন খুব মারপিট করেছে। কয়েকজনের কপালে মারার দাগ আমি দেখলাম। ছোট ছোট জখম। কয়েকজন কলেজের ছেলেও আছে। এখানে ১২টা সেলে ৭২ জন লোককে রেখেছে। এক এক সেলে ৬ জন করে রেখেছে। পরনের কাপড় আর কয়েকজনের গায়ে জামা ছাড়া কিছুই নাই। এই দুই দিন দুই রাত্রে তাদের যা অবস্থা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। আমি পানি দফার লোকদের বললাম ওদের পানি দিতে, গামছা এনে দিতে বললাম। জমাদার সাহেব, মেট, পাহারা, সকলকেই গামছা জোগাড় করে আনতে বললেন। দুই চার জন গোসল করেছে। খবর এল, কেস টেবিলে নিয়ে যেতে। আবার সকলকে বের করে লাইন ধরে ফাইল করে গুণে নিয়ে চললো কেস টেবিলে। স্বাস্থ্য পাশ হবে। নাম ঠিকানা ঠিক করে লিখবে। নাস্তা সেখানেই খাওয়াবে। আমি কেস টেবিলের ডিউটি জমাদারকে খবর দিলাম ওদের খাবার দিতে। কেস টেবিলের সামনে সকলকে ফাইল করে বসান হয়েছে। কাহাকেও উঠতে দেয় না। ওখানেই বসে ওদের খেতে হয়। গোসল-টোসল তো হলোই না। যাদের শাস্তি দিয়েছে তাদের কয়েদি কাপড় পরায়ে দিয়েছে। আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে দরজা খুললে ওদের অনেককে দেখা যায়। আমি খোঁজ-খবর নিতে ছিলাম। এমন সময় ডাক্তার সাহেব সেই পথে আসছিলেন। দরজা খুলে গেছে, আমাকে ওরা দেখতে পেয়েছে, প্রায় দুই তিন শত হবে। আর হাত তুলে চিৎকার করে উঠেছে। আমিও ওদের হাত তুলে অভিনন্দন জানালাম। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আমি সরে আসলাম; কারণ যদি হৈ চৈ বেশি করে তবে ওদের উপর অত্যাচার হতে পারে। এক জমাদার নাকি ওদের গালাগালি করেছে আর মারধর করেছে। তাকে আমি খবর দিয়ে বললাম, এ কাজ আর করবেন না। সে আমার কাছে কসম করল, আর বললো, আমাদেরও ছেলে মেয়ে আছে স্যার, আমরাও মানুষ। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। যাদের ধরে নিয়ে এসেছে এরা গরিব, দিন মজুরি না করলে বাঁচতে পারবে না।

অনেক রিকশাওয়ালাকে এনেছে, বোধ হয় বাড়িতে তাদের ছেলেমেয়ে না খেয়েই আছে। দুই মাসের সাজা দিয়েছে অনেককে। দুপুর হয়ে গেল এই ভাবেই। কাগজ এল, দেখলাম তথাকথিত জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ থেকে বিরোধী দল ওয়াক আউট করেছে প্রতিবাদে। কারণ মুলতবি প্রস্তাব স্পিকার সাহেব উঠাতে দেন নাই। একেই বলে আইন সভা! আর একেই বলে আইন সভার ক্ষমতা! চমৎকার ফার্স। ডিবেটিং ক্লাব বললেও চলে। তাহাও সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'যেই না মাথার চুল তার আবার লাল ফিতা।'

সরকার স্বীকার করেছে আরও একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। এই নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু হলো। যারা আহত হয়েছে তাদের কোনো সংবাদ নাই আজ পর্যন্ত। প্রশ্ন জাগে, '১১ জন মারা গেছে না অনেক বেশি মারা গেছে?'

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন একটি চমৎকার কথা বলেছেন। কথাটি একেবারে সত্য। ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 'জয়ের সাধ্য নাই, ফেরারও পথ পাইতেছে না।'

পাঁচটার সময় বাইরে যেয়ে একাকী বসে চিন্তা করছি এমন সময় জমাদার সাহেব এসে বললেন, চলুন আপনার ইন্টারভিউ আছে, বেগম সাহেবা ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছেন। হঠাৎ এল, ব্যাপার কি! আজকাল তো ১৫ দিনের কমে দেখা করতে দেয় না। আগে যখন জেলে এসেছি তখন দেখা করতে অনুমতি দিত। কোনো খারাপ খবর কিনা? তাড়াতাড়ি রওয়ানা হলাম জেল গেটের দিকে। প্রায় দুই তিন শত ছেলে—কয়েদির কাপড় পরে, ফাইল করে বসে আছে। আমাকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে গেল। আমাকে হাত তুলে এক সাথে অভিবাদন জানাল, আমিও তাদের অভিনন্দন দিলাম। দাঁড়াবার হুকুম নাই, জেলের আইনে। তাই গেটের দিকে চললাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে চললাম

ছোট্ট ছেলেটা পূর্বের মতোই 'আব্বা' 'আব্বা' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি তাকে কোলে নিলাম। আদর করলাম। বাচ্চা মেয়েটি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। তাকেও আদর করলাম। জামালের জ্বর, দূরেই বসেছিল, কাছে ডেকে আনলাম। বড়মেয়ে, বড় ছেলে, খোকা, আমার স্ত্রী একে অন্যের দিকে চাইছে, কি যেন বলতে চায় বলতে পারছে না। আমি বললাম এত তাড়াতাড়ি দেখা করার অনুমতি দিল—ব্যাপার কি? আমার স্ত্রী আস্তে আস্তে বলল যে,

"টেলিগ্রাম এসেছে মার শরীর খুব খারাপ। বুঝতে আর বাকি রইল না, মার শরীর বেশি খারাপ না হলে আমার আব্বা কোনোদিন টেলিগ্রাম করতেন না।" তিনি খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক। মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে পড়ল। ছেলে-মেয়েদের বুঝতে দিলাম না যে আমি খুব মুষড়ে পড়েছি। কিছু সময় বসলাম, কোনো কথাই আমার আর ভাল লাগল না। বেগম সাহেবার কাছ থেকে একটা পান খেলাম। ঢাকার ও অন্যান্য স্থানের অবস্থা যে খুব খারাপ বুঝতে বাকি রইল না। আমার স্ত্রী বললো প্যারোলের জন্য দরখাস্ত করতে। আমি বললাম "কয়েকদিনের জন্য যেয়ে মার শরীর যদি ভাল না হয় তাঁকে ফেলে আবার জেলে ফিরে আসলে তাঁর হার্টফেল করে যেতে পারে। মুক্তি দেয় যাব, নতুবা নয়। কাউকে সত্বর পাঠাইয়া দেও, নাসেরকে খবর দেও বাড়ি যেতে।"

ফিরে এলাম আবার সেই নির্জন কারাগারে। আসার পথে কয়েদিরা আমাকে আদাব করল। কিন্তু ওদের দিকে চাইতে পারলাম না। শুধু হাত তুলে সালাম দিলাম ও লইলাম। আমার মনের অবস্থা দেখে মেট আলিমুদ্দি, বাবুর্চি, ফালতু ছুটে এল।

বললাম, "আমার মায়ের অসুখ।"

মনে পড়লো মা'র কথা। কিছুদিন আগে আমার মা খুলনা থেকে আমাকে ফোন করে বলেছিল, "তুই আমাকে দেখতে আয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমি বাড়ি যাইতেছি।" বললাম, "মা, আমি শীঘ্রই বাড়ি যাব তোমাকে দেখতে।" এরপর শুরু হলো আমার উপর জুলুম, যশোরে গ্রেপ্তার। আমি যখন খুলনা গেলাম, মা তখন বাড়ি চলে গিয়েছেন। যশোর থেকে ঢাকা এলাম। ঢাকায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল শ্রীহট্ট। সেখানে জামিন হলো। আবার জেলগেটে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল ময়মনসিংহ।

জামিন পেয়ে ঢাকায় এলাম। সিলেটে তারিখের দিন হাজির হতে হবে। আটটা মামলা আমার বিরুদ্ধে। মাসের অর্ধেক দিন চলে যায়। বরিশালে প্রোগ্রাম দিলাম। ১২ই মে সভা করব। সেখান থেকে আমার বাড়ি কাছে। আব্বাকে খবর দিলাম ১৩ তারিখে বাড়িতে পৌঁছাব। আব্বা মা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিলেন। আমার উপর আমার মা বাবার টান যে কত বেশি সে কথা কাহাকেও বোঝাতে পারব না। তাঁরা আমাকে 'খোকা' বলে ডাকেন। মনে

হয় আজও আমি তাঁদের ছোট্ট খোকাটি। পারলে আমাকে কোলে করেই শুয়ে থাকে। এই বয়সেও আমি আমার মা-বাবার গলা ধরে আদর করি। কিন্তু হঠাৎ ৮ই মে দিন গত রাতে ঢাকায় আমাকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে আটক করল। আমার সেই কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল। "আমি বাঁচব না, আমাকে দেখতে আয়"—মা বলেছিলেন। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছা হলো না। সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে রইলাম। লেখাপড়া করতে পারলাম না। মেট আর বাবুর্চি জোর করেই আমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করল। গতকাল খবর এল কত লোক মারা গেছে তেজগাঁও এবং নারায়ণগঞ্জে। আজ আবার মায়ের এই অবস্থা। তারপর আমাকে একাকী রাখা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করলাম ঘুমাতে, পারলাম না।

১০ই জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

আগেই লিখেছি আমাকে একা রাখা হয়েছে। কারও সাথে আলাপ করার উপায় নাই। কারও সাথে পরামর্শ করারও উপায় নাই। সান্ত্বনা দেবারও কেহ নাই। কারাগারের ভিতর একাকী রাখার মতো নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে? অন্যান্য রাজবন্দিরা বিভিন্ন জায়গায় এক সাথে যাবে, কিন্তু আমাকে কারও কাছে দেওয়া চলবে না। সরকারের হুকুম। জেল কর্তৃপক্ষের কিছুই করার নাই। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জহুর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) এবং তাজউদ্দীনকে পূর্বেই ঢাকা জেল থেকে বিভিন্ন জেলে আলাদা আলাদা করে রেখেছে। আমাদের দলের আর যাদের গ্রেপ্তার করে এনেছে তাদের সবচেয়ে খারাপ সেলে রাখা হয়েছে। এদের খাবার কষ্টও দিচ্ছে। মাত্র দেড় টাকার মধ্যে খেতে হবে।

বাইরে যে ছোট বসার জায়গাটি আছে তার উপর বসেই চুপ করে আছি। জমাদার সাহেব এসে বললেন, চিন্তা করে শরীর নষ্ট করবেন না। দুই একজন কয়েদিও পাশ দিয়ে ঘুরে গেল, সাহস করে কিছুই বলল না। এইভাবে অনেক সময় কেটে গেল। ৯টার সময় ডিপুটি জেলার সাহেবকে খবর দিলাম আমার সাথে দেখা করার জন্য। তিনি খবর পেয়েই চলে এলেন। তাকে বললাম একটা টেলিগ্রাম করতে চাই চীফ সেক্রেটারির কাছে, এই কথা বলে, 'মায়ের শরীর খুবই খারাপ আমার গ্রামের বাড়িতে। যদি সম্ভবপর হয় আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন।' তিনি বললেন, দিয়ে দেন, আমরা তো পাঠাবার মালিক।

টেলিগ্রাম লিখে পাঠাইয়া দিলাম। জানি কি হবে! এরা আমাকে ছাড়বে না। পরে বলবে, সরকারকে তো জানান হয় নাই। তাই জানাইয়া রাখলাম।

ইত্তেফাক কাগজেও মায়ের অসুখের কথা উঠেছে। অনেক চেষ্টা করি, চিন্তা করব না। তবুও বার বার একই কথা মনে পড়ে। আমার মার প্রত্যেকটি কথাই আমার মনে পড়তে থাকে।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরেই ১৯৪৮-এ যখন আমাকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার করল, আবার ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার করে ১৯৫২ সালে ছাড়ল, তখন আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তুই তো *পাকিস্তান পাকিস্তান* করে চিৎকার করেছিস, কত টাকা নিয়ে খরচ করেছিস— এদেশের মানুষ তো তোর কাছ থেকেই পাকিস্তানের নাম শুনেছিল, আজ তোকেই সেই পাকিস্তানের জেলে কেন নেয়?'

বলতে পারেন, আমার এই গ্রাম্য মা'র কথার কি জবাব দিব? বললাম 'মা তোমাকে পরে বলবো।' কোনো কিছু বলার আমার ছিল কি? একদিন সুযোগ বুঝে মার কাছে অনেক কথা বললাম, মা কি বুঝতে চায়! আমার মাকে কোনোদিন বোঝাতে পারি নাই। মাঝে মাঝে আমাকে বলত, 'যে তোকে জেলে নেয় আমাকে একবার নিয়ে চল, বলে আসব তাকে মুখের উপর।' আমার ভাইবোনেরা সকলেই হাসতো মা'র কথা শুনে। আজ মার অনেক কথাই আমার মনে জাগছে।

দৈনিক খবরের কাগজগুলি এল, দেখলাম কাগজগুলিকে সরকার সংবাদ সরবরাহ করা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রায়ই প্যামফ্লেট করে রেখেছে। কোনো সংবাদই নাই এই আন্দোলনের।

জেলের কয়েদিদের খবর হলো, 'হাজার লোকের উপর মারা গেছে পুলিশের গুলিতে'—এমন অনেক খবর রটছে। সত্য খবর বন্ধ হলে অনেক আজগুবি খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, এতে সরকারের অপকার ছাড়া উপকার হয় না।

আজ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা, যারা বাইরে আছেন যদি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন তবে দাবি আদায় করতে বেশি সময় লাগবে না।

লেখাপড়ায় আজ আর মন দিতে পারলাম না। কখন যে তালাবন্ধ করে চলে গিয়াছে সে খবরও আমার জানা নাই, কারণ সন্ধ্যার একটু পূর্বেই ঘরে চলে

এসেছিলাম। মেট, বাবুর্চি, ফালতু, সিপাহিরা—যারা আমার ঘরে থাকে তারা আমার কাছে এসে বলতে লাগল, 'ভাববেন না স্যার। আল্লা করলে আপনার মা ভাল হয়ে যাবেন।'

তাই ভাবি রাজনীতি মানুষকে কত নিষ্ঠুর করে! কয়েদিদেরও মায়া আছে, প্রাণ আছে, কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের নাই। ভাবলাম রাতটা কাটাতেই কষ্ট হবে। কিন্তু কেটে গেল। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকাইয়া ছিলাম। দেখতে চেষ্টা করলাম 'অন্ধকারের রূপ', দেখতে পারলাম না। কারণ আমি শরৎচন্দ্র নই। আর তাঁর মতো দেখবার ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তিও আমার নাই।

১১ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

জেলার সাহেবকে খবর দিলাম, আমি দেখা করতে চাই। তিনি খবর পাঠালেন নিজেই আসবেন দেখা করতে। তিনিও শুনেছেন মায়ের অবস্থা ভাল না। বাইরে বসে দেখতে লাগলাম, একটা মোরগ একটা মুরগি আর একটা বাচ্চা মুরগি আপন মনে ঘুরে ঘুরে পোকা খেতেছে। আমার বাবুর্চি খাবার থেকে কোনোমতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এই কয়টা মুরগি জোগাড় করেছে। ছোট ছোট যে মাঠগুলি পড়েছিল আমার ওয়ার্ডে সেগুলিতে দূর্বা ঘাস লাগাইয়া দিয়াছিলাম। এখন সমস্ত মাঠটি সবুজ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি পেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে জায়গাটি। এরই মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুরগিগুলি। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ফুলের গাছ চারদিকে লাগাইয়াছিলাম, নতুন পাতা ছাড়তে শুরু করেছে। বড় চমৎকার লাগছে। আজকে সূর্যের জোর নাই, বেশ মেঘলা দিন। খুবই বাতাস বইছে। ঘরে ফিরে এসে বসলাম। দেখি কম্পাউন্ডার সাহেব আসছেন। বহুদিন দেখা হয় নাই। সিভিল সার্জন সাহেব জেল ভিজিট করেন সপ্তাহে দুইবার। কিন্তু দুই সপ্তাহ আমাকে দেখতে আসেন নাই। বোধ হয় আজ আসবেন। আধা ঘণ্টা পরে জেলের ডাক্তার সাহেবদের সাথে নিয়ে আমাকে দেখতে আসলেন। চিন্তা করে শরীর খারাপ করতে নিষেধ করলেন। খোদার রহমতে মা ভাল হয়ে যাবেন তাহাও বললেন। খুব খোদাভক্ত লোক। এই বয়সে হজ্ব করেও এসেছেন। দেরি করতে পারেন না, অনেক কাজ। কাজ নাই শুধু আমাদের মতো বিনা বিচারে বন্দি হতভাগাদের!

আমি আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাজতো একটাই। আমি তো একা থাকি। আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। একাই থাকতে হবে। জেলার সাহেব সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের ডিপুটি জেলার সাহেবকে নিয়ে আসলেন। বসতে দিয়ে বললাম, 'আপনার অনেক কাজ, বহু লোককে রাস্তা থেকে ধরে এনে জেল দিয়েছে–তাদের বন্দোবস্ত করা, তবু কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম।' বললাম, 'আমাকে কেন একলা রাখা হয়েছে? আমার সহকর্মীদের কেন কনডেম সেলের মধ্যে রেখেছেন? তাদের মাত্র দেড়টাকা দেওয়া হয়েছে খাবার জন্য। অন্যান্য ডিপিআর ও রাজবন্দিদের এক জায়গায় রাখতে পারেন। তারা দেখাশোনা করে নিজের পাকের বন্দোবস্ত করতে পারে। ২৬ সেলে পুরানা সিকিউরিটি আছে। তারা এক জায়গায় আছে, তাদের পাকের বন্দোবস্ত তারাই করে। তাদের সামনেই পাক হয়। ডিপিআরদের এক এবং দুই নং ওয়ার্ডে রেখেছেন। তারা এক সাথে তাদের পাকের বন্দোবস্ত করে থাকে এবং তাদের সামনেই পাক হয়। ডিভিশন পাওয়া কয়েদিরা এক জায়গায় থাকে, তাদেরও আলাদা পাক হয়। আমি একলা থাকি, আমার সামনেই পাক হয়। আমার সহকর্মীরা কি অন্যায় করেছে, কেউ কি জেলের আইন ভেঙেছে যে এক জায়গায় থাকতে পারেন না, আর একসাথে পাক হতে পারে না? এদের কাউকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। এক সাথে মিলেমিশে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করলে আপনাদের কি ক্ষতি হয়? আমার মনের অবস্থাও খারাপ, মা অসুস্থ। অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। বহুলোককে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। আমি এই অবস্থায় একলা থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে।' তার একই উত্তর, তাদের হাতে কিছুই নাই। উপর থেকে যা হুকুম আসে তাদের তাই করতে হয়। অন্য কোনো রাজবন্দিদের বা ডিপিআরদের বেলায় বোধ হয় উপরের হুকুম আসে না–কোথায় কাকে রাখতে হবে! শুধু কি আওয়ামী লীগারদের বেলায় এই অন্যায় ব্যবস্থা! তিনি বললেন জেলের ডিআইজি সাহেবকে তিনি বলবেন। তিনি কিছু করতে পারেন না, তার হাতে কিছুই নাই।

তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝলাম সত্যই তাদের হাতে কিছুই নাই। কয়েদিদের কোথায় রাখা হবে জেল কর্তৃপক্ষ জানেন না। তবে দায়িত্ব তাদের। কোনো কিছু গোলমাল হলে এরাই আবার দায়ী হবে।

জেলার সাহেব ও ডিপুটি জেলার সাহেব চলে গেলেন। আমি গোসল করে খেতে বসেছি, দেখি ইলিশ মাছ, নারিকেল দিয়ে পাক করেছে। জিজ্ঞাসা

করলাম এটা আবার কি? এ তো কোনোদিন খাই নাই, এ আবার কেমন? বাবুর্চি বললো, একজন বলেছিল তাই পাকালাম। বললাম আমিতো এখানেই ছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হতো। যাহা হউক, কিছু খেয়ে কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাগজ পড়তে পড়তে ঘুম আসে, কিন্তু ঘুমাতে চাই না। দিনে ঘুমালে রাতে তা হলে আর ঘুমাতে পারব না।

সর্বনাশ! ট্রেন দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা গেছে। অনেক জখম হয়েছে। এখনও পুরা খবর পাওয়া যায় নাই। দুর্ঘটনা কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের লাইন। সেখানে একটু খারাপ হলে মেরামত করা হয়। পুরাপুরি এর একটা মেরামত হওয়া প্রয়োজন। কে খেয়াল করে! পূর্ব বাংলার রেলওয়ের দুরবস্থা আমার খুব জানা আছে। ট্রেনে চড়ে বহু ভ্রমণ আমি করেছি। দুই চারটি নতুন ট্রেন ছাড়া আর সকলগুলিই ব্রিটিশ আমলের। এমন কোনো ট্রেন নাই যাতে বৃষ্টি নামলে পানি পড়ে না। তবে পানি যখন ট্রেনে পাওয়া যায় না, তখন খোদার পানি পড়তেই বা আপত্তি কি! কিছুদিন পূর্বে যখন আমাকে সিলেট থেকে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ নেওয়া হয় তখন এক ফার্স্ট ক্লাসে আমি ছিলাম, দুই পুলিশ ইন্সপেক্টারও ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি হলো, আমরা অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সমস্ত কামরাটি ভিজে গেল। বললাম চলুন অন্য ঘরে যাওয়া যাক। তারাও আমার সাথে পাশের ঘরে এসে আশ্রয় নিল। সেখানেও পানি পড়ে, তবে একটু অল্প পরিমাণে। খাবার পানি তো কোনো ট্রেনেই পাওয়া যায় না। পায়খানা প্রস্রাব করার পানিও অনেক সময় থাকে না। কোন মন্ত্রী যেন বলেছেন 'সাবোটাস'! ঠিকই বলেছেন, সাবোটাস তো নিশ্চয়ই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারই 'সাবোটাস' করেছে দীর্ঘ ১৭ বৎসর!

ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন কায়েম হয় তখন রেলওয়ের ক্ষতিপূরণ পাওয়া গিয়েছিল সংখ্যানুপাতে। পূর্ব বাংলা টাকা বেশি পেয়েছিল ভাগে। দুঃখের বিষয়, যতদূর পশ্চিম পাকিস্তান রেলওয়ের উন্নতি হওয়া প্রয়োজন ছিল তাহা করে নিয়ে পূর্ব বাংলার রেলওয়ে আলাদা করে প্রদেশের হাতে দেওয়া হলো। সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ কি দেওয়া হয়েছে? ভাল ভাল ইঞ্জিন ও বগিগুলি পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে নেওয়া হয়। কতগুলি নিয়েছে তার হিসাব কি তারা দিয়েছে? আজ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটি ডাবল লাইন করা হয় নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে দেখুন কত বাহার। বিরোধী দল ও স্বতন্ত্রদল পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের কক্ষ ত্যাগ করেছেন রেল দুর্ঘটনার মুলতবি প্রস্তাব অবৈধ ঘোষণার প্রতিবাদে। মুলতবি প্রস্তাব করে কেন এরা! বলবে, ডিবেট করবে, চলে আসবে। মাহিনা ও পাসগুলি থাকলেই তো চলে! চমৎকার আইন সভা! দুনিয়ায় এর নজির নাই।

এ তো 'মৌলিক গণতন্ত্র', এর সৃষ্টিকর্তা জনাব আইয়ুব খান। নিজকে পাকাপাকিভাবে ক্ষমতায় রাখার ব্যবস্থা। জনগণের কি প্রয়োজন এতে? মৌলিক গণতন্ত্রী আছে, টাকা আছে, সরকারি কর্মচারী আছে। আইয়ুব সাহেব আছেন ক্ষমতার শীর্ষে আর তাঁর দুই ছোট লাট মোনায়েম খান সাহেব আর পশ্চিম পাকিস্তানে কালাবাগের খান সাহেব তো আছেন। চিন্তা কি?

সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় ঝড়েও যথেষ্ট মানুষ মারা গেছে ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। জানি না সরকারি সাহায্য কত পরিমাণ পৌঁছাবে। সরকারি সাহায্যের নমুনা আমার জানা আছে, কারণ কক্সবাজারে ধ্বংসলীলা আমি দেখে এসেছি।

বিকালে হাসপাতালের দিকে চেয়ে দেখতে পাই শাহাবুদ্দিন চৌধুরী আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁকে সালাম দিলাম এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হউন এই কামনা করলাম। বহুদূর, কথা বললে শুনবে না, আর বলাও উচিত নয়, আইনে বাধা আছে। দেখি বাদশা মিয়া (বাবু বাজারের) আমাকে সালাম দিচ্ছে। বেচারা জেল খাটতে খাটতে শেষ হয়ে গেল। তার শক্তি ও টাকাই তার কাল। বাদশা মিয়ার পিছনে দাঁড়াইয়া অনেকে আমাকে পিঠ দেখাল কেমন করে পুলিশ অত্যাচার করেছে। অনেকের মাথায় ব্যান্ডেজ, আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। শুনলাম প্রায় ৪০/৫০ জন হাসপাতালে আছে। ক্ষোভে দুঃখে মনে মনে বললাম, 'মার খাও। তোমাদের জাত ভাইয়ের লাঠির বাড়ি ও বন্দুকের গুলি খাও। জেল জুলুম তোমাদের কপালে আছে। কারণ তোমরা তো পরাধীন বাঙালি জাতি।' পরাধীন জাতের কপালে এমন লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা হয়েই থাকে। এতে আর নতুনত্ব কি?

লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয় না। সময়ও কাটে না, জেলে রাতটাই বেশি কষ্টের। আবার যারা আমার মতো একাকী নির্জন স্থানে থাকতে বাধ্য হয়–যাকে ইংরেজিতে বলে 'Solitary Confinement'–তাদের অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

১২ই জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

সকালে যখন হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম তখন শুনলাম ৮২ জন ছেলে, যাদের ৭ই জুন গ্রেপ্তার করেছে তাদের দুইটি ব্লকে রাখা হয়েছে। সর্বমোট ৮টা ছোট ছোট সেল, চার হাত চওড়া আট হাত লম্বা। দুই নম্বর ব্লক খালি করে খুব ভোরে একজনকে এনে রাখা হয়েছে। নাম আবদুল মান্নান। ভাবতে লাগলাম কোন মান্নান? জিজ্ঞাসা করলাম, চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কি না, কেউ বলতে পারল না। কোন ধারায় গ্রেপ্তার করেছে, বলল ডিপিআর না। খোঁজ নিয়ে জানলাম মামলা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ, তাতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ডিভিশন দেয় নাই। এক কাপড়ে এসেছে। জুতা খুলে রেখেছে গেটে। গামছা নাই, কাপড় নাই, কোনো জামা নাই, যে জামাটি গায়ে দিয়ে এসেছে তা ছাড়া। আমি তাড়াতাড়ি কিছু কাপড়চোপড় পাঠাইয়া দিলাম যাতে আপাতত চলতে পারে। ভাত নিতে যখন সেল থেকে বের হলো আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওকে দেখতে। দেখলাম সত্যিই শ্রমিক নেতা মান্নান। তাকে বললাম, 'চিন্তা করিও না, জামিনের চেষ্টা করতে হবে।'

কিছুই তো আমার ভাল লাগছে না। মায়ের খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। বাগানের কাজে হাত দিলাম। আবার ঘরে ফিরে এলাম। গতকালের কাগজগুলি আবার ভাল করে দেখতে লাগলাম। অর্থমন্ত্রী শোয়েব সাহেব ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট পেশ করেছেন। রাজস্ব খাতে আয় ধরা হইয়াছে ৫৬৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ব্যয় হইবে ৩৭২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১২৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা প্রদেশের ভাগে যাবে। রাজস্ব খাতে ৬৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। উন্নয়ন খাতে আর্থিক বৎসরে ৪৪২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে, ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ৪৭৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন খাতে ৩৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। নূতন কর বসাইয়াছে তাহাতে ৩৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। কেরোসিন, লবণ, সাবান অন্যান্য জিনিসের উপর কর ধার্য হয়েছে। ডাক মাশুলও বাড়াইয়াছে। দেশরক্ষা খাতে ২২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৩৬ কোটি টাকা ছিল। যে কর ধার্য করা হইয়াছে তাহার সবটাই গরিবকে দিতে হইবে। শোয়েব সাহেব যে অর্থনীতি চালু করিয়াছেন তাহাতে গরিবকে আরও গরিব করিয়া কয়েকজন বড় লোক ও শিল্পপতিকে সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রই কায়েম হইবে।

সরকার ক্রমাগত কর ধার্য করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। শোয়েব সাহেব অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁর বাজেটে এই শিল্পপতিদের ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 'ট্যাক্স হলিডে' ভোগের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কিন্তু গরিব জনসাধারণ বোধ হয় আর আলো জ্বালাইয়া রাতের খাবার খেতে পারবে না। খাবার জন্য কিছুই থাকবেও না। দেশ রক্ষা খাতে যে শতকরা ৬৫ ভাগ ব্যয় করা হবে এর মধ্যে পূর্ব বাংলা কতটুকু পাবে? ৫/১০ ভাগ এর বেশি নিশ্চয়ই না।

দেখেই খুশি হলাম যে আমি ও আমার সহকর্মীরা অনেকেই জেলে আটক থাকা অবস্থায়ও আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছে। রক্ত এরা বৃথা যেতে দিবে না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক্টিং সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের। তাঁর সভাপতিত্বে ১১ ঘণ্টা ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়েছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী জাতীয় পরিষদে যোগদান করতে পিন্ডি চলে গেছে। ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে জুন 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানাইয়াছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই আগস্টের পূর্বে সমস্ত গণবিরোধী ব্যবস্থার অবসান দাবি করিয়াছে। তা না করিলে ১৬ই আগস্ট থেকে জাতীয় পর্যায়ে গণআন্দোলন শুরু করা হবে। মনে মনে ভাবলাম আর কেউ আন্দোলন নষ্ট করতে পারবে না। দাবি আদায় হবেই।

৬ দফার বাস্তবায়নের সংগ্রাম আওয়ামী লীগ অব্যাহত রাখবে তাও ঘোষণা করেছে। এখন আর আমার জেল খাটতে আপত্তি নাই, কারণ আন্দোলন চলবে।

ভাবতে লাগলাম কর্মীদের টাকার অভাব হবে। পার্টি ফান্ডে টাকা নাই। আমিও বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসতে পারি নাই। মাসে যে টাকা আদায় হয় তাতে অফিসের খরচটি চলে যেতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস আছে, অর্থের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে থাকে না। জনসমর্থন যখন আওয়ামী লীগের আছে, জনগণের প্রাণও আছে। আমি দেখেছি এক টাকা থেকে হাজার টাকা অফিসে এসে দিয়ে গিয়াছে, যাদের কোনো দিন আমি দেখি নাই। বোধ হয় অনেককে দেখবোও না। ভরসা আমার আছে, জনগণের সমর্থন এবং ভালবাসা দুইই আছে আমাদের জন্য। তাই আন্দোলন ও পার্টির কাজ চলবে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে বরিশাল থেকে বাবু চিত্ত সুতারকে নিয়ে এসেছে। আমার সামনেই বিশ সেলের ৫নং ব্লকে রেখেছে। এখানে পাবনার রণেশ মৈত্রও

থাকেন। পরীক্ষা দিতে এসেছেন। দুইজন এক সাথেই থাকবে। ইনি এমপি ছিলেন, খুব নিঃস্বার্থ কর্মী। তাঁকেও ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলাম আমার ভগ্নিপতির সাথে জাহাজে দেখা হয়েছে, আমার মা অনেকটা ভাল। মনে একটু শান্তি পেলাম।

চিত্তবাবু বললেন, অন্যান্য দল ভুল করেছে আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া না দিয়ে। আর আলাপ হতে পারল না। কারণ আমি রাস্তায় ছিলাম তাই একটু কথা হলো। তারপর তারা যার যার ব্লকে চলে গেল। আমি আমার ব্লকে একা, একেবারে একা। কথা বলারও লোক নাই, কয়েকজন সাধারণ কয়েদি ছাড়া। ডাক পড়েছে, বুড়া জমাদার সাহেব বন্ধ করতে এসেছেন। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কাগজ কলম নিয়ে আমার লেখার কাজে বসে পড়লাম।

১৩ই জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

আজকাল খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠি। স্বাস্থ্য রক্ষা করারও চেষ্টা করি। বাইরে বসার জায়গায় যখনই বসেছি দেখি ইউনুস এসে হাজির। ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে। ইউনুসের বিশ বছরের সাজা হয়েছে। খুনের মামলা। সে বলে কিছুই জানি না। এর বেশি কিছু গোছাইয়া বলতে পারে না। আমাকে এসে ধরেছে, 'একটা কলম মাইরা দেন না, আমি খালাস হয়ে যাই। আপনি সইটা দিলেই হয়।' রোজই দুই একবার একই কথা বলে থাকে। আজ আর ছাড়ছেই না। জমাদার, সিপাহি যেই আসে তারা ওকে বলে, 'সাহেবকে ভাল করে ধর, তা হলেই খালাস।' জমাদার সিপাহিদের সে অনুরোধ করে গেটটা খুলে দিতে। তাহারা এখন মজা করে আমাকে দেখাইয়া দেয়। এক জমাদার সাহেব খুব রসিক মানুষ। বলে, 'খালিখালি কি কাজ হয় পাকিস্তানে? কিছু খরচ টরচ করো।' ইউনুসের কয়েক টাকা জমা আছে। মেট, পাহারা সকলকে বলে কিছু বাজার আনাইয়া দিতে। দুই টাকার বাজার, সিগারেট যে এনে দিবে তাকে আধা দিবে। বাকিটা আমাকে ও জমাদার সাহেবকে খাওয়াবে। সকলেই ওকে নিয়ে খেলা করে। আজ সত্য সত্যই সে বাজার আনতে গেটে রওয়ানা হয়েছে। অফিসে জমা টাকা থেকে সিগারেট, বিড়ি কিনে দেয়। এখন আর বিড়ি না, সকলে সিগারেট বা তামাক খায়।

আমি বললাম, 'ইউনুস কোথায় যাও?' বলে 'বাজার আনতে যাই, স্যার।' আমি রাগ করে বললাম, যদি বাজার আনো তবে আর আমি কলম মারব না। সে চুপ করে দাঁড়াইয়া রইল। না বাজার সে আনবে না, যদিও সিপাহি ও কয়েদিরা বলছে। কি করে ওকে বোঝাই আমার কলম যে ভোতা হয়ে গেছে। এ কলমে যে আজ আর কাজ হয় না। আমিও যে একজন ওরই মতো বন্দি সেটা আমি শত চেষ্টা করেও বোঝাতে পারি না। সকলেই ওকে নিয়ে তামাশা করে। ও যে একেবারে পাগল হয়ে যেতে পারে তাহা আমি সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, কেউ কিছু না বললেও, সে আমার কাছে চলে আসে, আর ঐ একই কথা।

খবরের কাগজ এসেছে, আমিও এরমধ্যে খেয়ে নিয়েছি। সিলেটের বন্যায় দেড়লক্ষ লোক গৃহহীন। ১০ জন মারা গেছে। কত যে গবাদি পশু ভাসাইয়া নিয়া গেছে তার কি কোনো সীমা আছে! কি করে এদেশের লোক বাঁচবে তা ভাবতেও পারি না। তার উপর আবার করের বোঝা।

ডক্টর নূরুল হুদা সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের বাজেট পেশ করেছেন। এক কোটি ১৬ লক্ষ টাকা নূতন কর ধার্য করেছেন। রাজস্ব খাতে আয় দেখাইয়াছেন ১১৮ কোটি ২৭ লক্ষ আর ব্যয় দেখাইয়াছেন ৯৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত ১৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ২৩০ কোটি, প্রাপ্ত সম্পদ ২০৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। মোট ঘাটতি ২৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

কত কর মানুষ দিবে! কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শোয়েব সাহেব বলেছেন, জনসাধারণ অধিকতর সচ্ছল হইয়াছে তাই কর ধার্য করেছেন। তিনি যাদের মুখপাত্র এবং যাদের স্বার্থে কাজ করেছেন তারা সচ্ছল হয়েছেন। তাদের করের বোঝা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা আনন্দিতই শুধু হন নাই, প্রকাশ্যে মন্ত্রীকে মোবারকবাদ দিয়ে চলেছেন। আর জনসাধারণ এই গণবিরোধী বাজেট যে গরিব মারার বাজেট বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে।

পাকিস্তান নাকি ইন্দোনেশিয়াকে চৌদ্দ কোটি টাকা ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। যে সরকার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুনিয়া ভর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমেরিকা সাহায্য না দিলে যারা বাজেট পেশ করতে পারে না, দিন দিন জনগণের উপর করের বোঝা চাপাইয়া অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তারা আবার ঋণ দিতে রাজি! এভাবেই আমরা ইসলামের খেদমত করছি! কারণ না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো তো ইসলামের হুকুম। দয়ার মন আমাদের! এমন প্রেম ভালবাসা-ই তো

আমাদের নীতি হওয়া উচিত! কাপড় যদি কারও না থাকে তাকে কাপড়খানা খুলে দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসবা। আমাদের সরকারের অবস্থাও তাই।

মা আরোগ্যের দিকে যেতেছে। ছোট ভাই নাসের তাকে খুলনায় নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য। মনটা আমার একটু ভাল। বিকালে আবার পূর্বের মতো প্রায় এক ঘণ্টা জোরে জোরে হাঁটাহাঁটি করি। 'আমার বাঁচতে হবে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে'।

একটু গরম কম পড়েছে, রাতে ঘুম হয় আজকাল বেশ।

১৪ই জুন ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

ভোরের দিকে বৃষ্টি হতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠেছি জানলা বন্ধ করতে। বিছানা ভিজে যাবে। উঠে দেখি মেট উঠে জানালা বন্ধ করেছে। আমি আবার শুয়ে পড়লাম, বিজলি পাখা বন্ধ করতে বললাম, কারণ বেশ একটু ঠান্ডা পড়েছে। আবার ঘুমাইয়া পড়লাম, উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। উঠেই দেখি চা প্রস্তুত। খেয়ে বাইরে হাঁটতে বেরুলাম। মুরগিটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে যেন কি কি ওষুধ খাইয়েছে বাবুর্চি। বলল, একটু ভাল। আমাকে বলল, মোরগটা জবাই দিয়ে ফেলি। বললাম, না, দরকার নাই। ও বেশ বাগান দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর চলাফেরার ভঙ্গিমা দেখে আমার ভাল লাগে।

আজ থেকে হাইকোর্টে আমার হেবিয়াস কর্পাস মামলার শুনানি হবে। কি হবে জানি না। অন্যায়ভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করেছে, ডিপিআরএ গ্রেপ্তার চলেছে। ঘাটাইল আওয়ামী লীগ অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলি মোক্তারকে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ জেলে পাঠাইয়াছে।

Rawle Knox (Daily Telegraph, June ৭, ১৯৬৬) 'East Pakistan's Case' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। কাগজ যে কোনো মতামত দিতে পারে তাতে আমার কিছুই বলা উচিত না। তবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর জুলুমের খবর আজ আর ছাপে নাই। ৬ দফা দাবি পেশ করার সাথে সাথে দুনিয়া জানতে পেরেছে বাঙালিদের আঘাত কোথায়? বাঙালিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা এমনকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুই নাই। ১৯ বৎসর পর্যন্ত চলেছে

শোষণ আর লুণ্ঠন। এখন এরা বুঝে ফেলেছে এদের জুলুম করার কায়দা কৌশল। তবে আর বেশি দিন নাই। যদিও জাতি হিসেবে বাঙালি পরশ্রীকাতর জাতি। 'পরশ্রীকাতরতা' দুনিয়ার কোনো ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না, একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া। এটি আমাদের চরিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকার যেভাবে বাংলাকে শোষণ করেছিল তার চেয়েও উলঙ্গভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি কলোনিয়াল শোষকরা পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছে। ইংরেজদের শাসনের সময়ও ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য বাঙালির অভাব হয় নাই। আজও হবে না। তবে যারা ত্যাগ করতে পেরেছে–ত্যাগ করে যাক, দুঃখ ও আফসোস করার কোনো দরকার নাই। সাংবাদিক Rawle Knox একটি সত্য কথা লিখেছেন, 'If Rawalpindi continues to belive that the revolutionary spirit of Bengal is something of a joke, the Pakistani capital could be making quite a mistake.'

পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য আমারও মনে হয় ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া উচিত –শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ করে আইয়ুব খান ও তার অনুসারীদের। তা না হলে পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাঙালির একটি গোঁ আছে, যে জিনিস একবার বুঝতে পারে তার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণও করতে পারে। পূর্ব বাংলার বাঙালি এটা বুঝতে পেরেছে যে এদের শোষণ করা হতেছে চারদিক দিয়ে। শুধু রাজনৈতিক দিক দিয়েই নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়াও।

আমি বিকালে সেলের বাইরে বসে আছি। কয়েকজন ছোট ছোট বালক জামিন পেয়ে বাইরে যেতেছে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে, মনে হয় যেতে পারলেই বাঁচে; থাকতে আর চায় না, এই পাষাণ-কারার ভিতরে। আমার কাছে এসে থেমে গেল। বলল, 'আমরা চললাম স্যার, আপনাকে বাইরে নেওয়ার জন্য আবার আন্দোলন করব।'

আমি বললাম, 'যাও, সকলকে আমার সালাম দিও। আমার জন্য চিন্তা করিও না।'

ওদের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। ওদের কথা শুনে আনন্দে আমার বুকটি ভরে গেল। মনে হলো এটা তো আমার কারাগার নয়, শান্তির নীড়। এই দুধের বাচ্চাদের কথা শুনে কিছু সময়ের জন্য আমার দুঃখ ভুলে গেলাম। শক্তি পেলাম মনে। মনে হলো পারব! বহুদিন জেল খাটতে পারব। এরাও যখন এগিয়ে এসেছে দেশের মুক্তির আন্দোলন তখন কে আর রুখতে পারে?

আমি যে একলা থাকি এ কথা কখনও আমার মন থেকে যায় না। এতে আমার শরীর নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। আমাকে ও আওয়ামী লীগ কর্মীদেরই সরকার বেশি কষ্ট দিতে চায় কারাগারে বন্দি করে।

রাতে আমাকে গল্প শোনাল এক কয়েদি—কি করে ডাকাতি করেছে তাদের দল। ডাকাতি পূর্বে করে নাই। তবে আসামি হওয়ার পরে ধরা না দিয়ে মামলার খরচ যোগাড় করার জন্য তিনটা ডাকাতি করেছে। তবে যে ডাকাতি মামলায় তার জেল হয়েছে তাতে তার কোনো দোষ নাই, কারণ সে ঐ ডাকাতির দলে ছিল না। আরও বলল, 'আর ডাকাতি করব না। কোনোমতে যে কয়দিন বেঁচে আছি, ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে পারলেই হলো। তবে ভয় হয় ট্যাকা দিতে না পারলে অন্য কোনো মামলায় আসামি না হয়ে পড়ি। যাই হোক না কেন, আর ডাকাতি করব না ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে বাস করতে চাই।'

১৫ই জুন ১৯৬৬ ॥ বুধবার

আজ আমার ছেলেমেয়েরা আসতেও পারে, কারণ ১৫ দিন হয়ে যায়। আমিও একটা দরখাস্ত করেছি, মায়ের অবস্থা জানবার জন্য তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। অনুমতি না আসা পর্যন্ত তো সঠিক খবর পাব না। চিন্তা না করতে চাইলেও চিন্তা আসে।

আমার বাবুর্চি একটা কবুতরের বাচ্চা পালে। তাকে আদর করে কোলে নিয়ে বেড়াই। এখনও কাপড়ের ছোট্ট থলিয়া বানাইয়া তার ভিতর ভিজা চাউল দিয়ে তারপর একটা ফুটো করে খাবার খাওয়াতে হয়। এখন একটু একটু উড়তে শিখেছে। চুপচাপ কিছু সময় তারপর দেয় ছুট। একেবারে পাকের ঘরের দিকে ছুটলো। মানে আমাকে আর ধরতে হলো না। বাচ্চাটা বাবুর্চিকে দেখলে মনে করে সেই বোধ হয় তার সব কিছু।

আজ বাইরে অনেক সময় বসে রইলাম। অনেক কথা মনে আসে! নানা বিষয়ের অনেক কথা। বরিশালের মি. চিত্তসূতার ও পাবনার রণেশ মৈত্র আমার সামনেই বিশ সেলে আছেন। আগে মাঝে মাঝে দরজা খুলতো, আজ থেকে কড়া হুকুম, দরজা খোলাই হবে না।

কি ভীষণ দুরবস্থা! যদিও ভিতরে সামান্য জায়গা আছে তবুও মন দেখতে চায় বাহিরটাকে। তাই মনের উপর এই ভীষণ অত্যাচার। বন্দি লোকগুলি অন্ধ

হয়ে যাবে, না হয় স্বাস্থ্য একবারে ভেঙে যাবে–বাইরে যেয়ে যেন আর কোনো কাজ করতে না পারে–এটাই স্বৈরাচারী সরকারের উদ্দেশ্য। আমি দূর থেকে অনেকক্ষণ দেখলাম, দরজা খোলা হলো না। পরে খবর নিয়ে জানলাম কড়া হুকুম, জমাদার সিপাহির চাকরি থাকবে না। আমার সাথে যেন কোনোমতে কথা না বলতে পারে। কথা তো আমরা বলতেও পারি না। দরজা খুললে দরজার কাছে দাঁড়ালে দূর থেকে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাতে পারি। এর বেশি তো আর না। আমার অবস্থা হয়েছে, 'পর্দানসিন জানানা'র মতো, কেউ আমাকে দেখতেও পারবে না, আমিও কাউকে দেখতে পারব না। কেউ কথা বলতে পারবে না, আমিও পারব না।'

আমার উপর সরকারের কড়া নজর। জেলের ডি.আই.জি. সাহেবকে বলেছি, জেলের আইন ভঙ্গ করে আমাকে একাকী রেখেছেন। জেল আইনে কাহাকেও বিনা অপরাধে, 'Solitary Confinement'–রাখার নিয়ম নাই। এটা আইন বিরুদ্ধ, তবুও আপনারা আইন ভঙ্গ করে চলেছেন। 'উপরের হুকুম' বলে আপনারা চুপ করে থাকেন। আমাকে 'হুকুম' দেখান, আমি আপত্তি করব না। একাকী থাকবো যত কষ্টই হয়। ডিআইজি সাহেব বললেন, 'আমি উপরের সাথে আলাপ করে আপনাকে জানাবো'। কি হবে সে আমি জানি, তবে পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। আমি বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার সহ্য করার লোক নই।

সময় কাটছে না, খবরের কাগজ পাঠাতে দেরি করছে। বসে আছি গেটের দিকে চেয়ে, কখন আসে, ১২টা, ১টা, ২টা বেজে গেল–কাগজ এল না। তখন বাধ্য হয়ে ডিউটি জমাদার সাহেবকে বললাম, কি অন্যায়, ২টা বেজে গেল, আর এখনও খবরের কাগজ জেল অফিস থেকে আসছে না। মেহেরবানী করে খবর নেন কাগজ দিবে কি দিবে না? যদি একেবারেই না দেয় সে অন্য কথা। আমরা বুঝতে পারি রাজা বাদশার আমলের বন্দিখানায় আছি। সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে হকাররা কাগজ দিয়ে যায়, আর একটা দস্তখত করে ভিতরে পাঠাতে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা। এর কোনো অর্থ বুঝতে আমার সত্যই কষ্ট হয়। ইচ্ছা করলেই ১০টার মধ্যে কাগজ আমাদের দিতে পারে। বন্দির তো কোনো মতামত নাই। আর এদের ইচ্ছা বলেও কোনো পদার্থ নাই। কাগজ দেখে মনে হলো, ১৪ তারিখে আমাদের মামলা শুরু হয় নাই হাইকোর্টে।

ইংল্যান্ড থেকে আমাকে এক তারবার্তা পাঠাইয়াছে 'প্রবাসী বাঙালীরা সমগ্র বৃটেনে শহীদ দিবস পালন করবে ১৭ ও ১৮ জুন।' ব্রিটেনস্থ পাকিস্তানিদের প্রতিষ্ঠান প্রগতি ফ্রন্টের জেনারেল সেক্রেটারি এস এম হোসেন বৃটেনের সকল পাকিস্তানি নাগরিক ও পাকিস্তানি সংস্থাসমূহের প্রতি সাফল্যজনকভাবে শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের দ্বারা অত্যাচারী জালেমশাহীর পাশবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, দুর্নীতি, অবিচার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের অবসানের জন্য আমাদের সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলিতে হইবে।'

এই সংবাদ দৈনিক আজাদ কাগজে ৭ই জুন ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাহির হয়েছে।

'বৃটেনস্থ পাকিস্তানিদের পক্ষ হইতে জনাব হোসেন ও 'পাকিস্তান সমিতি'র প্রেসিডেন্ট জনাব আফরোজ বখত দেশ ও জনগণের জন্য সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা ও দুঃখ ভোগের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

তারবার্তায় তাহারা বলেন, "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তাহাতে আমাদের সমর্থন রহিয়াছে। এই আন্দোলনকে নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমাদের প্রাণদানকারী ভ্রাতাদের রক্তপাত ব্যর্থ যাইবে না। আমরা তাহাদের জন্য ও একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছি—জনসাধারণের প্রতি ইহাই আমাদের বাণী।'

'জাতীয় পরিষদের ভিতর ও বাহিরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে তারবার্তায় জনাব নূরুল আমীনের প্রতিও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রক্তপাতের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে ইহার ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বাধিক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল।

তারবার্তায় জাতীয় সংহতির স্বার্থে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান ও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান হয়।'

এই তারবার্তা আমার কাছে পৌঁছায় নাই। কারণ আমাকে আইবি ডিপার্টমেন্ট দিবে না। কোনো কাগজপত্র চিঠি বই খাতা যদি আনতে হয় তবে এদের মাধ্যমে আসবে। ইচ্ছা করলে না দিয়াও পারে। বলবার কিছুই নাই। এমনকি স্ত্রীর সাথে বা ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করতে হলে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী সামনে বসে থাকবে, কোনো রাজনৈতিক কথা বলি কিনা শুনবে।

যখন প্রবাসী পাকিস্তানিরাও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে এবং ন্যায্য দাবি সমর্থন করিতে শুরু করিয়াছে তখন সাফল্যের আর বেশি দিন নাই। বন্ধুদের তারবার্তার উত্তর যখন দিতে পারলাম না, তখন নীরবে তাদের মঙ্গল কামনা করি। আর প্রতিজ্ঞা করি হতভাগা ভাইদের রক্তকে বৃথা যেতে দিব না।

সাড়ে চারটায় জেলের লোক এসে বলল—চলুন আপনার দেখা আসিয়াছে, আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে বসে আছে জেল অফিসে। তাড়াতাড়ি রওয়ানা করলাম। দূর থেকে দেখি রাসেল, রেহানা ও হাচিনা চেয়ে আছে আমার রাস্তার দিকে। ১৮ মাসের রাসেল জেল অফিসে এসে একটুও হাসে না—যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম দূর থেকে পূর্বের মতোই 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার করছে। জেল গেট দিয়ে একটা মাল বোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভিতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে, বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ওর ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। যাবার সময় হলে ওকে ফাঁকি দিতে হয়। ছোট মেয়েটার শুধু একটা আবদার। সে আমার কাছে থাকবে। আর কেমন করে কোথায় থাকি তা দেখবে। সে বলে, থেকে যেতে রাজি আছি। রেণু বলল, মাকে আমার ছোট ভাই খুলনা নিয়ে গেছে। একটু ভালর দিকে। ঢাকা আনা সম্ভব হবে না সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। হাচিনার কলেজ বন্ধ, তাই খুলনা যেতে চায়। বললাম, যেতে দাও মা'র একটু খেদমত হবে। জামালের শরীর খারাপ, গলা ফুলে রয়েছে। এ বড় খারাপ ব্যারাম। রেণুকে তাই বললাম, ডাক্তার দেখাইও। স্কুলে যেতে পারবে না। এছাড়াও আরো অনেক কথা হলো।

রাশেদ মোশাররফ ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক। আমার বাড়ির কাছে থাকে। তাহার বিবাহের তারিখ ১২ই জুন ঠিক ছিল, বিবাহের

কার্ডও ছাপান হয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হয়েছে। রেণু দুঃখ করে বলল, সে তো বিবাহ নিয়াই ব্যস্ত ছিল, তাকে যে কেন ধরে এনেছে! এদের গ্রেপ্তারের কোনো তাল নাই। ছোট ছোট দুধের বাচ্চাদের ধরে নিয়ে এসেছে রাস্তা থেকে, রাতভর মা মা করে কাঁদে। একজন মহিলা, এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করে। এরই মাধ্যমে সংসার চালায়, বড় গরিব। তার ছয় বৎসরের ছেলেকে নিয়ে চলেছে সেই বাড়িতে কাজ করতে। গাড়ি থামাইয়া পুলিশ ডাক দেয়, এই ছেলে শোন। ছেলেটি এগিয়ে গেছে, তাকেও গাড়িতে উঠাইয়া নিয়েছে। মহিলাটি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। কে কার কথা শোনে! একেবারে জেলে নিয়ে এসেছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে মোনায়েম খান সাহেবের দৌলতে।

প্রায় এক ঘণ্টা রেণু এবং আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছিলাম। সংসারের ছোটখাট আলাপ। ওদের বলেছি আর কোনো কষ্ট নাই; একাকী সঙ্গীবিহীন আছি। মানিক ভাইকে বলতে বললাম, তিনি যেন চীফ সেক্রেটারিকে বলেন কেন এই অত্যাচার? আমার স্ত্রী বলল, মানিক ভাইর সাথে দেখা করব। সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে আর দেরি করা চলে না। তাই বিদায় দিলাম ওদের। রাসেলকে গাড়ির কথা বলে কামালের কাছে দিয়ে সরে এলাম।

কে বুঝবে আমাদের মতো রাজনৈতিক বন্দিদের বুকের ব্যথা। আমার ছেলেমেয়েদের তো থাকা খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না। এমন অনেক লোক আছে যাদের স্ত্রীদের ভিক্ষা করে, পরের বাড়ি খেটে, এমনকি ইজ্জত দিয়েও সংসার চালাতে হয়েছে। জীবনে অনেক রাজবন্দির স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের চিঠি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সে-করুণ কাহিনী কল্পনা করতেও ভয় হয়।

যারা স্বার্থের জন্য আমাদের বৎসরের পর বৎসর কারাগারে বন্দি করে রেখেছ—কিছুদিন যে ক্ষমতায় ছিলাম তখন তাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দি করে রাখি নাই। এমনকি জেলগেটে এসে রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলাম।

এখানকার স্বৈরশাসকদের বি. টীম ও সি. টীম এখন অন্য ভোল্ ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারাই আজ জুলুম করছে আমাদের উপর। যদি কিছুদিনের জন্য জেল দিয়ে সেলের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে রেখে একবার লছমি খাবার দিতাম, তবে জীবনেও আর রাজনীতির নাম নিত না। জেল বন্দি

করার সাথে বন্ড দিয়া বাহির হয়ে যেত। অথচ এমন অনেক রাজবন্দি এখনও জেলে আছে, যারা প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে; হাঁটতে চলতেও পারে না, খেয়ে হজম করতেও পারে না। প্রায় ১৩/১৪ বৎসর—পাকিস্তান হওয়ার পরেই জেলে আছে। তারা জানে জেলেই তাদের মরতে হবে বোধ হয়, তবুও বন্ড দেয় নাই। এই সমস্ত ত্যাগী রাজনৈতিক নেতাদেরও আমরা শ্রদ্ধা করি। এঁদের উপর যারা জুলুম করে, তারা কত বড় নিষ্ঠুর হতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। আমার ভাষা নাই তাই লিখতে পারলাম না।

আবার কারাগারের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকি জমাদার সাহেবের আগমনের জন্য। তালাবন্ধ হতে হবে। যথারীতি আমার গুহার মধ্যে রাতের জন্য শুভাগমন করিয়া 'তৃপ্তির' নিশ্বাস ফেললাম।

যেদিন বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়, ওরা চলে যাবার পরে মন খারাপ লাগে। আমাদের মতো 'দাগী'দেরও মন খারাপ হয়। পরে আবার ঠিক হয়ে যায়।

১৬ই জুন ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম ইত্তেফাক কাগজের কোনো এক বড় অফিসারকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। ভাবলাম কে হবে, মানিক ভাই ছাড়া! খবর কেহই সঠিক বলতে পারছে না। পাগলের মতো সকলকেই জিজ্ঞাসা করলাম। কেহই ঠিক মতো বলতে পারে না। এমনভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমি চুপ করে বসে আছি, খবর আমাকে জানতেই হবে। বুঝতে পেরেছি মানিক ভাই, কিন্তু পাকাপাকি খবর পাচ্ছি না। একটু পরেই একজন বলল, 'তফাজ্জল হোসেন সাহেবকে ভোরবেলা নিয়ে এসেছে। ১০ নম্বর সেলে রেখেছে'। আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগল খবরটায়। এরা মানিক ভাইকেও ছাড়ল না? এরা কতদূর নেমে গেছে। পাকিস্তানের সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে। তাঁর কলমের কাছে বাংলার খুব কম লেখকই দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক সমালোচনার তুলনাই হয় না। তাঁর নিজের লেখা 'রাজনৈতিক মঞ্চ', পড়লে দুনিয়ার অনেক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে সহজ হয়। সাধারণ লোকেরও তাঁর লেখা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁকে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলা যেতে পারে।

তিনি কোনোদিন সক্রিয় রাজনীতি করেন নাই। তাঁর একটি নিজস্ব মতবাদ আছে। সত্য কথা বলতে কাহাকেও তিনি ছাড়েন না। আইয়ুব খান সাহেবও

তাঁকে সমীহ করে চলেন। তিনি মনের মধ্যে এক কথা আর মুখে এক কথা বলেন না। তিনি হঠাৎ রেগে যান, আবার পাঁচ মিনিট পরে শান্ত হয়ে পড়েন। কেহ ভাবতেই পারবেন না তাহার মুখ খুবই খারাপ, মুখে যাহা আসে তাহাই বলতে পারেন। অনেক সময় আমার তাঁর সাথে মতের অমিল হয়েছে। গালাগালি ও রাগারাগি করেছেন, কিন্তু অন্য কেহ আমাকে কিছু বললে, আর তার রক্ষা নাই, ঝাঁপাইয়া পড়েন। আমাকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করেন। আমিও তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি। কোনো কিছুতে আমি সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে তাঁর কাছে ছুটে যাই। তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া দেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁর কাছ থেকেই বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে থাকি। কোনো লোভ বা ভ্রূকুটি তাকে তাঁর মতের থেকে সরাতে পারে নাই। মার্শাল ল'র সময়ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে নেওয়া হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে গ্রেপ্তার করার পরেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার আজও তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। তাঁর উপর অনেকেরই ঈর্ষা এবং আক্রোশ রয়েছে।

এরা অনেকেই মনে করে আমি যাহা করি সকল কিছুই তাঁর মত নিয়ে করে থাকি। আমার দরকার হলে আমিই তাঁর কাছে যাই পরামর্শের জন্য। তিনি কখনও গায়ে পড়ে কোনোদিন পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেন নাই। তবে তাঁর সাথে আমার মনের মিল আছে, কারণ ২৫ বৎসর এক নেতার নেতৃত্ব মেনে এসেছি দুইজন। অনেকেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে বেইমানী করেছেন। আমরা দুইজন একদিনের জন্যও তাঁর কাছ থেকে দূরে যাই নাই। পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জন্য ইত্তেফাক যা করেছে তা কোনো খবরের কাগজই দাবি করতে পারে না। এদেশ থেকে বিরুদ্ধ রাজনীতি মুছে যেত যদি মানিক মিয়া এবং ইত্তেফাক না থাকতো। একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর থেকে হাজার রকমের ঝুঁকি লইয়াও তিনি এদেশের মানুষের মনের কথা তুলে ধরেছেন।

ছয় দফার আন্দোলন যে আজ এত তাড়াতাড়ি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে এখানেও মানিক ভাইয়ের লেখনী না হলে তা সম্ভব হতো কিনা তাহা সন্দেহ! আমি যাহা কিছু করি না কেন, তাহা মানিক ভাইয়ের দোষ, সরকারের এটাই ভাবনা। ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান আক্রমণ করল তখন যেভাবে ইত্তেফাক

কাগজ সরকারকে সমর্থন দিয়েছে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে—ত্যাগের জন্য ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য, ইত্তেফাকের পাতা খুললেই তাহা দেখা যাবে। তবুও আজ তাকে ডিপিআরএ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন বুঝতে কারও বাকি নাই কেন জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করছেন না সরকার। দেশরক্ষা করার জন্য যে আইন করা হয়েছিল সে আইন আজ রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। খবরের কাগজের স্বাধীনতার উপর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতেছে। এমনকি মানিক মিয়ার মতো সম্পাদককেও দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে একটু লজ্জা করল না। তফাজ্জল হোসেন সাহেব, যাকে আমরা সকলে মানিক ভাই বলে ডাকি তিনি শুধু ইত্তেফাকের মালিক ও সম্পাদক নন, তিনি আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার সভাপতি এবং প্রেস কোর্ট অব অনারের সেক্রেটারি।

১৯৫৯ সালে আমি যখন জেলে ছিলাম আমাকে তখনও একাকী রাখা হয়েছিল। মানিক ভাইকে গ্রেপ্তার করে পুরানো ২০ সেলে রাখা হয়েছিল। সকালে ও বিকালে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সাথে তাঁর দেখা হতো। তখন তিনি বোধ হয় একমাস কি দেড়মাস ছিলেন। মানিক ভাইকে খুবই কষ্টে রাখা হয়েছিল। ১৯৬২ সালে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে আমি জেল গেটে এসে পাই। যতদিন জেলে ছিলাম একসাথেই ছিলাম। সকলে খালাস হয়ে গেলেও আমি আর মানিক ভাই ছিলাম। মানিক ভাই অসুস্থ হয়ে বাইরের হাসপাতালে গেলে আমি একলাই ছিলাম। কয়েকদিন পরেই আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আজ আমাকে রাখা হয়েছে সেল এলাকায়। এখানে ভয়ানক প্রকৃতির লোক, একরারী আসামি, জেল আইন ভঙ্গ করার জন্য সাজাপ্রাপ্ত আসামি, আর পাগলা গারদ। এই এরিয়ার সবগুলোই সেল। মোট ৯৩টা সেল আছে। আমার ঘরটা বাদে। এটা সেল না, সেলের থেকে একটু বড়। তবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উঁচু দেয়াল। শুধু সুবিধা হলো ঘরটার সামনে কিছু জায়গা আছে। কিছু গাছ-গাছালি আছে বলে ফুলের ও ফলের বাগান করতে পারি। এদের কাছে থাকতে আমার আপত্তি নাই, কারণ বোধ হয় নিজেও আমি 'ভয়ানক' প্রকৃতির লোক। মানে ভয়ডর একটু কম।

মানিক ভাই ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের রাখা হয়েছে আমার থেকে অনেক দূরে। দেখা হওয়ার উপায় নেই। ১০ সেলে মানিক ভাই ও সহকর্মীরা কি

করে আছে ভাবতে আমার কষ্টই হয়। নিচু সেল, জানলা নাই, একটা দরজা তাও আবার সামনে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উপরের থেকে নাকি হুকুম আসে কাকে কোথায় রাখতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষের হাতে কিছুই নাই। আমি প্রতিবাদ করলাম। আমার কাছে না দেয় তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু এমন জায়গা দেওয়া হউক যেখানে তাহারা মানুষের মতো বাস করতে পারেন। জেল কর্তৃপক্ষকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। তবে আমার কাছে খবর আছে, এক ভদ্রলোক বলে দেন কোথায় কাকে রাখতে হবে।

মানিক ভাইয়ের লেখা পড়ব না এটা আমার একটা দুঃখ। দিন যে কিভাবে কেটে গেল বলতেও পারি না। খবরের কাগজে মানিক ভাইয়ের গ্রেপ্তারের কোনো খবর নাই। বোধ হয় খুব ভোরে গ্রেপ্তার করেছে।

সমস্ত পূর্ব বাংলায় এবারও বন্যা হবে। সিলেট তো শেষই হয়ে গিয়াছে বলে মনে হয়। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া, রংপুর, পাবনায়ও বন্যা হবে। ঢাকাও বাদ যেতে পারে না। পূর্ব বাংলার লোকের দশা কি হবে তাই ভাবছি। এর উপর আবার করের বোঝা সরকার চাপাইয়া চলছে।

১৭ই জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

ভীষণ বৃষ্টি। বাইরে যাওয়ার উপায় নাই। বারান্দায় ঘুরলাম, বারান্দায় কয়েকজন কয়েদি আশ্রয় নিয়েছে। একজন খবর দিল রফিক সাহেব নামে আমাদের দলের একজন নেতা এসেছেন। তাকেও দশ সেলে রাখা হয়েছে। চলেছে গ্রেপ্তার সমানে। মনে হয় মোনায়েম খান সাহেব ৭ তারিখের পরে আরও ক্ষেপে গেছেন। বোধ হয় ভুলে গেছেন, যে লোক বেশি রাগান্বিত ও অধৈর্য হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকেই হারতে হয়। মাথা ঠান্ডা রেখে যে সংগ্রাম চালাইয়া যায় শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। রফিক আমার বহুদিনের সহকর্মী। কলিকাতা থেকেই একসাথে রাজনীতি করেছি। তবে মাঝে অনেকবার এদিক ওদিক করেছে। সেই জন্য সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে ওকে বিশ্বাস করতে চায় না। এবার যখন আবার আওয়ামী লীগে ফিরে এল তখন সত্যই ওকে আমি বিশ্বাস করেছি, কারণ এখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কোনোদিন ওকে কেহ গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। ১৯৪৯, ১৯৫২, ১৯৫৪ প্রত্যেক বারেই রফিক কেটে পড়েছে। তাই মনে মনে

বললাম, 'বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান?' এবার যে সে ভাগতে চেষ্টা করে নাই, তার প্রমাণও পেয়েছি। সভা সমিতিতে যেয়ে জোর বক্তৃতা করেছে আমাদের গ্রেপ্তারের পরেও। মনে হয় আওয়ামী লীগের কাকেও আর বাইরে রাখবে না। বোধ হয় এখনও অনেককে ধরতে চেষ্টা করছে। কেউ কেউ বোধ হয় আত্মগোপন করে কাজ চালাইয়া যেতেছে।

মানিক ভাইয়ের কাছেই রেখেছে রফিককে। ভালই হয়েছে একজন সাথী পেয়েছেন। যারা ১০ সেলে আছে তারা মানিক ভাইকে সমীহ করে চলে। নিশ্চয়ই দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে।

ন্যাপ দলীয় মশিউর রহমান আইন পরিষদে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোনো লোক আশ্চর্য না হয়ে পারবে না। সরকারি দলের সমর্থকরা যাহা বলিয়াছেন তিনি সেই কথাগুলি আরও জোরে জোরে বলিয়াছেন। তিনি তাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ (সিআইএ) অর্থ প্রদান করিয়াছে।' 'গত সপ্তাহে প্রদেশে যে ধর্মঘট হইয়াছে তাহাতে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।' এরা আবার প্রগতির কথা বলে! পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি, শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি আজ নূতন নয়। তিনি যখন ১৯৪৭-৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন, প্রত্যেকটা গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য রংপুরে গুন্ডা লেলাইয়া দিতেন। বাংলা ভাষার আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য নিজে কর্মী ও ছাত্রদের উপর গুন্ডামি করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৪ সালের মুসলিম লীগের টিকিট নিয়ে যখন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তখন ১৯৫৬ সালে পৃথক নির্বাচন সমর্থন করে মুসলিম লীগের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সারাজীবন দালালির রাজনীতি করে বেড়াইয়াছেন, আবার রাতারাতি ১৯৫৭ সালে 'প্রগতিবাদী' হয়ে ন্যাপে যোগ দিয়াছেন। আর যারা এই স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের আন্দোলনের জন্য সারাজীবন অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে এবং মামলার আসামি বা রাজবন্দি হিসেবে বৎসরের পর বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছে, তাদের সম্বন্ধে এই সমস্ত নীচ কথা উচ্চারণ করা তার পক্ষেই সম্ভবপর। সরকারের সাথে গোপনে পরামর্শ করে যে লোক জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়, রাওয়ালপিন্ডি আর করাচী ঘুরে পারমিটের ব্যবসা করে বেড়ায়,

তাহার কাছে একটা সংগ্রামী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এবং জনগণের গণআন্দোলন সম্বন্ধে এই সব কথা শোভা পায় কিনা জনগণ বিচার করবে।

আজ এতগুলি লোক গুলি খেয়ে জীবন দিল। শত শত লোক কারাগারে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। শত শত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। শত শত মামলা ছাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো সহানুভূতি যে পার্টির নেতারা দেখান না, তাদের পক্ষে সবই সম্ভবপর। আমি জানি এই সকল কথা বললে এরা পিন্ডি বসে পারমিটের ব্যবসা করার আরও সুযোগ পাবে। কত হাজার টন সিমেন্টের পারমিট করাচী থেকে এনে কার কাছে বিক্রি করেছেন—একথাও আমার জানা আছে। আমি বন্দি, আমার সহকর্মীরা বন্দি, তা না হলে তাকে ও তাদের নেতাদের কি উত্তর দিতে হয় তা আমি জানি। জনগণ তাদের পিছনে নাই, এখন উপরতলার রাজনীতি করেন। শুধু 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিৎকার করে আর সাম্রাজ্যবাদের দালালদের তলে তলে সমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যাবে না। গণআন্দোলনে বিশ্বাস করেন, জনগণের উপর নির্ভর করেন। ৬ দফা শুনে ঘাবড়াবেন না, এ দাবি জনগণের দাবি। আপনার 'নেতা' মওলানা ভাসানী সাহেবকে ময়দানে নামান। আইয়ুব সাহেবের দলে তো আপনারা আছেনই এবং সাহায্য নিয়ে থাকেন। অবস্থা কি আপনাদের? এ নেতার সম্বন্ধে আমার এতখানি না লেখলেও চলত, কারণ এদের কথার দাম বাঙালি দেয় না। আন্দোলন কখনও বাইরে থেকে আমদানি হয় না। বাংলাদেশের লোকের প্রাণ আছে। পারমিটের টাকা দিয়া গণআন্দোলন হয় না। আপনার জানা উচিত সিআইয়ের এজেন্টরাই পাকিস্তান শাসন করছে। নূতন এজেন্টের দরকার হয় নাই, আর হবেও না। আর দরকার হলেও আপনাদের মতো এজেন্ট অনেক পাবে তারা। কারণ তারা বোধ হয় জানে আপনাদের চরিত্র। এজেন্সির রাজনীতি আপনাদের নেতারাই করে থাকেন।

ইত্তেফাক কাগজ আসে নাই। এর পরিবর্তে আমাকে 'দৈনিক পাকিস্তান' দিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলল, কাগজ বন্ধ, সরকার নাকি বন্ধ করে দিয়েছে। আর খবর পেলাম রাতে মানিক ভাইয়ের কাছে একটা নোটিশ দিয়ে গিয়াছে। আমার মনে হলো সরকার নিশ্চয়ই কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে। মোনায়েম খান সব পারে, 'বানরের হাতে শাবল'! যে যতটুকু ক্ষমতা হজম করতে পারে তাকে ততটুকু দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় ক্ষমতার

অপব্যবহার যে সে করবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আইয়ুব সাহেব নাকি তাকে পূর্ব বাংলাকে ঠিক রাখার জন্য সব ক্ষমতা দিয়েছেন!

আজ আর সঠিক খবর পেলাম না। মানিক ভাইকে যেখানে রেখেছে, সেখান থেকে খবর আনা খুবই কষ্টকর। এতবড় আঘাত পেলাম তা কল্পনা করতে বোধ হয় অনেকেই পারবে না। প্রথম থেকেই এই কাগজের সাথে আমি জড়িত ছিলাম।

সারাদিন একই চিন্তা। এবার জেলে এসে একদিনও শান্তিতে থাকতে পারলাম না। ঘরে বাইরে করতে করতে দিন চলে গেল। রাতটাও কেটে গেল একই চিন্তায়। আগামীকাল খবরের কাগজ এলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে এই আশায় রইলাম। আমি বলে দিয়েছি দৈনিক পাকিস্তান রাখবো না, 'সংবাদ' কাগজ যেন দেওয়া হয়। পূর্বে ছিল ইত্তেফাক, আজাদ, অবজারভার, মর্নিং নিউজ আর ডন। এখন সংবাদও আসবে। ইত্তেফাকের কি হবে এখন ঠিক বলতে পারি না।

১৮ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

সূর্য উঠেছে। রৌদ্রের ভিতর হাঁটাচলা করলাম। আবহাওয়া ভালই। তবুও একই আতঙ্ক—ইত্তেফাকের কি হবে! সময় আর কি সহজে যেতে চায়। সিপাহি, জমাদার, কয়েদি সকলের মুখে একই কথা, 'ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে।'

ঘরে এসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এমিল জোলা-র লেখা 'তেরেসা রেকুইন' (Therese Raquin) পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র—জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই তিন ঘণ্টা সময়।

আজ সিভিল সার্জন আসলেন আমাকে দেখতে। শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম ভালই আছি, ভালই থাকতে হবে। তিনি কাজের লোক, দেরি না করে চলে গেলেন। আমিও বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বহুদিন পর্যন্ত দু'টি হলদে পাখিকে আমি খোঁজ করছি। ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন ছিলাম এই জায়গাটিতে তখন প্রায়ই ১০টা/১১টার সময় আসত, আর

আমগাছের এক শাখা হতে অন্য শাখায় ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে পোকা ধরে খেত। আজ ৪০ দিন এই জায়গায় আমি আছি, কিন্তু হলদে পাখি দু'টি আসল না। ভাবলাম ওরা বোধ হয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও দূরে চলে গিয়াছে। আর আসবে না। ওদের জন্য আমার খুব দুঃখই হলো। যখন ১৬ মাস এই ঘরটিতে একাকী থাকতাম তখন রোজই সকাল বেলা লেখাপড়া বন্ধ করে বাইরে যেয়ে বসতাম ওদের দেখার জন্য। মনে হলো ওরা আমার উপর অভিমান করে চলে গেছে।

খাবার কাজটি কোনোমতে শেষ করে খবরের কাগজের অপেক্ষায় রইলাম। আজও অনেক দেরি হলো কাগজ আসতে। ডিউটি জমাদার সাহেবকে বললাম, আপনি ডিউটিতে আসার পর থেকে কাগজ দেরি করে আসতে শুরু করেছে। কাগজ আসতে দেরি হলে আমার ভীষণ রাগ হয়। দুই এক সময় কড়া কথাও বলে ফেলি।

প্রায় তিনটার সময় কাগজগুলি কয়েদি পাহারা নিয়ে এল। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন বলে 'নিউনেশন প্রেস' বাজেয়াপ্ত করিয়াছে সরকার। এই প্রেস হইতে 'ইত্তেফাক', ইংরেজি 'সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস' ও বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' প্রকাশিত হইত। পুলিশ প্রেসে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্বের দিন ইত্তেফাক ও নিউনেশন প্রেসের মালিককে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ১০ সেলে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে ইত্তেফাক সকল কাগজের থেকে বেশি ছাপা হয়। এর পাঠকের সংখ্যা অসংখ্য। বাংলার গ্রামে গ্রামে ইত্তেফাক পরিচিত। দেশরক্ষা আইনের বলে অন্য কোনো কাগজকে এত বড় আঘাত করা হয় নাই। ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে এবং তাহার মালিক ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে ৬ দফার দাবিকে বানচাল করতে চায়। কিন্তু আর সম্ভব হবে না। এতে আন্দোলন আরও দানা বেঁধে উঠবে। যার পরিণতি একদিন ভয়াবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কি করে আইয়ুব খান সাহেব মোনায়েম খান সাহেবকে এ কাজ করতে অনুমতি বা নির্দেশ দিলেন আমার বুঝতে কষ্ট হয়।

খবর নিয়ে জানলাম মানিক ভাই প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, সে জন্য একটুও মুষড়ে পড়েন নাই। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ কোনো প্রেসেই আওয়ামী লীগের কোনো প্যামফলেট ও পোস্টার ছাপাইতে দেওয়া হইতেছে

না। যে প্রেসই ছাপায় তার মালিককে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। প্যামফলেট ছাপানো বেআইনি নয়। এমনকি কালো ব্যাজ ছাপার জন্যে 'দি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেসের' মালিককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। বোঝা গেল গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে তারা দিবে না। একদলীয় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। পূর্ব বাংলায় এটা বেশি দিন চলতে পারে না। আন্দোলনকে ভিন্ন গতি নিতে এরা বাধ্য করছে—যা আমরা চাই নাই। ইত্তেফাক বন্ধ হতে পারে কিন্তু ইত্তেফাক যা চায় তা জনগণেরই দাবি এবং মনের কথা।

এখন আর কাগজ পড়তে বেশি সময় আমার দরকার হয় না। 'মর্নিং নিউজে'র হেড লাইনগুলি দেখলেই বুঝতে পারি কি লিখতে চায়। 'আজাদ' আওয়ামী লীগের কিছু কিছু সংবাদ দেয়। 'সংবাদ' তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেগুলি দরকার তাই ছাপায়। 'অবজারভার' বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছে। আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করলাম, খবরের কাগজের সম্পাদকরা আজ পর্যন্ত প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতিও দিল না—এমন কি সহকর্মী ইত্তেফাকের সম্পাদকের মুক্তি চেয়েও না। ইত্তেফাককে যদি অত্যাচার করে ধ্বংস করতে পারে তবে কেউই রেহাই পাবে না। একটু সবুর করলেই দেখতে পাবেন। আমার মনে হয়, আমার সহকর্মীরা—যারা বাইরে আছেন তারা এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে যদি দরকার হয়, গ্রেপ্তার হয়ে তাদের জেলে আসা উচিত।

মার্কিন সরকার পাকিস্তান ও ভারতকে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর হইতে বলা হইয়াছে বর্তমানে পাক-ভারতের মধ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে আপাতত কাহাকেও সামরিক সাহায্য দিবে না। প্রেসিডেন্ট মি. লিন্ডন বি জনসন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ওয়াশিংটনে বসিয়া আলাপ করিয়া খুশি হইয়াছেন। নিজের দেশকে এত হেয় করে কোনো স্বাধীন দেশের সরকার এরূপভাবে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। শুধু সরকারকে অপমান করে নাই, দেশের জনগণ ও দেশকেও অপমান করেছে। ভিক্ষুকের কোনো সম্মান নাই। তবে শোয়েব সাহেব যে অর্থনীতি এখানে চালাইতেছেন তাতে ইহা ছাড়া আইয়ুব সাহেবের উপায় বা কি ছিল? একমাত্র সমাজতন্ত্র কায়েম করলে

কারও কাছে এত হেয় হয়ে সাহায্য নিতে হতো না। দেশের জনগণেরও উপকার হতো। এখন তো কিছু কিছু লোককে আরও বড় লোক, আর সমস্ত জাতিকে ভিখারী করা ছাড়া উপায় নাই। পুঁজিপতিদের কাছে পাকিস্তানকে কি বন্ধক দেওয়া হলো জীবনের তরে? মওলানা ভাসানী সাহেব কোথায়? কি বলেন? আইয়ুব সাহেবের হাতকে শক্তিশালী করে পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে বের করে এনে সোসালিস্ট ব্লকে যোগ দিতে তিনি নাকি সক্ষম হবেন! তাই তিনি আইয়ুব সাহেবের সমস্ত অগণতান্ত্রিক পন্থাকে সমর্থন করেছেন। আর আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলকে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বলে গালি দিয়েছেন। এখন তো প্রমাণ হয়ে গেছে মওলানা সাহেব ও তাঁহার দলের কিছু সংখ্যক লোক সাম্রাজ্যবাদীদের দালালের দালালি করেছেন।

আমার এক বন্ধু এমপিএ ছিলেন ১৯৫৭ সালে। মওলানা সাহেব যখন ন্যাপ করলেন ইস্কান্দার মির্জার সাহায্যে প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির ধুয়া তুলে, তখন ন্যাপ পার্লামেন্টারি পার্টি গঠন করে আওয়ামী লীগ থেকে সমর্থন উঠাইয়া নিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলো। তখন তিনি ন্যাপের এক পার্টি মিটিংয়ে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা চলবে না। কে এস পি, নিজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ কোয়ালিশনকে সমর্থন করা উচিত। তখন কিছু কিছু সদস্য তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই সমস্ত দল কি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করতে পারে? এরা ইস্কান্দার মির্জার দালালি করছে। ইস্কান্দার মির্জা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকে ধ্বংস করতে চায়। আওয়ামী লীগ তো বন্দিদের মুক্তি দিয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। যুক্ত নির্বাচনের জন্য যুদ্ধ করছে। কেমন করে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নীতি বিবর্জিত দলদের সমর্থন করতে পারা যায়! মওলানা ভাসানী সাহেব তার উত্তর দিয়েছেন এই কথা বলে, মিশরের নাসের যদি সমাজতন্ত্র করতে পারে, তবে ইস্কান্দার মির্জাকেও একবার পরীক্ষা করে দেখলে অন্যায় কি? এরপরেই জানা গেল মওলানা সাহেব ইস্কান্দার মির্জার সাথে গোপন সন্ধিতে যোগ দিয়েছেন, 'সোহরাওয়ার্দী নিধন' যজ্ঞে। তাঁর নীতি আমার জানা আছে। জেলে বসে আইয়ুব সাহেবের কাছে কি কি চিঠি দিয়েছেন তাও আমার জানা আছে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর দিন ফুরাইয়া এসেছে। একটু দেরি করুন দেখতে পাবেন, আপনার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা, আইয়ুব খান সাহেবের রূপ।

বৃদ্ধকালে সরকারি ব্যয়ে একটু বিদেশে ঘুরবার সুযোগ পেয়েছেন। দুনিয়া দেখতে কেহ আপত্তি করে না। জনগণের সাথে আর ছল চাতুরি না করাই শ্রেয়। আওয়ামী লীগ কর্মীরা ও জনগণ যখন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও গণতন্ত্রের দাবির জন্য গুলি বুক পেতে নিতেছে, যখন কারাগার ভরে গিয়াছে তখন তাঁহার দলেরই দুই একজন নেতা এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীর হাত দেখতে পেয়েছেন। এই অত্যাচারের প্রতিবাদও করেন নাই। জনগণ এদের চিনে ফেলেছে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

আওয়ামী লীগের ডাকে জনগণ জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করছে খবর পেলাম, আর সরকারও অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাইয়া যেতেছে। দেখা যাক কি হয়।

বিকালটা ভালই ছিল। বৃষ্টি হয় নাই। হাসপাতালে আহত কর্মীরা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণগঞ্জের খাজা মহিউদ্দিন ও অন্যান্য কর্মীরা এবং সাহাবুদ্দিন চৌধুরী সাহেবও হাসপাতালে আছেন। তিনিও নেমে এসেছেন দরজার কাছে। আমি একটু এগিয়ে যেয়ে ওদের বললাম, 'চিন্তা করিও না। কোনো ত্যাগই বৃথা যায় না। দেখ না আমাকে একলা রেখেছে।' সিপাই সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেছে, কারণ কথা বলা নিষেধ, চাকরি যাবে। আমি এদের ক্ষতি করতে চাই না, তাই চলে এলাম আমার জায়গায়। শুধু ওদের দূর থেকে আমার অন্তরের স্নেহ ও ভালবাসা জানালাম। জানি না আমার কথা ওরা শুনেছিল কিনা, কারণ দূর তো আর কম না!

সূর্য বিদায় নিয়েছে, জেলখানায় একটু পূর্বেই বিদায় নেয়। কারণ ১৪ ফিট দেয়াল দাঁড়াইয়া আছে আমাদের চোখের সম্মুখে।

২৬ সেলের সিকিউরিটি বন্ধুরা আমাকে একটা রজনীগন্ধার তোড়া উপহার পাঠাইয়াছে। আমার পড়ার টেবিলের উপর গ্লাসে পানি দিয়ে রাখলাম। সমস্ত ঘরটি রজনীগন্ধার সুমধুর গন্ধে ভরে গিয়েছে। বড় মধুর লাগলো। বিশেষ করে ঐ ত্যাগী বন্ধুদের—যারা জীবনের ২৫ থেকে ৩০ বৎসর নীতি ও দেশের জন্য জেল খেটেছেন, আজও খাটছেন। তাঁদের এই উপহার আমার কাছে অনেক মূল্যবান। শুধু মনে মনে বললাম, 'তোমাদের মতো ত্যাগ যেন আমি করতে পারি। তোমরা যে নীতিই মান না কেন, তাতে আমার কিছু আসে যায়

না। তোমরা দেশের মঙ্গল চাও, তাতে আমার সন্দেহ নাই। তোমরা জনগণের মুক্তি চাও এ কথাও সত্য। তোমাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তোমাদের এই উপহার আমার কাছে অনেক মূল্যবান।'

রাত কেটে গেল। এমনি অনেক রাত কেটে গেছে আমার। প্রায় ছয় বৎসর জেলে কাটিয়েছি। বোধ হয় দুই হাজার রাতের কম হবে না, বেশি হতে পারে। আরও কত রাত কাটবে কে জানে? বোধ হয় আমাদের জীবনের সামনের রাতগুলি সরকার ও আইবি ডিপার্টমেন্টের হাতে।

১৯শে জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

ঘরটা তো আমাদের এক মাত্র জায়গা–যা একটু বাহিরে হাঁটাহাঁটি করতাম তাও বন্ধ। বৃষ্টি চলছে সমানে। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বারান্দাটা ভিজে গিয়েছে। পায়খানায় যাওয়ার উপায় নাই। পানি পড়ে সমস্ত শরীরটা ভিজে যাবে। ছাতাও নাই। চা প্রস্তুত হয়ে গেছে, খেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরই ঘুরতে আরম্ভ করলাম। প্রায় ৯টায় বৃষ্টি থামলে আমি বের হয়ে পড়লাম। দেখলাম বরিশালের বাবু চিত্তরঞ্জন সুতারও দাঁড়াইয়া আছেন তাঁর সেলের দরজার কাছে। বুঝলাম তাঁর অবস্থাও আমার মতো। আমার ঘরের একটা সামান্য বারান্দা আছে। কিন্তু তাঁর সেলে তাও নাই। বৃষ্টি থেমেছে, তাই বের হয়ে পড়েছে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে। তাহাকেও আলাদা করে রাখার হুকুম দিয়েছে। বরিশাল জেলে ছিলেন। মাসে অন্ততপক্ষে স্ত্রী ও ছেলের সাথে দেখা হতো। তা আর হবে না। কষ্ট দেও, যত পার। আমাদের আপত্তি নাই। আমরা নীরবে সবই সহ্য করব ভবিষ্যৎ বংশধরদের আজাদীর জন্য। আমাদের যৌবনের উন্মাদনার দিনগুলি তো কারাগারেই কাটিয়ে দিলাম। আধা বয়স পার হয়ে গেছে।

আর চিন্তা কি? এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিচার একদিন হবেই। দেখেও যেতে পারি, আর না দেখেও যেতে পারি। তবে বিশ্বাস আছে, হবেই।

আবার বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি পাকের ঘরে উপস্থিত হলাম। 'দেখি কি পাক করছে?' বাবুর্চি বলল, 'পটল ভাজি করছি, পেঁপেও পাক করব। মাছ এখনও আসে নাই।' কিছু সময় দাঁড়াতে হলো। দেখলাম কিভাবে পাক করবে। পানি পড়ে ঘর দিয়ে। আধা ঘর ভিজে গিয়েছে। একটু পরে আমি জমাদার সাহেবকে বললাম খবর দিতে। এভাবে চলতে পারে না।

কম্পাউন্ডার সাহেব এলেন আমার এখানে ইনজেকশন দিতে। বললাম 'বসেন, কেমন আছেন?' বলল, 'কেমন থাকব। স্বল্প বেতনের কর্মচারী, জীবনটা কোনোমতে কাটাইয়া নিয়ে যাচ্ছি।' তার কাজ শেষ করে তিনি চলে গেলেন।

আমি বই নিয়ে বসে পড়লাম। মনে করবেন না বই নিয়ে বসলেই লেখাপড়া করি। মাঝে মাঝে বইয়ের দিকে চেয়ে থাকি সত্য, মনে হবে কত মনোযোগ সহকারে পড়ছি। বোধ হয় সেই মুহূর্তে আমার মন কোথাও কোনো অজানা অচেনা দেশে চলে গিয়েছে। নতুবা কোনো আপনজনের কথা মনে পড়েছে। নতুবা যার সাথে মনের মিল আছে, একজন আর একজনকে পছন্দ করি, তবুও দূরে থাকতে হয়, তার কথাও চিন্তা করে চলেছি। হয়ত বা দেশের অবস্থা, রাজনীতির অবস্থা, সহকর্মীদের উপর নির্যাতনের কাহিনী নিয়ে ভাবতে ভাবতে চক্ষু দু'টি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসছে। বই রেখে আবার পাইপ ধরালাম।

সাড়ে এগারটায় জেলের কয়েদিদের খাবার সময় হয়ে যায়। এরা গোসল করে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বালতিতে ডাল, টিনের বড় এক পাত্রে ভাত আর একটি বালতিতে তরকারি। কয়েদিরা দফায় দফায় এসে বিলাইয়া যায়। ভাত নিয়ে যে যেখানে পারে বসে খেয়ে নেয়। মেশিনের মতো চলে। আমার কিন্তু একটার পূর্বে খাওয়া অসম্ভব। তাই সাড়ে বারটা বা ১টায় গোসল করতে যাই। আজ বহুক্ষণ ভাবলাম গোসল করব কিনা। মেট বলল, না করলে শরীর খারাপ হবে। বসে পড়তে পড়তে পিঠে একটা ব্যথা হয়েছে। খুব তেল মালিশ করে গোসল করে এলাম। খাবার পরেই কাগজ এসে হাজির।

ব্যাপার কি! ভুট্টো সাহেব নাই! বিতাড়িত। ছুটি চেয়েছেন, পেয়েছেনও। সসম্মানে তাড়াইয়া দেওয়ার একটা ফন্দি। আমেরিকার ধাক্কা আইয়ুব সাহেব সামলাইবেন কেমন করে! শোয়েব সাহেবের দৌলতে তিনি যে অর্থনীতি কায়েম করতে চলেছেন তাহাতে আমেরিকা ছাড়া আর কে সাহায্য করতে পারে! আমেরিকা যেখানে সাহায্য দিতে চায় সেখানে অধীনস্ত না করে অর্থ সাহায্য দেয় না। পণ্ডিত জওহরলালের মতো ত্যাগী, কর্মঠ, শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রীও কৃষ্ণ মেননের মতো বৈদেশিক মন্ত্রীকে আমেরিকার চাপে সরায়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর আমাদের আইয়ুব সাহেব যাদের বদৌলতে

ক্ষমতায় বসেছেন, যাদের দৌলতে ক্ষমতায় টিকে আছেন, কেমন করে সেই মুরব্বীদের বেজার করবেন? ভাই ভুট্টো আমার কথাগুলি মনে করে দেখবেন নিশ্চয়ই। যখন হঠাৎ আমার সাথে মোলাকাত হয়ে গিয়াছিল তখন তাকে বলেছিলাম, বেশি দিন আর বাকি নাই, আপনারও দিন ফুরাইয়া এসেছে। ডিকটেটরের ধর্ম নাই। সে শুধু নিজকে চেনে এবং নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে কাহাকেও ছাড়ে না। আমেরিকানরা যে আইয়ুব সাহেবকে ছাড়তে পারে না তাহাও আমার বুঝতে বাকি নাই। এমন নেতা আমেরিকা চায় যারা জনগণের সাথে সম্বন্ধ রাখে না। আইয়ুব সাহেব বিবৃতি দিয়েছেন, 'বৈদেশিক নীতি পূর্বের মতো চলবে। এর কোনো পরিবর্তন হবে না'। আমরা জানি যে, কোনোদিন পরিবর্তন করতে পারবেন না।

শনিবার রাতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের সভায় দৈনিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস ও সাপ্তাহিক পূর্বাণীর মুদ্রণালয়, নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণ, সংবাদপত্রের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা, দেশরক্ষা আইনে জনাব তফাজ্জল হোসেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেনসহ অন্যান্য সাংবাদিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আগামী সোমবার একদিন প্রতীক ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণের উপর স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামানের ও গণপরিষদ সদস্যের অধিকার সংক্রান্ত মুলতবি প্রস্তাব এবং বিরোধীদলের নেতা আবদুল মালেক উকিলের আনীত মুলতবি প্রস্তাব স্পিকার সাহেব কর্তৃক অগ্রাহ্য করার প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

বিরোধী দলের ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। কারণ জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হইতেছে ১৭, ১৮, ১৯ তারিখে। পূর্ব বাংলার প্রায় সমস্ত জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করতে দেওয়া হবে না। নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর গুলি করে, প্রেস বন্ধ করে দিয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়ে কিছু দিনের জন্য আন্দোলন বন্ধ রাখা যায়, বেশি দিন না।

বিকাল বেলা বৃষ্টি একটু কম হলেও মাঝে মাঝে চলছে। মাজায় ব্যথা বেশি, হাঁটতেও পারলাম না। রাত কেটে গেল। রাতে ভীষণভাবে বৃষ্টি হলো। ঘুম ঠিকই হয়েছে, তবে মাঝে দু'বার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার ফুলের বাগানের এক অংশের কিছু মাটি ধ্বসে পড়েছে। ভিতরে অনেকদূর দেখা যায়। কি ব্যাপার এখানে কি আছে? কেউ বলে ভিতরে কিছু নিশ্চয়ই হবে। কোনোদিন এই ঘটনা ঘটে নাই। মাটি ধ্বসে নিচের দিকে গিয়াছে। আমি দেখলাম জমাদার ছুটে এসেছে। চীফ হেডওয়ার্ডারকে খবর দেওয়া হয়েছে। কি করা যায়? আমি আমার মেট, পাহারা মেম্বরকে বললাম, পুরনো আমলের একটি পানির কুয়া ছিল বলে মনে হয়। জায়গাটি গোলাকার, চারদিকে ইট দিয়ে বাঁধা। অনেকেই বলল, 'তাই হবে'। এরপর শুনলাম জেলার সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। জেলার সাহেব দেখতে আসবেন। তখন আমি হাসতে হাসতে বললাম, মনে হয় ভিতরে কিছু আছে। জেলখানার এই জায়গাটি শায়েস্তা খানের আমলে লালবাগ ফোর্টের অংশ ছিল। এখানে নবাবদের ঘোড়াশালা, হাতিশালাও ছিল। আমি যে ঘরটিতে থাকি সেটা ঘোড়া থাকার মতোই ঘর। দেখলে বোঝা যাবে এখানে ঘোড়াই রাখা হতো।

ইংরেজরা এই অংশটাকে কয়েদখানায় পরিণত করেছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, এই গর্তের মধ্যে টাকা পয়সা সোনা রুপা পাওয়া যেতে পারে। অনেকেই গম্ভীর হয়ে শুনল। অনেকে বিশ্বাস করতেও আরম্ভ করল। জেলার সাহেব জেলের ডিআইজি সাহেবকেও খবর দিলেন। এটা বন্ধ করা চলবে না, যে পর্যন্ত এটিকে ভাল করে না দেখা হবে।

চিত্ত বাবুর সাথে সামান্য আলাপ করলাম দূর থেকে। যদিও খুব কাছে থাকেন, তবে তাঁর সেল ছেড়ে বাইরে আসার হুকুম নাই। তাঁকে বরিশাল থেকে নিয়ে এসেছে। কি জন্য এনেছে তিনি বলতে পারেন না। তাঁকেও আলাদা করে রাখার হুকুম। তবে তাঁর সাথে একজনকে রাখা হয়েছে।

আজও খুব বৃষ্টি হলো। বৃষ্টি হলেই কেমন যেন হয়ে যায় মনটা। লাইব্রেরিতে বই আনতে পাঠালাম। আজ আর বই পাওয়া যাবে না। আমার নিজের কিছু বই আছে, কয়েকদিন চালাতে পারব।

ভয়াবহ বন্যায় পূর্ব বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর এ রকম হলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এখনই দেশের অবস্থা খারাপ। তারপর আছে ট্যাক্স বা কর। আবার বন্যায় ফসল নষ্ট। এই দেশের হতভাগা লোকগুলি

খোদাকে দোষ দিয়ে চুপ করে থাকে। ফসল নষ্ট হয়েছে, বলে আল্লা দেয় নাই, না খেয়ে আছে, বলে কিসমতে নাই। ছেলেমেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়, বলে সময় হয়ে গেছে বাঁচবে কেমন করে! আল্লা মানুষকে এতো দিয়েও বদনাম নিয়ে চলেছে। বন্যা তো বন্ধ করা যায়, দুনিয়ায় বহু দেশে করেছে। চীন দেশে বৎসরে বৎসরে বন্যায় লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হতো। সে বন্যা তারা বন্ধ করে দিয়েছে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে ক্রুগ মিশনের মহা পরিকল্পনা কার্যকর করলে, বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি বন্যা হলেও, ফসল নষ্ট করতে পারবে না। এ কথা কি করে এদের বোঝাব! ডাক্তারের অভাবে, ওষুধের অভাবে, মানুষ অকালে মরে যায়–তবুও বলবে সময় হয়ে গেছে। আল্লা তো অল্প বয়সে মরবার জন্য জন্ম দেয় নাই। শোষক শ্রেণী এদের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়ে এদের পথের ভিখারি করে, না খাওয়াইয়া মারিতেছে। না খেতে খেতে শুকায়ে মরছে, শেষ পর্যন্ত না খাওয়ার ফলে বা অখাদ্য খাওয়ার ফলে কোনো একটি ব্যারাম হয়ে মরছে, বলে কিনা আল্লা ডাক দিয়েছে আর রাখবে কে?

কই গ্রেট বৃটেনে তো কেউ না খেয়ে মরতে পারে না। রাশিয়ায় তো বেকার নাই, সেখানে তো কেহ না খেয়ে থাকে না, বা জার্মানি, আমেরিকা, জাপান এই সকল দেশে তো কেহ শোনে নাই–কলেরা হয়ে কেহ মারা গেছে? কলেরা তো এসব দেশে হয় না। আমার দেশে কলেরায় এত লোক মারা যায় কেন? ওসব দেশে তো মুসলমান নাই বললেই চলে। সেখানে আল্লার নাম লইবার লোক নাই একজনও; সেখানে আল্লার গজব পড়ে না। কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বরও হয় না। আর আমরা রোজ আল্লার পথে আজান দিই, নামাজ পড়ি, আমাদের ওপর গজব আসে কেন? একটা লোক না খেয়ে থাকলে ঐ সকল দেশের সরকারকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। আর আমার দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দিনের পর দিন না খেয়ে পড়ে আছে, সরকারের কোনো কর্তব্য আছে বলে মনেই করে না।

তাই আমাদের দেশের সরকার বন্যা এলেই বলে 'আল্লার গজব'। কিছু টাকা দান করে। কিছু খয়রাতি সাহায্য ও ঋণ দিয়ে খবরের কাগজে ছেপে ধন্য হয়ে যায়। মানুষ এভাবে কতকাল চলতে পারবে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। বড় লোকদের রক্ষা করার জন্যই যেন আইন, বড়লোকদের আরও বড় করার জন্যই মনে হয় সিপাহি বাহিনী। এই দেশের গরিবের ট্যাক্সের টাকা দিয়েই

আজ বড় বড় প্রাসাদ হচ্ছে, আর তারা দু'বেলা ভাত পায় না। লেখাপড়া, চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা ছেড়েই দিলাম। বন্যায় শত শত কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়ে যাইতেছে প্রত্যেক বৎসর। সেদিকে কারও কোনো কর্তব্য আছে বলে মনে হয় না।

পাকিস্তানে রাজধানী একটা আছে করাচীতে, আরও দুইটা রাজধানী তৈয়ার করিতেছে। একটা রাওয়ালপিন্ডি, আধা রাজধানী, আর একটা রাওয়ালপিন্ডি থেকে ১২ মাইল দূরে ইসলামাবাদে। খরচ হবে ৫০০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলায় একটা তথাকথিত উপ রাজধানী শহরের সেরা জায়গা নিয়ে করছে।

একে রাজধানী না, পূর্ব বাংলাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'প্রোপাগান্ডা রাজধানী' করা হতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী পূর্বেই রাজধানী ছিল, তারপর মধ্যবর্তী রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি। তারপর ইসলামাবাদ। আর পূর্ব বাংলার বন্যা বন্ধ করার জন্য টাকার অভাব! এ দুঃখের কথা কাকে জানাব!

বাংলাদেশ শুধু কিছু বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই সারাজীবন দুঃখ ভোগ করল। আমরা সাধারণত মীর জাফর আলি খাঁর কথাই বলে থাকি। কিন্তু এর পূর্বেও ১৫৭৬ সালে বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল দাউদ কারানী। দাউদ কারানীর উজির শ্রীহরি বিক্রম-আদিত্য এবং সেনাপতি কাদলু লোহানী বেঈমানি করে মোগলদের দলে যোগদান করে। রাজমাবাদের যুদ্ধে দাউদ কারানীকে পরাজিত, বন্দি ও হত্যা করে বাংলাদেশ মোগলদের হাতে তুলে দেয়। এরপরও বহু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই বাঙালি জাত। একে অন্যের সাথে গোলমাল করে বিদেশি প্রভুকে ডেকে এনেছে লোভের বশবর্তী হয়ে। মীরজাফর আনলো ইংরেজকে, সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করল বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বাঙালিরাই প্রথম জীবন দিয়ে সংগ্রাম শুরু করে; সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় ব্যারাকপুর থেকে। আবার বাংলাদেশে লোকের অভাব হয় না ইংরেজকে সাহায্য করবার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এই মাটির ছেলেদের ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি দিয়েছে এদেশের লোকেরাই—সামান্য টাকা বা প্রমোশনের জন্য।

পাকিস্তান হওয়ার পরেও দালালি করার লোকের অভাব হলো না—যারা সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে দিয়ে দিচ্ছে সামান্য লোভে। বাংলার স্বার্থ রক্ষার

জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের বুকে গুলি করতে বা কারাগারে বন্দি করতে এই দেশে সেই বিশ্বাসঘাতকদের অভাব হয় নাই। এই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ এত উর্বর; এখানে যেমন সোনার ফসল হয়, আবার পরগাছা আর আগাছাও বেশি জন্মে। জানি না বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে এই সোনার দেশকে বাঁচানো যাবে কিনা!

ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ, মনের খোরাক তো পাওয়া যাবে না। তবুও কাগজগুলি বসে বসে দেখি। ইত্তেফাক বন্ধ করল কে?

বিকালে সিনিয়ার ডিপুটি জেলার সাহেব আসলেন সেই গর্ত দেখতে। বললাম, দেখুন তো কিছু পাওয়া যায় কিনা এর ভিতরে। ভদ্রলোক হিন্দু। ভয়েতে আমার সাথে বেশি কথা বলেন না। হ্যাঁ-না, বলেই কেটে পড়তে পারলে বাঁচেন। চলে গেলে শুনলাম এটা এইভাবেই থাকবে, আগামীকাল ডিআইজি সাহেব দেখে যাহা বলবেন তাহাই করা হবে।

খেতেই আমার ইচ্ছা হয় না যেন কেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে এই অবস্থা হয়েছে। খেতে ইচ্ছাও বেশি হয় না। মেট ও বাবুর্চি বলে, তবে পাকাই কেন, যদি কিছু না-ই খাবেন? বললাম, তোমরা খাও। যা খাই তাতেই আমার চলবে। রাত্র শুরু হয় আমাদের সন্ধ্যা থেকে, কারণ সন্ধ্যার পরেই জেলখানার সব দরজা বন্ধ। সমস্ত কয়েদিদের বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় সূর্যাস্ত হওয়ার সাথে সাথেই। এত বড় রাত কাটানো খুব কষ্টকর। আজ আর ঘুমাতে পারলাম না। মেহেরবানি করে একটা পাগল ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার শুরু করেছে। দিনের বেলা হলে একটা বন্দোবস্ত হতো, পাগলা সেলের অন্যপাশেও সেল আছে। কিন্তু রাতে কোনো উপায় নাই। তাই আল্লা আল্লা করে রাতটা কাটাতে হলো।

২১শে জুন ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

আকাশটা আজ মেঘে ভরে রয়েছে। বৃষ্টি নাই। শুনলাম জেলের ডিআইজি সাহেব এদিকে আসবেন, যদিও আজ এখানে আসার কোনো কথা নাই। তিনি আসবেন ঐ গর্তটা দেখতে। বৃষ্টি পেয়ে দূর্বা ঘাসগুলি বেড়ে উঠেছে লিকলিক করে, সমস্ত মাঠটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। বাজে গাছ আমি তুলে ফেলে দিই। একটু ভাল লাগলেই ওর ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়াই আর যে পরগাছা চোখে পড়ে তাকেই ধ্বংস করি।

শুনলাম মানিক ভাইকেও আলাদা রাখবার হুকুম হয়েছে। কিন্তু রাখবে কোথায়? সেল এরিয়ায় আমাকে একলা রাখা হয়েছে। ২৬ সেলে সিকিউরিটি, পুরানা হাজত এবং ১/২ খাতায় ডিপিআর বন্দিরা। আই বি তো হুকুম দিয়েই চলেছে সকল আওয়ামী লীগারদের আলাদা আলাদা রাখতে হবে। তাদের কষ্ট দিতে হবে। তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

মানিক ভাই ও মোস্তফা সরওয়ারকে 'এ' ক্লাস দেওয়া হয়েছে। মোমিন সাহেব, হাফেজ মুছা ও শাহাবুদ্দিন চৌধুরীকে 'বি' ক্লাস দেওয়া হয়েছে। শামসুল হক সাহেব, রাশেদ মোশাররফ ও ওবায়দুর রহমানকে এখনও সি ডিভিশনে রাখা হয়েছে, কারণ এরা নাকি ইনকাম ট্যাক্স দেয় না। ১৫০০ শত টাকার উপরে আয় হলে 'বি' ক্লাস দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এমএ পাশ করলেও 'সি' ক্লাস হতে হবে। টাকা থাকলেই বড় ক্লাস, শিক্ষার দাম নাই। পদের দাম নাই, সম্মানের দাম নাই। এমনকি পদমর্যাদারও দাম নাই।

আমি জেল কর্তৃপক্ষকে বললাম, যদি কোনো প্রফেসার, ডিসি, এসপি কোনোমতে ডিপিআর–এ গ্রেপ্তার হতে বাধ্য হয় তারও সি ক্লাস হবে এবং রোজ দেড় টাকায় খাওয়া ও নাস্তার সকল কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে। রাস্তার কত পাগলকে ডিপিআর করেছে। শামসুল হক সাহেবের বাবার সম্পত্তি আছে, নিজে কাজকর্ম করেন না। জেলা, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ও এমপিএ ছিলেন, তাঁকেও যদি ক্লাস না দেওয়া হয় আর দেড় টাকার খাওয়াই যদি খেতে হয় তার বিচার তো এখন হতে পারে না, পরে দেখা যাবে। ওবায়দুর রহমান এমএ পাশ। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন, এখন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। তাকেও সি ক্লাস। রাশেদ মোশাররফের বাবা বড়লোক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক, বিরাট বাড়ি ঢাকা শহরে, নিজেও ছোটখাট ব্যবসা করে, তাকেও সি ক্লাস। কাকে দুঃখের কথা বলব? যে কোনো রাস্তার লোক টাকা উপার্জন করেছে দুর্নীতি করে, ইনকাম ট্যাক্স দেয় তাকে দিতে হবে ক্লাস 'এ'। আমি তো ওদের সাথে দেখা করতে পারব না আর সান্ত্বনাও দিতে পারব না। এইবার সরকার আমাদের জবর খেলা দেখাচ্ছে। ইতরামির চরমে পৌঁছেছে।

এভাবে অত্যাচার চলতে থাকলে বাধ্য হব বোধ হয় এর প্রতিবাদ করতে। আমি বার বার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ করেছি। বার বার বলতে

আমার লজ্জাও করে। জেল কর্তৃপক্ষ এক কথাই বলেন, 'আমাদের কোনো হাত নাই। আমরা হুকুম তামিল করি।' আমার মনে হয় আমাদের যে কষ্ট হতেছে তাতে তারা লজ্জিত হয়। কিন্তু কি করবে? ছোটলোক যেখানে শাসন চালায় তখন আর ভদ্রতা আশা করা কষ্টকর! আমি জানি উপরের কড়া হুকুম, আমার কাছে কেউই থাকতে পারবে না। কারও সাথে আলাপ করতে পারব না। একাকী রাখতে হবে। মনে মনে ভাবি আমি কষ্ট না পেলে আমাকে কষ্ট দেয় কে? যতই কষ্টের ভিতর আমাকে রাখুক না কেন, দুঃখ আমি পাব না। কারণ, 'কোনো ব্যথাই আমাকে দুঃখ দিতে পারে না এবং কোনো আঘাতই আমাকে ব্যথা দিতে পারে না।' এরা মনে করেছে বন্ধু শামসুল হককে জেলে দিয়ে যেমন পাগল করে ফেলেছিল, আজ আর তার কোনো খোঁজ নাই, কোথায় না খেয়ে বোধ হয় মরে গিয়েছে। আমাকেও একলা একলা জেলে রেখে পাগল করে দিতে পারবে। আমাকে যারা পাগল করতে চায় তাদের নিজেদেরই পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

কিছু কিছু সরকারি কর্মচারী যারা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছে তারা এর পিছনে আছে। আমি তাদের জানি, যদি বেঁচে থাকি তবে এর বিচার একদিন হবে, আর যদি মরে যাই তবে সহকর্মীদের বলে যাবো তাদের নাম। কঠোর সাজা যেন দেওয়া হয়। জীবনে যেন না ভোলে। সাবধান করে দিয়ে যাবো— ক্ষমতায় গেলে এরাই সবার পূর্বে এসে আনুগত্য জানাবে এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে।

খবরের কাগজ আজ আর এল না। সাংবাদিকরা প্রতিবাদ দিবস পালন করছে নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে এবং মানিক ভাই ও সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। কোনো কাগজই আসে নাই।

দিনটা মেঘলা, সূর্যের মুখ দেখলাম না। তবে বৃষ্টি হয় নাই। সন্ধ্যার পরে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়। আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত দু'টায় এক পাগল আজও ক্ষেপে গিয়েছিল। তবে ঘুম বেশি নষ্ট করতে পারে নাই।

২২শে জুন ১৯৬৬ ॥ বুধবার

ভোর থেকে ভীষণভাবে বৃষ্টি নেমেছে। থামবার নামও নিতেছে না। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে যেয়ে দেখি ডিম দিয়েছে একটা। যতগুলি ডিম আমাকে এ

পর্যন্ত দিয়েছে সবই নষ্ট। যাদের ডিমের কনট্রাক্ট দেওয়া হয় তারা বাজার থেকে পচা ডিম কিনে আনে। বাধা দেবে কে? মুখতো বন্ধ। কন্ট্রাক্টর সাহেব নিশ্চয়ই জানে কেমন করে মুখ বন্ধ করতে হয়! দোষ কাকে দিব? সমস্ত দেশটায় যাহা চলছে এখানেও সেই একই অবস্থা। দেখার লোকের অভাব। কেহ ভাল হতে চেষ্টা করলে তার সমূহ বিপদ।

একটা ঘটনা আমার জানা আছে। এক থানায় একজন কর্মচারী খুব সৎ ছিলেন। ঘুষ তিনি খেতেন না। কেহ ঘুষ নিক তিনি তাহাও চাইতেন না, সকলে তাকে বোকা বলতে শুরু করে–ছোট থেকে বড় পর্যন্ত। একদিন তার এক সহকর্মী তাকে বলেছিল, সাধু হলে চাকরি থাকবে না। বড় সাহেবের কোটা তাকে না দিলে খতম করে দিবে। তিনি তাহা শুনলেন না। বললেন, ঘুষ আমি খাব না, আর ঘুষ দিবও না। সত্যই ভদ্রলোক ঘুষ খেতেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই মিথ্যা মামলায় তাকে চাকরি হারিয়ে কোর্টে আসামি হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোর্ট থেকে তিনি মুক্তি পান, চাকরি আর করেন নাই। সকল জায়গায়ই একই অবস্থা আজকাল, এখন অনেক বেশি। কাহাকেও ভয় করে না। সোজাসুজিই এসব চলছে।

কারাগারের অবস্থা বাইরে যারা আছেন বুঝবেন না। অনেক কর্মচারী আছে যারা এক পয়সাও ঘুষ খায় না। এমন কি জেলের কোনো জিনিসও গ্রহণ করেন না। আমি অনেককে জানি। তাদের চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নাই। যাক, আমার জিনিসপত্র মন্দ নাই, আমার ব্যাপারে সকলেরই সহানুভূতি আছে। আমাকে ভাল জিনিস দিতে পারলে এরা খুশিই হয়। ডিম এই সময় একটু বেশিই নষ্ট হয়। চেষ্টা নিশ্চয়ই তারা করেন, ভাল ডিম পায় না কি করবে? আমি যাহা চাই তাহাই তারা দিতে চেষ্টা করে। যদিও আমি খাওয়ার দিকে বেশি খেয়াল দিই না। কোনোদিন নিজ হাতে লিখেও দেই না। যাহা দরকার ৫ টাকার মধ্যে দিয়ে দেবেন, যদি না হয় খবর দেবেন–বাজার থেকে নিজেই টাকা দিয়ে কিনে আনবো, না হয় বেগম সাহেবা দেখা করতে এলে বলে দিব। কয়েদি থেকে কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই আমার দিকে খেয়াল রাখে, যাতে কোনো কষ্ট না হয়। ডাক্তার সাহেবরাও নিজের ইচ্ছায় কিছু কিছু জিনিস আমাকে দিয়ে থাকে, বলার প্রয়োজন হয় না। আমি যাহা পাই নিজে খেয়েও আমার চারজন মেট, বাবুর্চি, ছাফাইয়া, ফালতুরা খেয়েও কিছু কিছু

অন্য কয়েদিদের দেওয়া হয়—যারা আমার সেলের সামনে কাজকর্ম করে, পানি দেয়, বাগান পরিষ্কার করে। সকলকে একদিনে দেওয়া যায় না। তাই এক এক দিন এক এক জনকে দেওয়া হয়। বাবুর্চিকে বলে দিয়েছি কিছু কিছু বাঁচাইয়া একদিন একটু বেশি পাক করে কয়েকজনকে দিও। যাহা হউক যারাই আমার আশে পাশে আছে সকলকেই একদিন না একদিন কিছু দিতে পেরেছি এবং দিতেও থাকব। তবে মেট, ফালতু, বাবুর্চি আর ছাফাইয়া প্রত্যেক বেলায় ভাগ পায়। এদের রেখে আমি খাই কি করে! আমার পক্ষে সম্ভব নহে। চা একটু বেশি খরচ হয়। আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে কিনে আনি। জেলের নিয়ম, আমার কাছে থাকবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার ঘর পরিষ্কার করবে, কাপড় ধুইয়ে দিবে কিন্তু আমার সাথে খাইতে পারবে না। তাদের খাওয়া বাইরের থেকে আসবে। মানে সরকারি চৌকি থেকে। যাহা পায় তাহা তো পাবেই। আমি ওদের না দিয়ে খাই কেমন করে? আমি না খেয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু ওদের না দিয়ে খেতে পারব না।

আজ নাস্তা খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কারণ বৃষ্টি হতেছে ভীষণভাবে। মনে হয় আকাশ ফেটে গিয়েছে। ঘুমাতে পারলাম না। পুরানা কাগজগুলি পড়তে লাগলাম—যা সামান্য বাকি ছিল। তারপর আবার চা। আবার বই নিয়ে বসা। বৃষ্টি হলে একাকী খুবই খারাপ লাগে। সময় যেতেই চায় না। ১২টায় সিকিউরিটি জমাদার সাহেব এলেন, কিছু বাজার করতে হবে, বিস্কুট চাই, মুড়ি চাই, আমার বাড়িতে মুড়ি খাবার অভ্যাস। বাড়িতে খবর দিলে পাঠাইয়া দিতো। কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না বেচারীকে। সকল কিছুই তো তার করতে হয়, আমি তো মুসাফির। বাড়িতে আমি বেগম সাহেবার মুসাফির। এখানে সরকারের মুসাফির।

আমি বাইরে যেয়ে হাঁটতে লাগলাম, কারণ বৃষ্টি থেমে গেছে। এই সুযোগ ভাল করে ব্যবহার করলাম। একমাত্র পরিশ্রম।

গোসল করে এসে ভাত খেয়ে আবার বই নিয়ে বসলাম। জেল লাইব্রেরি থেকে কয়েকখানা বই দিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কাগজ এল। দেখলাম হাইকোর্টে মামলা করেছে নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে ও মানিক ভাইকে বন্দি করার বিরুদ্ধে।

২৩শে জুন ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

মিজানুর রহমান চৌধুরী এম. এন. এ-কে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক ছিল। মনে হতেছে কাহাকেও বাইরে রাখবে না। এখন সমস্ত পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান তো একটা বড় 'কারাগার'। কথা বলার শক্তি নাই। জেলায় জেলায় ১৪৪ ধারা। ইত্তেফাক প্রেস বাজেয়াপ্ত। তফাজ্জল হোসেন (মানিক ভাই)কে গ্রেপ্তার করে আলাদা রাখার ব্যবস্থা। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে কর্মীদের বিরুদ্ধে। মিজানকে এনেও দশ সেলে রাখা হয়েছে। ডিভিশন আসতে কমপক্ষে ১৫ দিন সময় লাগে, এই কয়দিন যে খাওয়া দেয় তা নাই বললাম। অপেক্ষা করে আছি কতজনকে আনবে জেলে। তবু দাবি আদায় হবে, রক্ত যখন বাঙালি দিতে শিখেছে।

বন্যা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। চাউলের দাম ৪০ থেকে ৫০ টাকা মন হয়ে গেছে। জনগণের আর শান্তি নাই। শান্তি চেয়ে আনা যায় না, আদায় করে নিতে হয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। অত্যাচারী ভয় পেয়ে যাবে। যে অত্যাচার করে টিকে থাকতে চায় তার মেরুদণ্ড খুব দুর্বল। আঘাত করলেই ভেঙে যাবে।

আজকাল কাগজে আর রাজনৈতিক খবর পাওয়া যায় না—বোধ হয় তা বন্ধই করে দিয়েছে। জুলুম প্রতিরোধ দিবসের সংবাদ ছাপাইতে পারবে না। দাও না বন্ধ করে আওয়ামী লীগের অফিসের দরজা। কাহাকেও যখন বাইরে রাখবা না, তখন আর অফিসের দরকার কি?

দুপুরের দিকে সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করছে। রৌদ্র একটু উঠবে বলে মনে হয়। বৃষ্টি আর ভাল লাগছে না। একটা উপকার হয়েছে আমার দূর্বার বাগানটার। ছোট মাঠটা সবুজ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসগুলি বাতাসের তালে তালে নাচতে থাকে। চমৎকার লাগে, যেই আসে আমার বাগানের দিকে একবার না তাকিয়ে যেতে পারে না। বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ—যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে, এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়। আমি লেগেই থাকি। কুলাতে না পারলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনি। আজ বিকালে অনেকগুলি তুললাম।

আমার মোরগটা আর দুইটা বাচ্চা আনন্দে বাগানে ঘুরে বেড়ায় আর ঘাস থেকে পোকা খায়। ছোট কবুতরের বাচ্চাটা দিনভর মোরগটার কাছে কাছে থাকে। ছোট মুরগির বাচ্চারা ওকে মারে, কিন্তু মোরগটা কিছুই বলে না। কাক যদি ওকে আক্রমণ করতে চায় তবে মোরগ কাকদের ধাওয়া করে। রাতে ওরা একসাথেই পাকের ঘরে থাকে। এই গভীর বন্ধুত্ব ওদের সাথে। এক সাথে থাকতে থাকতে একটা মহব্বত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বেঈমানী করে। পশু কখনও বেঈমানী করে না। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় পশুরাও বোধ হয় মানুষের চেয়ে একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

চা বানাতে বললাম। আজ যাকে পাওয়া যায় তাকেই চা খাওয়াতে বললাম। সাধারণ কয়েদিরা একটু চায়ের জন্য কত ব্যস্ত। তাই আমি বলে দিয়েছি যে-ই চা খেতে চাইবে তাকেই দিবা। আমার মেটটা একটু কৃপণ, সহজে কিছু দিতে চায় না। যদি আমার কম পড়ে যায়, বাইরের থেকে আসতে দেরি হলে অসুবিধা হবে। তাকে বলে দিয়েছি, কম পড়ে পড়ুক, আনতে দেরি হয় হউক, চাইলে দিতে হবে। কিইবা আমি দিতে পারি, এই নিষ্ঠুর কারাগারে!

বিকালে আজ আবার নতুন করে কেডস্ সু পরে হাঁটতে শুরু করলাম। না হাঁটলে তো খাওয়াই হজম হবে না। ব্যায়াম আমার প্রয়োজন। তাই সময় পেলেই একটু ঘোরাঘুরি করি। পাশের ২০ সেলে পাবনার সাংবাদিক রণেশ মৈত্র থাকেন। ল' পরীক্ষা দিতে এসেছেন পাবনা থেকে এখানে, আজ শেষ পরীক্ষা হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন পরীক্ষা দিলেন?' বললেন, 'মন্দ হয় নাই'। আমার সামনে দিয়েই তাঁর যেতে হয়, যেখানে থাকেন সেইখানে। রণেশ বাবু যে কোনোদিন পাবনা চলে যাবেন। তবুও মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখা হতো ভদ্রলোকের সাথে। বাবু চিত্ত সুতার খবর দিলেন, রণেশ বাবু গেলেও তার একলা থাকতে আপত্তি নাই। কারণ দূর থেকে হলেও আমার সাথে দেখা হয়। জেল কর্তৃপক্ষকে বলতে বললেন। আমার কথা তারা শুনবে কেন? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

জমাদার সাহেব এসে হাজির হয়েছেন। বন্ধ করতে শুরু করেছেন, এমন সময় ডিপুটি জেলার সাহেব এলেন আমাকে দেখতে। তাকে নিয়ে দুইখানা চেয়ার নিয়ে ঘাসের উপর বসলাম। বোধহয় আজই ঘাসের উপর চেয়ার নিয়ে দুইজন বসলাম। একা আমি প্রায়ই বসে থাকি, একাই তো থাকি। তাকে বললাম, আমার অন্যান্য সহকর্মীদের খাওয়ার খুব কষ্ট হতেছে একটা কিছু

করেন। চোর ডাকাতের থেকেও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা খারাপ হয়ে গেছে? তাদের কষ্ট দিতেই হবে?

তিনি বললেন, আমাদের বলে আর লাভ কি! আমরা তো হুকুমের চাকর।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। খট করে তালাবন্ধ। আমিও বই আর খাতা নিয়ে বসলাম।

২৪শে জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

ভোরে ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। উঠতে ইচ্ছাই হয় না। মেট চা নিয়ে এসে হাজির। বিছানায় বসেই চা খেলাম। দেখলাম আকাশের অবস্থা ভাল। আমার ঘরের দরজার কাছে একটা কামিনী ও একটা শেফালী গাছ। কামিনী যখন ফুল দেয় আমার ঘরটা ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। একটু দূরেই দুইটা আম আর একটা লেবু গাছ। বৃষ্টি পেয়ে গাছের সবুজ পাতাগুলি যেন আরও সবুজ আরও সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ভাল লাগল দেখতে। মাঠটা সবুজ দূর্বায় ভরে উঠেছে। তারপর গাছগুলি, বড় ভাল লাগলো। বাইরেই যেয়ে বসলাম। দেখলাম এদের প্রাণ ভরে। মনে হলো যেন নতুন রূপ নিয়েছে। মোরগ মুরগির বাচ্চা ও কবুতরটা মাঠটা ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একজন এসে বলল, আপনার দলের সুলতান কে? তাকে আজ ভোরে নিয়ে এসেছে গ্রেপ্তার করে। ঢাকায় বাড়ি। বললাম, বুঝেছি। সুলতান আওয়ামী লীগ অফিসের 'Whole time worker', সকল সময়ের কর্মী। বড় নিঃস্বার্থ কর্মী। সমস্ত ঢাকা শহর তার নখদর্পণে। প্রত্যেকটা কর্মী ও তাদের বাড়ি ও চিনে। কাজ করতে কখনও আপত্তি করে না। দিন রাত সমানে কাজ করে যায়। হুকুম দিলেই তামিল করে। নিজস্ব একটা মতবাদও আছে।

সুলতানের ফুফুই সুলতানদের তিন ভাইকে মানুষ করেছে। এদের সাথে আমার বড় মধুর সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৫৪ সালে যখন আমি মন্ত্রী হলাম—শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভায়; কয়েকদিন পরেই মন্ত্রীত্ব ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯২-ক ধারা জারি করল। হক সাহেবকে বাড়িতে বন্দি করল, আমাকে মিন্টু রোডের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে আনল। আমার স্ত্রীও তখন নতুন ঢাকায় এসেছে। বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পূর্বে যদিও কলিকাতা গিয়াছে

কয়েকবার আমাকে দেখতে, কিন্তু ঢাকায় সে একেবারে নতুন; সকলকে ভাল করে জানেও না। মহাবিপদে পড়লো। সরকার হুকুম দিয়েছে ১৪ দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে। টাকা পয়সাও হাতে নাই বেশি। বাড়ি ভাড়া কোথায় পাওয়া যায়। তখন বন্ধু ইয়ার মহম্মদ খান, হাজী হেলালউদ্দিন সাহেবের মারফতে এই সুলতানের নাজিরা বাজারের বাড়ি ভাড়া করে দেয়। পাশের বাড়িতে সুলতানরা তিন ভাই আর ফুফু থাকতো। বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের এত আদর করতেন—যে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। পুলিশ তো প্রায়ই আমার বাড়িতে আসতো, কোনো আত্মগোপনকারী কর্মী আশ্রয় নিয়েছে কিনা জানতে। এক জাত কর্মচারী আছে সুযোগ সন্ধানী, 'যখন যেমন তখন তেমন'। এরা তেমনি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মহা বিপদেই পড়ে গেল আমার স্ত্রী। সেই হতে এই সুলতানদের সাথে আমার ফ্যামিলির ঘনিষ্ঠতা হয়ে রয়েছে। আমরা ও আমার ছেলেমেয়েরা এদের কোনো দিন ভুলি নাই। আর আমরা বুড়িকে নানী বলি। কোনো কিছু ভাল পাক হলে আমাদের না দিয়ে খায় না। সুলতানও আমার কাছে থাকে। পার্টির কাজ করে। আমার মনে হয় সুলতান গ্রেপ্তার হওয়াতে পার্টির খুবই ক্ষতি হয়েছে। সকল কর্মকর্তা, কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করছে দেখে মনে হয় অফিসের পিয়নটাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে! মোনায়েম খান সব পারেন। তিনি পারেন না এমন কোনো কাজ নাই দুনিয়াতে। আইয়ুব খান সাহেব ভাল লোকই পেয়েছেন, 'রতনে রতন চেনে'! তবে উপকার থেকে ক্ষতিই বেশি হবে। শীঘ্রই প্রমাণ পাবেন, কিছুটা পেয়েছেনও বটে!

সুলতানকে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের কাছে রাখে নাই। রেখেছে অন্যান্য ডিপিআরদের সাথে।

দুপুরে কাগজ এলে মর্নিং নিউজে দেখলাম করাচী আওয়ামী লীগ সভাপতি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, জেল থেকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মালিক গোলাম জিলানী, খাজা মহম্মদ রফিক, জনাব সিদ্দিকুল হাসান তাকে জানাইয়াছে যে, 'তারা শেখ মুজিবুরের ৬ দফা প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নাই।' আমি জানি সত্যের জয় একদিন হবেই। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরাও একদিন এই ৬ দফা সমর্থন করে পাকিস্তানকে মজবুত করবেন। সারা পাকিস্তানে আওয়ামী

লীগ নেতা কর্মীদের উপর জুলুম চলছে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নাই। আজ পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতারা কারাগারে বন্দি। আওয়ামী লীগ আজ জেলখানায়। 'মানুষকে জেলে নিতে পারে কিন্তু নীতিকে জেলে নিতে পারে না।'

কনভেনশন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব আসলাম খান। বোধ হয় পূর্বে কেহ এই ভদ্রলোকের নাম শোনেন নাই, নতুন আমদানি। জনাব বলেছেন, সারা বাংলা ঘুরে ৬ দফার সমর্থক পেলেন না। বন্ধু একটু ধীরে চলুন, বাংলাদেশকে চিনতে এখনও আপনার বহুদিন লাগবে! বেশি দালালি করে লাভ নাই। ভুট্টো সাহেবের অবস্থা দেখেও শিখলেন না! আপনার পূর্বে আরও কয়েকজন সেক্রেটারি বড় বড় বক্তৃতা করেছেন, তারা কোথায়? বোধ হয় এখন আর খোঁজ খবর নাই।

ড. মির্জা নূরুল হুদা সাহেব ৬ দফার উপর কটাক্ষ করে বলেছেন, 'পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে'। যাহা হউক, পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে যাবে এ কথাতো তারা বলেন নাই। ড. হুদা সাহেবকে আমার জানা আছে। মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পূর্বে কি বলেছেন, আর মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পরে কি বলছেন! 'হায়রে মন্ত্রীত্ব, তোমার কি জাদু! যাকেই হার দিয়েছ তাকেই বশ করে ফেলেছ।'

সন্ধ্যার দিকে জেলার সাহেব এলেন। কয়েকদিন ছুটিতে ছিলেন। তার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। জেলার সাহেব খুব হাসিখুশি লোক। অমায়িক ব্যবহার। শুধু বললাম, 'আমার দলের লোকগুলিকে অত কষ্টে না রাখলেই পারতেন। এরাই বোধ হয় সকলের থেকেই খারাপ লোক? বুঝি, আপনাদের অসুবিধা! একজন ভদ্রলোক আওয়ামী লীগের কাকে কোথায় রাখা হবে ফোন করে বলে দেন। তাহার হুকুম আপনাদের তামিল করতেই হবে, কি বলেন? যাহা হউক, আমাদেরও সহ্যের সীমা আছে! আমাকে একলা রেখেছেন ঠিক আছে, একলাই থাকব। এমন অনেক আমি রয়েছি। কিন্তু এদের নিজেদের পাকের ব্যবস্থা নিজেদের সামনেই করতে দিন। দেখাশোনা করে খাবে। তাহাও যদি সরকার বাধা দেয় তবে জানাবেন, আমাদের পথ আমরাই বেছে নিব। তবে আপনারা এতো ভদ্র ব্যবহার করেন যে কিছুই আমরা করতে পারি না। আমার সহকর্মীদের পূর্বেই বিভিন্ন জেলে বদলি করে দিয়েছেন। দেখেন চিন্তা করে।' বেচারার মনটাও খারাপ। তালাবন্ধের সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কথা বন্ধ করলাম। ঘরে ঢুকতেই বাতি নিভে গেল। বিজলি পাখাও বন্ধ হয়ে

গেল। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে বই নিয়ে বসলাম। অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করলাম। মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে অন্ধকারটা একটু দেখে নিই। যাকে বলে চক্ষু জুড়াই।

আবার ড. এম. নূরুল হুদা সাহেবের বক্তৃতা ভাল করে পড়লাম। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন, হঠাৎ একজনের দয়ায় মন্ত্রী হয়ে রাজনীতিবিদ হওয়ার চেষ্টা করছেন। তাই রাজনীতি সম্বন্ধে কি বলতে কি বলে ফেলেছেন, বোধ হয় নিজেই বুঝতে পারেন নাই। তাই কথাগুলি লিখে রাখলাম ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে।

'The Finance Minister also brought serious allegations against the advocates of Six-Point Programme of Awami League. He said that certain forces continued to have the Consortium Aid postponed. These forces also thrust a war on Pakistan. But their two actions failed to break Pakistan as the People stood united like a rock. Then came the Six-Point Programme of the Awami League.

This Programme really aims at setting up a weak national government, which means a weak Pakistan, the Finance Minister commented. The most important thing is however, the timing of the Programme, he added.'

Pakistan Observer 24.6.1966

মন্ত্রীত্বের লোভে ভদ্রলোক এত নিচে নেমে গিয়েছেন যে একটা দলের বা লোকের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। যদি বলতে হয় পরিষ্কার করে বলাই উচিত।

রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়া ছাড়া আর উপায় কি?

২৫শে জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

আজ অনেকক্ষণ বেড়ালাম। পড়তেও ইচ্ছা হয় না। চুপ করে একাকী বসে থাকার চেয়ে হাঁটতে ভাল লাগে। তাই হাঁটতে লাগলাম আপন মনে। বেগম সাহেবা বাড়ির আম ও বিস্কুট পাঠাইয়াছেন। এতগুলি কি করে একলা মানুষ

খাব? ভালই হয়েছে কয়েদিগুলিকে খাওয়াতে পারব, ওদের কিসমত তো ফাঁকা। বৎসরে দয়া করে যদি একদিন আম দেওয়াও হয় সেগুলি বাজারের সকলের নিকৃষ্ট। কনট্রাকটার সরবরাহ করে থাকেন কিনা! কাজেই বুঝতেই পারেন কি আম দেওয়া হয়। আম কেটে যারা সামনে বসে কাজ করে তাদের সকলকে কিছু কিছু দিতে বললাম। আর আমায় যারা দেখাশোনা করে তাদের জন্য তো আছেই।

বই নিয়ে বসেছি। জমাদার সাহেব ও কম্পাউন্ডার সাহেব এলেন। বসলেন আমার ঘরে। বললাম, খবর কি? দেশে খুব পানি হয়েছে, ফসলের কি হবে বলা যায় না। কম্পাউন্ডার সাহেব বললেন, একটা মেয়ে ও একটা ছেলেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল। দু'জনে প্রেম করে বিবাহ করেছিল। মেয়ের বাবা মামলা করে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে আনিয়েছে। আজ ছেলেটা মামলায় জিতেছে। মেয়েটাকে নিয়ে চলে গিয়েছে, গাড়ি নিয়ে এসেছিল। মেয়েটার খুব ফূর্তি। কম্পাউন্ডার সাহেবও খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো। বললাম, আপনিও খুব খুশি হয়েছেন দেখছি! বললেন, ওদের দু'জনের আনন্দ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। বললাম, 'প্রথম জীবনের উন্মাদনায় এই রকমের হয়ে থাকে, কিন্তু ফলাফল শেষ পর্যন্ত বেশি ভাল হয় না। এমন অনেক প্রমাণ আছে। ছেলে ও মেয়ে একে অন্যকে পছন্দ করে বিবাহ করুক তাতে আপত্তি নাই, তবে উচ্ছৃঙ্খলতা এসে গেলে সমাজ ধ্বংস হতে বাধ্য। দেখা গেছে এমন অনেক হয়েছে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে না পেরে অনেক অঘটন ঘটেছে। তাই আজকাল দেখবেন আমাদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যার পরিণাম ভাল না। শুরুও হয়ে গেছে এ দেশে এর ফলাফল। নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, নারী শিক্ষা না হলে দেশের মুক্তি আসতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার নামে যে নির্লজ্জতা বেড়ে যেতেছে এদিকেও সমাজের নজর দেওয়া উচিত।' ওর কাজ আছে, আমার মতো সরকারের অতিথি উনি নন, তাই চলে গেলেন। বহু ইনজেকশন দিতে হবে।

আমি বইয়ের মধ্যে মন দিলাম। মেট এসে হাজির, স্যার ডাব খাবেন না? বললাম, আনো। পেটের ব্যথা, পেট খারাপ হয়েই থাকে। তাই ডাব মাঝে মাঝে খাই। ডাব খেয়ে পাইপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আবার ফুলের বাগানে। একটা মাত্র বন্ধু ফুলের বাগান। ওকে আমি ভালবাসতে আরম্ভ করেছি। যাদের ভালবাসি ও স্নেহ করি, তারা তো কাছে থেকেও অনেক

দূরে। ইচ্ছা করলে তো দেখাও পাওয়া যায় না। তাই তাদের কথা বার বার মনে পড়লেও মনেই রাখতে হয়। স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সাথে তো মাসে দু'বার দেখা হয় আর কারও সাথে তো দেখা করারও উপায় নাই। শুধু মনে মনে তাদের মঙ্গল কামনা করা ছাড়া উপায় কি!

গোসল করে খেয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। মতিয়ার নামে একটা ছেলে আমাদের সেল এরিয়ার পানি দেয়। বাড়ি টাঙ্গাইল, স্কুলে পড়তো। দুই পক্ষে ফুটবল খেলা নিয়ে গোলমাল হয় এবং একটা খুন হয়। সেই মামলায় ছয় বৎসর জেল হয়েছে। আমার কাছে এসে বলল, জেলার সাহেবকে একটু বলে দিতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা জেল থেকে দিতে চায়, তার অনুমতির বন্দোবস্ত করতে। বললাম, জেলার সাহেব আসলে অনুরোধ করব—যদি শোনেন। ছেলেটা এখানে এসে কাগজ পড়ে। শুনলাম ওকে জেলের আইন ভঙ্গ করার জন্য জেলার সাহেব একবার শাস্তি দিয়েছেন, তাই অনুমতি দিতে চান না। রাগ করে আছেন। জেলার সাহেব ওকে নিজের অফিসে প্রথমে নিয়েছিলেন, সেখানে গোলমাল করার জন্য তাড়াইয়া দিয়েছেন। তবুও ওকে বললাম, জেলার সাহেব আসলে অনুরোধ করব।

কাগজ এল। মর্নিং নিউজে দেখলাম জনাব খান আবদুস সবুর খান বলেছেন 'বাংলাদেশের লোক আওয়ামী লীগের ধাপ্পা ধরে ফেলেছে, জুলুম প্রতিরোধ দিবস কেহই পালন করে নাই।' পিন্ডি চলেছেন, তার নেতাকে খুশি করতে পারবেন একথা বলে। তাই হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঐ কথা। এসব কথা বলে বাঙালির দাবি আর দমাতে পারবেন না, এ কথা ভাল করে জেনে রাখুন সবুর সাহেব। জেল, জুলুম, মামলা সমানে চালাইয়াছেন। কাগজ বন্ধ করেছেন, এতেই গণআন্দোলন বন্ধ হয় না, সেরকম ভেবে থাকলে ভুল করেছেন।

মর্নিং নিউজ সবুর সাহেবের নামের দুই পাশেই 'খান' লাগাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানি কায়দা। আগে ছিল আবদুস সবুর খান, এখন হয়েছেন খান আবদুস সবুর খান। চমৎকার, এই তো চাই! পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকেরা যে গোপনে গোপনে হাসেন একথা বুঝেও বোঝেন না এই ভদ্রলোকেরা। এই মুসলিম লীগের এক নেতা সীমান্ত প্রদেশে যেয়ে তার পূর্ব-পুরুষের গোরস্থান খুঁজেছিলেন। আজ সবুর সাহেব বোধ হয় ওদিকে অন্য কিছু খোঁজ করছেন?

ন্যাপের অন্যতম এমপিএ আহমেদুল কবির সাহেব ৫ একর জমির খাজনা মওকুফ করতে দাবি করেছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি চার বৎসর পূর্বে ২৫ বিঘা জমির উপর থেকে খাজনা মওকুফ করার দাবি করে অনেক জনসভা ও আন্দোলন করেছি। এমন কি সর্বদলীয় বিরোধীদলের ১২ দফা দাবির মধ্যেও আওয়ামী লীগের এই দাবি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলাম। যদিও মরহুম খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ন্যাপের কোনো কোনো নেতা ৬ দফা গোপনে গোপনে সমর্থন করলেও লজ্জায় বলেন না, আর কেউ কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। দিন আসছে ৬ দফা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মেনে এদেশে রাজনীতি করতে হবে না। তবে রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন অনেকেই।

বিকালে খবর পেলাম মিজান খুব ঘুমাচ্ছে। বোধ হয় ওকে রাতে ঘুমাতে দেয় নাই।

সন্ধ্যায় দেখলাম পুরানা বিশ সেলে নারায়ণগঞ্জের খাজা মহীউদ্দিনকে নিয়ে এসেছে। ওর বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা দিয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে ওকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়েছে। ডিভিশন দেয় নাই। ভীষণ মশা, পরশু পরীক্ষা, মশারিও নাই। তাড়াতাড়ি একটা মশারির বন্দোবস্ত করে ওকে পাঠিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যখন এসে গেছে একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যাবে। বেশি কষ্ট হবে না। খাজা মহীউদ্দিন খুব শক্তিশালী ও সাহসী কর্মী দেখলাম। একটুও ভয় পায় নাই। বুকে বল আছে। যদি দেশের কাজ করে যায় তবে এ ছেলে একদিন নামকরা নেতা হবে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। ত্যাগ করার যখন প্রাণ আছে, আদর্শ যখন ঠিক আছে, বুকে যখন সাহস আছে একদিন তার প্রাপ্য দেশবাসী দেবেই।

২৬শে জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

ভোর রাত্র থেকেই মাথা ভার ভার লাগছিল। বিছানা ছাড়তেই মাথার ব্যথা বেড়ে গেল। আমার মাথায় যন্ত্রণা হলে অসহ্য হয়ে উঠে। অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম, চা খেলাম, কিছুতেই কমছিল না। ওষুধ আমার কাছে আছে, 'স্যারিডন', কিন্তু সহজে খেতে চাই না। আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুলে

বেশি লাগে তাই অনেকক্ষণ বাইরে যেয়ে হাঁটতে লাগলাম। বাতাসে ভালই লাগছিল। ব্যথা একটু কম কম লাগছিল।

আজ তো রবিবার। কয়েদিরা কাপড় পরিষ্কার করবে। ঠিক করেছি, স্যারিডন সহজে খাব না। মেট ও পাহারা কাহাকেও কিছু বললাম না। প্রায় দশটার দিকে আরাম লাগছিল। বাইরে থাকতে মাথা ব্যথায় অনেক সময় কষ্ট পেতাম। স্যারিডন দুই তিনটা খেয়ে চুপ করে থাকতাম। আধা ঘণ্টা পরেই ভাল হয়ে যেতাম। আবার কাজে নেমে পড়তাম। রেণু স্যারিডন খেতে দিতে চাইত না। ভীষণ আপত্তি করত। বলত, হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে। আমি বলতাম, আমার হার্ট নাই, অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। বাইরে তার কথা শুনি নাই। কিন্তু জেলের ভিতর তার নিষেধ না শুনে পারলাম না।

ডিপুটি জেলার সাহেব এলেন। কিছু সময় পরে জমাদার সাহেব তার ফৌজ নিয়ে হাজির। আমার ঘর তালাশ করবে। কোনো কিছু বেআইনি লুকাইয়া রাখি কি না? এটা জেলের নিয়ম। রাজবন্দিদের ঘরগুলি সপ্তাহে একবার করে তালাশি দেওয়া হয়ে থাকে। তবে আমার ঘর তালাশি বেশি করে না। এসে দেখে যায়। কারণ জানে বেআইনি কাজ আমি করি না। আর বেআইনি জিনিস আমার কাছে থাকে না। তবে আসলেই আমি নিজেই বলি বের হয়ে যেতেছি, আপনারা তালাশ করে দেখে নিন। ইচ্ছা করলে এরা শরীর তল্লাশি করতে পারে, তবে জেলার ও ডিপুটি জেলার ছাড়া অন্য কেহ পারে না। সিপাহিরা ঘরের ভিতর আসল না, শুধু জমাদার সাহেব ভিতরে এসে ঘুরে গেলেন।

আমি বললাম, 'প্রত্যেক সপ্তাহে আসেন কিছুই পান না। একবার বলবেন, আমি কিছু বেআইনি মাল রেখে দিব।' এরা খোঁজ করে কোনো চিঠিপত্র বাইরে পাঠাই কিনা? কোনো অস্ত্রপাতি আনি কিনা বাইরে থেকে, যা দিয়ে পালাতে পারি। রাজবন্দি অস্ত্রপাতি আনে এ খবর আমার জানা নাই। তবে অনেক সময় চিঠিপত্র পাওয়া গেছে রাজবন্দিদের কাছ থেকে। এরা এক সেল থেকে অন্য সেলে যোগাযোগ রাখে। এক এরিয়া থেকে অন্য এরিয়ার সাথেও যোগাযোগ রাখে। যখন জেল কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারের সাথে বোঝাপড়া করতে চায় তখন যাতে একসাথে করতে পারে। সেজন্যই যোগাযোগটা করে। আজকাল তাহাও করে না। কারণ বিচার কোথায়?

জমাদার চলে গেলেন। ডিপুটি জেলার সাহেব বসলেন কিছু সময়। আমার সহকর্মীদের উপর সরকারের এই ব্যবহারের কথা বললাম। আওয়ামী লীগ কর্মীদের ও মানিক ভাইকে যে অবস্থায় রেখেছে দুষ্ট প্রকৃতির কয়েদিদেরও সেভাবে রাখা হয় না। এদের বলে লাভ নাই জানি, কারণ, গ্রেপ্তার করে জেলগেটে পৌঁছাইয়া হুকুম দিয়ে যায়—কোথায় কাদের রাখা হবে।

যদি জেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করে তবে পাকের বন্দোবস্ত বন্দিদের হাতেই দিতে পারে। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা করছে না। আমার সাথে আমার দলের কাহারও এক জেলে থেকেও দেখা হয় না। আমি একদিকে আর অন্যরা অন্যদিকে। বোধ হয় জেলের মধ্যে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। সরকারের হুকুম আমার কাছে কাহাকেও দেওয়া হইবে না, কাহারও সাথে যোগাযোগ রাখতে পারব না। আমার খবর বন্দি নেতা কর্মীরা পায় কিনা জানি না, তবে ওদের খবর আমি রাখি, কি অবস্থায়—তাদের রাখা হয়েছে।

ডিপুটি জেলার সাহেব চলে গেলেন। রবিবার ছুটির দিন। তবুও এদের ছুটি নাই, অনেক কাজ। নারায়ণগঞ্জ থেকে চটকল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি আবদুল মান্নানকে নিয়ে এসেছে। জামিন দেয় নাই, নারায়ণগঞ্জে মামলায় তাকে আসামি করেছে। ভদ্রলোক কাছেও ছিল না। শুনলাম নারায়ণগঞ্জে মশা কামড়াইয়া তার হাত মুখ ফুলাইয়া দিয়াছে। আরও বহু লোককে গ্রেপ্তার করে নারায়ণগঞ্জ জেলে রেখেছে। অনেক ছাত্রও আছে। জামিন পায় নাই। কাপড় দেয় নাই, ডিভিশন দেয় নাই। প্রত্যেকটা লোক অর্ধেক হয়ে গেছে। তিন শতের উপর লোককে আসামি করেছে। যাকেই পেয়েছে গ্রেপ্তার করে জেলে দিতেছে।

'জাতীয় সরকার' অত্যাচার করো, ফলাফল একদিন পেতে হবে, বেশি দেরি নাই। তখন আবার 'নিষ্ঠুর' বলিও না। কাহারা এই অত্যাচার করছে—বাঙালিরা, চাকরির জন্য। এরা বোঝে না কাদের জন্য এই লোকগুলি জীবন দিল? কার জন্য এরা কষ্ট ভোগ করছে? এদের অনেকেরই ছেলেমেয়ে না খেয়ে কষ্ট পেতেছে। কিছুদিন পরে বের হয়ে দেখবে কেউ নাই, সব শেষ। যে লোকটা উপার্জন করে, দিন মজুরি করে সংসার চালাতো তাকে আটকিয়ে রাখলে তার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা মা না খেয়ে থাকবে। আস্তে আস্তে মরে শেষ হয়ে যাবে। এই খবর কি সরকার জানে না? আমাদের দেশের এই শিক্ষিত চাকরিজীবীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক আছে পদোন্নতির জন্য তারা কত যে সংসার ধ্বংস করেছে তার কি কোনো সীমা আছে?

খাজা মহীউদ্দিন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে। আর একটা ছেলে—মিলকী তাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। জেল কর্তৃপক্ষ ঢাকার এসডিওকে জানাইয়াছিল। তিনি বলেছিলেন, ডিসি সাহেবের সাথে পরামর্শ করে জানাবেন। আগামীকাল সকালে পরীক্ষা শুরু হবে। কোনো খবর এসডিও সাহেব দেন নাই। বোধ হয় ঢাকার ডিসি সাহেব গভর্নর সাহেবের অতি প্রিয় লোক। অনুমতি দেন নাই। খুব মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। একটা বৎসর নষ্ট হয়ে গেল। ফিস দিয়েছে, সকল কিছু প্রস্তুত, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয় নাই।

পুরানা ২০ সেলে তাকে বললাম দূর থেকে, 'ভেব না ভাই। আমাকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাহির করে দিয়েছিল। যারা বাহির করে দিয়েছেন তাদের অনেকেই আমার কাছে এসেছিলেন। ক্ষমা করে দিয়েছিলাম—পরে শোধ নিতে পারতাম, নেই নাই। খোদার উপর নির্ভর করো।' খাজা মহীউদ্দিন যে কি খেয়ে পরীক্ষা দিবে তাই ভাবলাম। ডিপুটি জেলার সাহেবকে বললাম, একটু খেয়াল রাখবেন ছেলেটার দিকে। আমার কাছে তো কিছু কিছু জিনিস আছে কিন্তু দেবার তো হুকুম নাই। তবুও ভাবলাম, বেআইনি হলেও আমাকে কিছু দিতে হবে। দেখা হয়েছিল। আমার সেলের কাছ দিয়ে যেতে হয়। আমি এগিয়ে যেয়ে ওকে আদর করে বললাম, 'ভেব না, তুমি পাশ করবা। মাথা ঠান্ডা করে লেখবা।'

আজ বাজার থেকে আমার খাবার টাকা বাঁচিয়ে দু'টা মুরগি এনেছি। বাগান দিয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। সূর্য অস্ত গেল, আমরাও খাঁচায় ঢুকলাম। 'বাড়িওয়ালা' বাইরে থেকে খাঁচার মুখটা বন্ধ করে দিল। বোধহয় মনে মনে বলল, আরামে থাক, চোর ডাকাতের ভয় নাই, পাহারা রাখলাম।

২৭শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

নিজের শরীরও ভাল না; বাবুর্চি কেরামত আলীরও রাত্রে খুব জ্বর হয়েছে। বললাম হাসপাতালে যেতে, রাজি হলো না। দেখলাম জ্বর এখনও আছে। নতুন লোক এনে পাকাইতে দিলে মুখে দেওয়া যাবে না। কোনোমতে একে শিখাইয়া নিয়েছি।

ডাক্তার এলে ওষুধ দিলাম। শুয়েই রইল, শুয়ে শুয়ে দেখাইয়া দিল, একজন ফালতু কোনোমতে পাক করে আনল।

আজ আমার পড়তে ভাল লাগছে না, মাথা ঘুরছে। পাশেই নতুন বিশ-এর ২নং ব্লক, পাঁচটা সেল। কয়েকজন 'নামকরা' কয়েদি, একজন মোক্তার বাবু, পটুয়াখালী বাড়ি—আর নুরুদ্দিন নামে ডাকাতি মামলার আসামি একজন নতুন কয়েদিকে এখানে আনা হয়েছে। তার বাড়ি গোয়ালন্দ মহকুমায়। ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ির অবস্থা ভাল, লেখাপড়াও জানে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার গান শুনছিলাম। চমৎকার গান গায়। ভারী সুন্দর গলা। যদি সত্যিই সাধনা করত তাহলে বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়কদের অন্যতম গায়ক হতো। আইন মানে না। কথা শোনে না। যথেষ্ট মার খেয়েছে এই কারাগারে এসে। কাউকেই মানে না, যা মুখে আসে তাই বলে। সমস্ত মার্ক কেটে দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। কোনো মার্ক পাবে না। তিনমাসে কয়েদিরা ১৮ দিন থেকে ২৩ দিন পর্যন্ত মার্ক পেয়ে থাকে। মানে ভালভাবে জেল খাটলে আইন ভঙ্গ না করলে কয়েদিদের নয় মাস সাড়ে নয় মাসে বৎসর। যত মার্ক শুরুতে পেয়েছিল তা আবার কেড়ে নিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। পুরা দশ বৎসর খাটতে হবে। ভালভাবে থাকলে সাত বৎসর বা কাছাকাছি জেল খাটলেই খালাস পেত। এখন ওকে পুরা জেল খাটতে হবে। আমাকে বলে, 'পুরাই খেটে যাব। আর যাবারও ইচ্ছা নাই। মরলেও ভাল হতো। বাবা ভাইরা কোনো খবর নেয় না। ডাকাতি ও খুনের মামলায় জেল হয়ে তাদের ইজ্জত মেরেছি।' একবার ওর মা ফরিদপুর জেলে দেখতে এসেছিল। তাকেও নিষেধ করে দিয়েছে। ২২ বৎসর বয়সে জেলে এসেছে। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৭/৮ বৎসর পর্যন্ত কয়েদির খাওয়া খেয়ে, মশার কামড় সহ্য করে। স্বভাবের জন্য অত্যাচার সহ্য করে করে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেছে। সকলেই বলে, 'লোক সাংঘাতিক'!

আমি বললাম, 'নুরু কেন জীবন নষ্ট করলে বলতে পার? বাবা-মার মুখে চুনকালি দিলে, বংশের ইজ্জত নষ্ট করলে, কারাগারে কষ্ট করলে, কি লাভ হলো? তোমাকে জেলেও সকলেই খারাপ বলে। যে কয়দিন থাক, ভালভাবে থাক, তাড়াতাড়ি জেল খেটে বাড়ি যাও। বাবা-মার কাছে ফিরে যাও, আর এ পথে পা বাড়িও না।' বলল, 'স্যার আমার দুঃখের কথা না-ই শুনলেন। চেষ্টা করব আপনার কথা রাখতে, তবে কি মুখে আর বাবা-মার কাছে যাবো? তাই গোলমাল করে পুরা জেল খাটতে চাই। বাইরে যেয়ে আর হবে কি? মরতে পারলে ভাল হয়।' আমি বললাম, 'তোমার জেল থেকে বের হবার পূর্বে

(সম্ভাবনা কম) যদি আমি বের হই, তবে দেখা করো। তোমার বাবা ও ভাইকে আমি চিঠি দিব। কিন্তু বের হলে কিছুদিন বাড়ির বাইরে যেতে পারবা না এবং ঐ কুপথে আর পা বাড়িও না।' সে বলল, 'আপনার কাছে আমাকে নিয়ে নেন।' আমি বললাম, আমার আপত্তি নাই। 'তোমাকে আমার কাছে দিবে না। গান গাও নূরু, তোমার গান শুনি, ভাল লাগছে তো আমারও।' অনেক গান গাইল, বললাম, 'বাংলার মাটির সাথে যার সম্বন্ধ আছে সেই গান গাও।' আমি বারান্দায় মাটিতে বসে পড়লাম। নূরু ওর সেলের বারান্দার কাছে বসে গান করতে শুরু করল। অনেকক্ষণ গান শুনলাম। পরে আবার হাঁটতে লাগলাম।

ভাত খেয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। কাগজ এল, কাগজ পেয়ে বইটা রেখে দিলাম। কাগজ এলেই—হাসেম মিয়া জেলের মেম্বর, পাহারাও—বরিশাল বাড়ি, একবার প্রেসিডেন্ট ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের; আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়ে ৬ বৎসর জেল খেটে এসেছে সে, মতিয়ার রহমান টাঙ্গাইল বাড়ি ও রফিক আমার এখানকার ছাপাইয়া—এরা ছুটে আসে কাগজ পড়তে। বোঝার মতো লেখাপড়া এরা সকলেই জানে। তাই বাংলা কাগজগুলি ওদের দিয়ে দিই পড়তে। খবর কিছুই থাকে না আজকাল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এত বেশি যে কেহই কিছু লেখতে সাহস পায় না।

বিকালে সিভিল সার্জন সাহেব আমাকে দেখতে এলেন। বললাম, ভালই আছি। তবে জেল কোড অনুযায়ী কোনো লোককে দুই মাসের বেশি একলা থাকতে দেওয়া নিষেধ, অথচ আমাকে একলা রাখা হতেছে। এর বেশি বললাম না কারণ ডাক্তার হিসাবে চমৎকার লোক। রোগীকে রোগী হিসেবেই দেখেন। কাহাকেও কয়েদি হিসেবে দেখেন না। কয়েদিরা যাতে ভালভাবে ঔষধ পায়, খাওয়া পায় তার দিকে যথেষ্ট নজর আছে।

কিছু সময় পরে বের হয়ে পড়লাম ঘর থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। দেখলাম জেলার সাহেব আসছেন। কয়েক মিনিট বসে তিনি চলে গেলেন। আমার বাগানের প্রশংসাও করলেন।

আবার একাকী ঘুরতে ঘুরতে সময় হয়ে এল। আজকে দশমিনিট দেরি হলো দরজা বন্ধ করতে। রাজবন্দিদের দরজা বন্ধ করা উচিত না। ইংরেজের সময়ও অনেক কাল পর্যন্ত রাজবন্দিদের দরজা বন্ধ করার হুকুম ছিল না।

দরজা বন্ধ কেন? গলা টিপে মারো, তাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নাই। শুধু শোষণ বন্ধ কর। জনগণের অধিকার ফেরত দাও।

২৮শে জুন ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

কি বিপদেই না পড়েছি! বাবুর্চি বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, পাক করবে কে? নতুন একজন আনলে আবারও আমার কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে হবে। আমার তো তেমন কোনো ধারণাও নাই, তবুও বাবুর্চিকে নিয়ে একটা পাক প্রণালী আবিষ্কার করেছি। মেট বলল, একটা মুরগি এনেছিলাম, ডিম দিয়েছে। খুব খুশি জেলখানায় আবার মুরগিতে ডিম দেয়? বললাম, খুব ভাল, রেখে দেও, মুরগিকে বাচ্চা দেওয়াব। ডিম কিন্তু খাওয়া চলবে না।

২৬ সেলে সিকিউরিটি বন্দিরা থাকেন। ১৯৫৮ সালে গ্রেপ্তার হয়ে এখনও আছেন। সরকার ছাড়বার নাম নিচ্ছেন না। তারাও জানেন না কি করে মাথা নত করতে হয়। অনেকেই আছেন যারা ইংরেজ আমলেও দুই চার বার জেল খেটেছেন।

সেই ২৬ সেল থেকে আমার জন্য কুমড়ার ডগা, ঝিংগা, কাকরোল পাঠিয়েছেন। তাঁদের বাগানে হয়েছে, আমাকে রেখে খায় কেমন করে! আমার কাছে পাঠাতে হলে পাঁচটি সেল অতিক্রম করে আসতে হয়, দূরও কম না। বোধ হয় বলে-কয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁরা যে আমার কথা মনে করেন আর আমার কথা চিন্তা করেন, এতেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। এঁরা ত্যাগী রাজবন্দি দেশের জন্য বহু কিছু ত্যাগ করছেন। জীবনের সবকিছু দিয়ে গেলেন এই নিষ্ঠুর কারাগারে। আমি তাঁদের সালাম পাঠালাম। তাঁরা জানেন, আমাকে একলা রেখেছে, খুবই কষ্ট হয়, তাই বোধ হয় তাঁদের এই সহানুভূতি।

আজ ফলি মাছ দিয়েছে। বাবুর্চি বলল, কোপতা করতে হবে। বাবুর্চি জানে না, কেমন করে করতে হয়, আমিও জানি না। তবু করতে হবে। বললাম, বোধ হয় এইভাবে করতে হয়। বাবুর্চি ও আমি পরামর্শ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলাম। সেইভাবেই করা হলো। যখন খেতে শুরু করলাম মনে হলো কোপতা তো হয় নাই, তবে একটা নতুন পদ হয়েছে। কি আর করা যায়, চুপ করে খেয়ে নিলাম। বললাম, 'বাবারা, বাড়িতে যে রকম খাই তার

ধারে কাছ দিয়েও যায় নাই। যাহা হউক খেয়ে ফেল, ফলি মাছ তো!' মনে মনে হাসলাম, পাস করা বাবুর্চি আমি! ভাগ্য ভাল, বাইরের লোক ছিল না, থাকলে কোপতা আমার মাথায় ঢালতো। এই সময়ই মনে হলো একলা হয়ে সুবিধাই হয়েছে।

খবরের কাগজ এসেছে। ভাসানী সাহেবের রাজনৈতিক অসুখ ভাল হয়ে গেছে। যখন গুলি চলছিল, আন্দোলন চলছিল, গ্রেপ্তার সমানে সমানে চলেছে তখন দেখলাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার দেখলাম দুই তিন দিন পরে কোথায় যেতে ছিলেন পড়ে যেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। হঠাৎ অসুস্থ মানুষ আবার বাড়ির বাহির হলেন কি করে? যখন আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য কর্মীরা কারাগারে—এক নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিনশত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে, তখনও কথা বলেন না। আওয়ামী লীগ যখন জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করল তখন একদল ভাসানীপন্থী প্রগতিবাদী(!) এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে সরকারের সাথে হাত ও গলা মিলিয়েছে। এখন তিনি হঠাৎ আবার সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজে ময়দানে নামবেন।

মওলানা সাহেব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আইয়ুব খানকে সমর্থন করে চলেছেন। মওলানা সাহেবের সাথে যদি যুক্তফ্রন্ট করতে হয় তবে আইয়ুব সাহেবই বা কি অন্যায় করেছেন? মওলানা সাহেব তো দেশের সমস্যার চিন্তা করেন না। বৈদেশিক নীতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশে গণআন্দোলন বা দেশের জনগণের দাবি পূরণ ছাড়া বৈদেশিক নীতিরও কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। জনগণের সরকার কায়েম হলেই, জনগণ যে বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করতে বলবে, নির্বাচিত নেতারা তাহাই করতে বাধ্য। ডিক্টেটর যখন দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে এবং একটা গোষ্ঠীর স্বার্থেই বৈদেশিক নীতি ও দেশের নীতি পরিচালনা করছে তার কাছ থেকে কি করে এই দাবি আদায় করবেন আমি বুঝতে পারছি না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, খাদ্য, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে তখন পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে এখন এসেছেন যুক্তফ্রন্ট করতে! আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা ও কর্মীই কারাগারে বন্দি। কেহ কেহ আত্মগোপন করে কাজ করছে, এখন যে কয়েকজন বাইরে আছে তারা কিছুতেই এদের সাথে যোগদান করতে পারে না। আর ছয় দফা

দাবি ছেড়ে দিয়ে কোনো নিম্নতম কর্মসূচি মেনে নিতে পারে না। ছয় দফাই হলো নিম্নতম কর্মসূচি। কোনো আপোষ নাই। জনগণ যখন এগিয়ে এসেছে তখন দাবি আদায় হবেই। আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করে যাবে। জনগণকে আর ধোঁকা দেওয়া চলবে না। অনেক জগাখিচুড়ি পাকানো হয়ে গেছে। আর না। ভাসানী সাহেব এগিয়ে যান আইয়ুব সাহেবের দল নিয়ে। এখন তো তিনি সুখেই আছেন, আর কেন মানুষকে ধোঁকা দেওয়া? আওয়ামী লীগ বা তার নেতারা যদি ছয় দফা দাবি ত্যাগ করে আপোষ করতে চান তারা ভুল করবেন। কারণ তাহলে জনগণ তাদেরও ত্যাগ করবে।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, মানিক বাবু ও আবদুল মান্নানের জন্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন করা হইয়াছে। বিচারে কি হয় দেখা যাক।

২৯শে জুন ১৯৬৬ ॥ বুধবার

ঘুম ভাঙলো বৃষ্টির পানি গায়ে লেগে, মশারির একটা অংশ ভিজে গিয়াছে। খুব ঘুমিয়েছিলাম, টের পাই নাই। বৃষ্টি হতেছে, মুষল ধারে। যখন বৃষ্টির খুব প্রয়োজন ছিল তখন হয় নাই, এখন যখন বৃষ্টির প্রয়োজন নাই তখন খুব হতেছে। বন্যায় দেশের খুবই ক্ষতি হয়েছে। চাউল তেল ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। মোনায়েম খান সাহেবের বক্তৃতায় পেট ভরে যাবে সকলের। তিনি বলেন, আল্লাহর তরফ থেকে বন্যা হয়েছে। কষ্টের ভিতর দিয়ে খোদা লোককে পরীক্ষা করে থাকেন। কি আর বলা যায়! বন্যা কনট্রোল করতে পারে আজকাল দুনিয়াতে। অনেক দেশে করেছেও। একটু চক্ষু খুলে দেখলে ভাল হয়। ভদ্রলোকের দোষ কি? কিই-বা জানেন আর কিই-বা বলবেন। খান সাহেব এদিক দিয়ে ভাল লোক, স্বীকার করেন যে তিনি নূরুল আমীন সাহেবের হুকুমে গুন্ডামি করে বেড়াতেন। এখন তিনি লাট হয়েছেন। ভাল কথা। 'গুন্ডার পরে পান্ডা। পান্ডার পরে নেতা, এইতো হলো নেতার ডেফিনেশন।'

হঠাৎ পেট দিয়ে রক্ত পড়লো অনেক ফিনকি দিয়ে, চেয়ে দেখলাম, সবই লাল। ব্যাপার কি? পাইলস তো সেরে গিয়াছে, অনেক আগেই, প্রায় তিন বৎসর হলো। পেটে কোনো অসুখ নাই। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

আবার সকাল দশটায় একবার পায়খানায় যাই। দেখি আবার রক্ত, বুঝলাম আবার পাইলস হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করে লাভ কি? ভুগতে তো হবেই। ডাক্তার সাহেব এলেন। বললেন, ঔষধ দিতেছি। ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। খুব সাবধানে থাকি আমি জেলে। শরীর রক্ষা করতে চাই, বাঁচতে চাই, কাজ আছে অনেক আমার। তবে একটা ছেড়ে আর একটা ব্যারাম এসে দেখা দেয়।

কাল জাতীয় পরিষদ থেকে বিরোধী দল একই দিনে দুইবার পরিষদ কক্ষ বর্জন করে—স্পিকারের রুলিংয়ের প্রতিবাদে। আমার মনে হয় বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের এই পরিষদ থেকে পদত্যাগ করাই উচিত। এই পরিষদের যা ক্ষমতা তাতে এর সদস্য হওয়ার অর্থ কি? দুনিয়াতে পার্লামেন্টের যে কনভেনশন আছে তার ধারে কাছ দিয়েও এরা যায় না।

প্রেসিডেন্ট, সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে একটা পরিষদ করেছে দুনিয়াকে দেখানোর জন্য। বিরোধী দলের নেতাকে বলতে দেয় না স্পিকার, এই প্রথম শুনলাম।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই রাওয়ালপিন্ডি গিয়েছেন আইয়ুব সাহেবের সাথে নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। আপনাকে আমরাও স্বাগতম জানাই। চীনের সাথে বন্ধুত্ব আমরাও কামনা করি। তবে দয়া করে সার্টিফিকেট দিবেন না। আগে আপনি ও আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বড় বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়াছেন। লাভ হবে না। আপনারা জনগণের মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, আর যে সরকার জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া আপনাদের উচিত না। এতে অন্য দেশের ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও আপনাদের পথ এক না হওয়াই উচিত।

১৯৫৭ সালে আমি পাকিস্তান পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে চীন দেশে যাই। আপনি, আপনার সরকার ও জনগণ আমাকে ও আমার দলের সদস্যদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেছেন এবং আমাকে আপনাদের পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে দিয়ে যে সম্মান দিয়েছিলেন তা আজও আমি ভুলি নাই। আমি আপনাদের উন্নতি কামনা করি। নিজের দেশে যে নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন আশা করি অন্য দেশে অন্য নীতি গ্রহণ করবেন না। আপনারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আর আমার দেশে চলেছে ধনতন্ত্রবাদ, আর

ধনতন্ত্রবাদের মুখপাত্রকে আপনারা দিতেছেন সার্টিফিকেট। আপনারা আমেরিকান সরকারের মতো নীতি বহির্ভূত কাজকে প্রশ্রয় দিতেছেন। দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণ আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। যেমন আমেরিকানরা নিজের দেশে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আর অন্যের দেশে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে ডিক্টেটর বসাইয়া দেয়।

আজ তো আমার দেখা হওয়ার কথা নাই, এর মধ্যে জমাদার সাহেব এসে বললেন, চলেন আপনার, 'সাক্ষাৎ'। তাড়াতাড়ি যেয়ে দেখি আমার স্ত্রী আসে নাই। তার শরীর অসুস্থ কয়েকদিন ধরে। ছেলেমেয়েরা এসেছে। ছোট ছেলেটা আমাকে পেয়ে কিছু সময় ওর মায়ের কথা ভুলে গেল। ছেলেমেয়েরা ওদের লেখাপড়ার কথা বলল। আমার মা খুলনায় আছে, অনেকটা ভাল। ছোটখাট অনেক বিষয় বলল। অনেক আবদার। আমার কষ্ট হয় কিনা! ছোট মেয়েটা আমার কাছে কাছে থাকে, যাতে ওকে আমি আদর করি। বড় মেয়েটা বলছে, আব্বার চুলগুলি একেবারে পেকে গেল। বড় ছেলে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। লজ্জা পায়। আমার কোম্পানির ম্যানেজার এসেছিল, ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করতে। বললাম যে, যারা আমাদের ব্যবসা দেয় তাদের আমার কথা বলতে, নিশ্চয়ই ব্যবসা দিবে। ছোট ছেলেটার, তার মার কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বললাম, তোমরা যাও না হলে ও কাঁদবে।

ছেলেমেয়েরা চলে গেল। দেখলাম ওরা যেতেছে। মনে পড়ল নিশ্চয়ই রেণুর শরীর বেশি খারাপ নতুবা আসতো। সামান্য অসুস্থতায় তাকে ঘরে রাখতে পারত না। জেলের ভিতর চলে এলাম আমার জায়গায়। আমি তো একা আছি, এই নির্জন ইটের ঘরে। আমাকে একলাই থাকতে হবে। চিন্তা তো মনে আসেই।

৩০শে জুন ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে হাঁটছিলাম। ৭ তারিখের হরতালের দিনে যে ছেলেগুলিকে ধরেছিল তার মধ্যে কয়েকটা ছেলেকে আমার কাছেই পুরানা ২০ সেলে রেখেছিল। নাস্তা নিতে বের হয়েছে। দু'টা ছেলে আমাকে দেখে বলছে, 'স্যার আমাদের সাজাও দেয় নাই যে খেটে খাবো, আবার জামিন নেওয়ারও

কেহ নাই। আমরা গ্রাম থেকে চাকরির জন্য এসেছিলাম।' বলুন তো এদের কি উত্তর দেব? ওরা কি বোঝে আমিও কয়েদি? শুধু কয়েদি নয় আলাদা করে রেখেছে, একাকী। কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম। মনে মনে বললাম, এ অত্যাচার আর কতদিন চলবে! দয়া মায়া কি এদের নাই! শাসকগোষ্ঠী বা সরকারি কর্মচারীদের কি ছেলেমেয়েও নাই যে এরা বোঝে না! যদি কেহ অন্যায় করে থাকে, বিচার করো তাড়াতাড়ি। এই জেলে অনেক লোক আছে যারা দুই তিন বৎসর হাজতে পড়ে আছে সামান্য কোনো অপরাধের জন্য। যদি বিচার হয় তবে ৬ মাসের বেশি সেই ধারায় জেল হতে পারে না। বিচারের নামে একি অবিচার! আমার মনের অবস্থা আপনারা যারা বাইরে আছেন বুঝতে পারবেন না। কারাগারের এই ইঁটের ঘরে গেলে বুঝতে পারতেন।

শরীরটা ভাল যেতেছে না। ভাল বইপত্র দিবে না, Reader's Digest পর্যন্ত দেয় না। মনমতো কোনো বই পড়তেও দিবে না। এইভাবে শাসন চলতে পারে না। এর ফলাফল ভয়াবহ হবে দেখেও এরা বোঝে না। ইংরেজ যাবার সময় যেমন তাদেরই তাবেদারদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছিল আর তা হবে না। একথা বুঝেও বোঝে না।

ঘরে চলে এলাম, জমাদার সিপাহি মেট পাহারা হৈ চৈ লাগাইয়া দিয়েছে। বড় সাহেব আসবে ডিগ্রি এলাকায়। আমাদের দেখতে আসেন, কিছু বলার থাকলে তিনি শোনেন। প্রায় দশটার সময় সদলবলে আসলেন আমার ঘরে, বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছি? খুব ভাল আছি। আমার কিছু বলার নাই। ঠিক করেছি কোনো কিছুই বলব না। একলাই জেল খেটে যাবো। যতদিন রাখতে হয় রাখুক, কিছুই আসে যায় না। জীবনে একলাই জেল খেটেছি অনেক দিন।

তিনি চলে গেলেন। আবার বই নিয়ে বসলাম।

দুপুরে কাগজ এলে দেখলাম সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ, নিখিল পাক সংবাদপত্র সমিতি ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত যুক্ত কমিটি অদ্য দৈনিক ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থার প্রতিবাদে আগামী ৫ই জুলাই একদিন প্রতীকী ধর্মঘট পালনের জন্য সংবাদপত্র শিল্প ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান

জানাইয়াছেন। ৫ই জুলাই সান্ধ্য পত্রিকা ও ৬ই জুলাই কোনো প্রভাতি পত্রিকা যাহাতে প্রকাশিত হতে না পারে সেই জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের গ্রেপ্তার ও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

নিশ্চয় এটা একটা শুভ সূচনা। কারণ আজ ইত্তেফাক ও ইত্তেফাক সম্পাদকের বিরুদ্ধে হামলা, কাল আবার অন্য কাগজ ও তার মালিকের উপর সরকার হামলা করবে না কে বলতে পারে! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে তো কিছুই নাই, এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা শুরু করেছে। পাকিস্তানকে শাসকগোষ্ঠী কোন পথে নিয়ে চলেছে ভাবতেও ভয় হয়! আজ দলমত নির্বিশেষে সকলের এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উচিত।

আজ জুন মাস শেষ হয়ে গেল।

১লা জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

ভোরবেলায় খবর পেলাম গত সন্ধ্যায় ১০ সেলে যেখানে মানিক ভাই, শামসুল হক, রফিক, মিজান, মোমিন, ওবায়েদ, হাফেজ মুছা সাহেব, সুলতান, হারুন রশিদ এবং বোধহয় রাশেদ মোশাররফ ও অনেককে রাখা হয়েছে—সেখানে গোলমাল হয়েছে তালাবন্ধ করার সময়। মানিক ভাই যেখানে আছেন কোনো গোলমাল সেখানে হতে পারে না, কারণ আমাদের কেহই তাঁর সামনে কোনো অন্যায় করতে যাবে না। সঠিক খবর কিছুই পাই নাই। সিপাহিদের মধ্যে আলোচনা হতেছে। কেহ কেহ বলে ১০ সেলের সাহেবদের কোনো দোষ নাই। আর কেউ বলে, সিপাহিদের সাথে গোলমাল শোভা পায় না নেতাদের। তারা হলো দেশের নেতা, দেশের জন্য জেল খাটছে। সিপাহি যদি বেশি কথা বলেও, তবুও চুপ করে থাকা উচিত।

প্রায় ১০ ঘটিকার সময় খবর পেলাম মিজানুর রহমানের ঘর যখন বন্ধ করতে গিয়াছে তখন মতিউল্লা নামে এক পুরানা সিপাহি তালাবন্ধ করে খটখট শব্দ করতে শুরু করে। টেনে দেখে, তালা ঠিক মতো বন্ধ হয়েছে কিনা। তাতে মিজান নাকি বলেছে, ডিউটি সিপাহিকে বলে দিবেন রাতে যেন আস্তে আস্তে তালা টেনে দেখে, কারণ আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। দু'ঘণ্টা পর পর রাত্রে পাহারা বদলি হয়। সিপাহি বলেছে জোরে জোরেই টানতে হয়। মিজানের

তালাবন্ধ হয়ে গিয়াছে। বাইরে মোমিন সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন 'বাড়ি কোথায় আপনার'? মোমিন সাহেবের রুম তখনও বন্ধ হয় নাই। এক দুই কথায় খুব ঝগড়া হয়েছে। আমাদের এরা নাকি সিপাহিদের মারতে যায়। মতিউল্লা এসে জেল কর্তৃপক্ষকে কিছু কিছু বাড়াইয়া বলে। আমাদের এরাও ডিআইজির কাছে দরখাস্ত করার জন্য কাগজ চেয়ে পাঠাইয়াছে। মহা গোলমাল! আমি সিকিউরিটি জমাদারকে ডেকে মানিক ভাইয়ের কাছে খবর পাঠাইয়া দিলাম এ নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি না করাই উচিত। 'ভদ্রলোকের কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়।' সিপাহিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোকই আমাদের ভক্তি করে, আমাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। আমার বিশ্বাস ছিল, মানিক ভাই যখন আছেন এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি হবে না। বিকালে খবর পেলাম চুপচাপই আছে আমাদের এরা। সিপাহিদের সাথে কোনো কথা নিয়ে আলোচনা করা উচিত না। ওরা হুকুম পায়, তামিল করে। আমাদের কিছু বলতে হলে, জেলার সাহেব, ডিপুটি জেলার বা ডিআইজি সাহেবকে বলাই উচিত। এদের সাথে কথা কাটাকাটি করা মোটেই উচিত হয় নাই।

আমাদের মধ্যে এরা অনেকেই নতুন জেলে এসেছে। আমার কাছে রাখলে কোনো কথাই হতো না, কিন্তু সরকার রাখবে না আমার কাছে কাহাকেও। যদি জেলের ভিতর কোনো 'বিপ্লব করে বসি!'

বিকালে মতিউল্লাকে ডেকে আমি বলে দিলাম, মনে কিছু না করতে। কারণ একে আমি জানি বহুদিন থেকে। একটু কথা বেশি বলে, মনটা খারাপ না।

আজ বৃষ্টি না হওয়াতে একটু ভালই লেগেছে। হাঁটাহাঁটি করে শরীরটাকে হালকা করতে চেষ্টা করেছি। রেণুর শরীর খারাপ। আমায় দেখতে আসতে পারে নাই। মনটা খারাপ লাগছিল।

পুরানা ২০ সেলের পাঁচ নম্বর ব্লকে চিত্ত সুতার ও রণেশ মৈত্র থাকেন। তাঁদের বাইরের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়–যদি আমার সাথে দেখা হয়ে যায়! সর্বনাশ, দেখা হলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে যে! দরজাটা খুলেছে খাবার দিতে, তারাও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখা হলো, দুই একটা কথাও হলো দূর থেকে কেমন আছেন? ভাল আছি। দরজা বন্ধ করতে হবে কারণ সিপাহির চাকরি থাকবে না, যদি বড় সাহেবরা আমাদের কথা বলতে দেখে।

মোস্তফা সরোয়ারের ভাই গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিল নারায়ণগঞ্জ মামলায়। সে পরীক্ষার্থী, বিএ পরীক্ষা দু'টা দিয়েছিল। আবার চার তারিখে পরীক্ষা। ওর নাম হাসু। আমি হাসু বলেই ডাকি। হঠাৎ খবর এল জামিন হয়ে গেছে, এখনি

যাবে। আমার সামনে দিয়েই যেতে হবে। দাঁড়িয়ে রইলাম। সে এসে গেল। বললাম, 'মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষা দিয়ো। তোমার ভাবীকে খবর দিও ইনকাম ট্যাক্স নোটিশের উত্তর আমার সাথে দেখা না করে যেন না দেয়। টেলিফোন করে দিও।'

আরও দুইটা ছেলে পরীক্ষার্থী পড়ে রইল। একজন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে—নাম খাজা মহীউদ্দিন। আর একজন অনুমতি না পেয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছে। কি করব? মনুষ্যত্ব যাদের মধ্যে নাই তাদের সম্বন্ধে কি লিখব?

২রা জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

আজ মিলাদুন্নবী। জেলখানায় কয়েদিদের ছুটি। বড় বড় কর্মচারীদেরও ছুটি। বড় সাহেবদের আগমন বার্তা নিয়ে কয়েদিরা আজ আর হৈ চৈ করছে না। কয়েকজন লোক নিয়ে আমার ফুলের বাগানের আগাছাগুলি তুলে ফেলতে শুরু করলাম। দেখলাম মিজানকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেছে জমাদার সাহেব—মিজানের দাঁতের ব্যথা দেখাবার জন্য। আজ আমাদের দলের একজনকে দেখলাম বহুদিন পরে। এক জেলে থাকি। বেশি হলে ২০০ হাত দূরে হবে। ওদের দশ সেল, আমার দেওয়ালের মাঝে ২৪ ফিট দেওয়াল। আমার ঘরটা দেওয়াল ঘেঁষে, ওদেরটা একটু দূরে। মধ্যে গরুর ঘর আছে। তবুও দেখা হওয়ার উপায় নাই। একজন আর একজনকে দূর থেকে শুভেচ্ছা জানান ছাড়া আর কিইবা করতে পারি!

আজ আইয়ুব সাহেবের মাস পহেলা বক্তৃতা পড়লাম। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে বলেন যে, 'মানুষের আবেগ প্রবণতা নিয়া খেলা করতে অভ্যস্থ এইরূপ একটি গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করিয়াছিল। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়া তাহারা এমন একটি কর্মসূচি চালু করতে প্রয়াসী হইয়াছিল যাহা দেশের বিভিন্ন অংশে কেবলমাত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষেরই প্রসার ঘটাইত। সরকার ধৈর্য সহকারেই এই সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ায় সরকার বাধ্য হইয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

তিনি বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত এবং জনগণ ভুল পথে পরিচালিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে।' তিনি এইজন্য আল্লাহ্ তায়ালাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ চিরদিনই যে অবিচ্ছেদ্য থাকবে, তা আমার পক্ষে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নাই। উভয় অংশের জনগণের সম্মুখে একই বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।' তিনি আরও অনেক কিছু বলিয়াছেন, দেশের অন্যান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব গোড়ায়ই গলদ করেছেন। যে কর্মসূচির কথা উনি আলোচনা করেছেন তার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করার কোনো কর্মসূচি নাই। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন নয় এবং যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম করা হয়েছিল তার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথা পরিষ্কার ভাষায় লেখা ছিল। তিনি সে সম্বন্ধে ভাবলেন না। আর যে গোষ্ঠীর কথা বলেছেন, তারা পাকিস্তান কায়েম করার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি যাদের নিয়ে শাসন করছেন তারা অনেকেই পাকিস্তানের আন্দোলনে শরীক তো হনই নাই, বৃটিশকে খুশি করার জন্য বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যদি সময় না পেয়ে থাকেন পড়তে, তাঁকে আমি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান—দুইটা রাষ্ট্র গঠন হওয়া সম্বন্ধে কিছু ইতিহাস দিতে চাই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যে অবিচ্ছেদ্য সে সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন চায়, কারণ ১৯ বৎসর পর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে এবং মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে এমন এক জায়গায় আনা হয়েছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম করা ছাড়া তাদের উপায় নাই। যখন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়ার কথা হয়েছে, তখনই এই একই কথা একইভাবে সকলের মুখ দিয়েই শুনেছি। তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সাময়িকভাবে অত্যাচার করে বন্ধ করলেও অদূর ভবিষ্যতে এমনভাবে শুরু হতে বাধ্য, যারা ইতিহাস পড়েন তারা তা জানেন। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি শাসকগোষ্ঠী যদি অত্যাচার করে দাবাইয়া দিতে চান তার পরিণতি দেশের জন্য ভয়াবহ হবে।

ভারতের মুসলমানরা যখনই তাদের অধিকারের জন্য দাবি করেছে তখন বর্ণ হিন্দু পরিচালিত কংগ্রেস তার বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছে, 'মুসলমানরা স্বাধীনতা চায় না'। মুসলমানরা ফেডারেল ফর্মের সরকার দাবি করেছিল, কিন্তু কংগ্রেস

এককেন্দ্রিক সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকল। মুসলমানরা বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হলে এই কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শাসন চালাতে পারে, এ জন্য ফেডারেল ধরনের শাসনতন্ত্র দাবি করল।

১৯২১ সালে মওলানা হজরত সোহানী যখন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'The fear of Hindu majority can be removed, if an Indian Republic was established on federal basis, similar to that of United States of America.'

ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া হলে যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানে মুসলমানরা শাসন করতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস এতে রাজি হলো না, যদিও এই বৎসর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টা খুব ভালভাবে চলছিল।

১৯২৪ সালে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে লাহোরে মুসলিম লীগের যে সভা হয় সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব করা হয়েছিল। তা এই, 'It envisaged that the existing provinces shall be united under a common government on federal basis, so that each province shall have full and complete provincial autonomy, the functions of the central government being confined to such matters only as are of general and common concerns.'

এই প্রস্তাবেও কংগ্রেস রাজি হতে পারলো না। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় কনফারেন্সে মতিলাল নেহেরুকে ভার দেওয়া হলো একটা রিপোর্ট দাখিল করতে, যাতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ রিপোর্ট আরও বিভেদ সৃষ্টি করল।

এর পরেই কলিকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হলো নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা ও তা গ্রহণ করার জন্য। মি. জিন্না তখন কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব দিলেন এবং দুনিয়ার বহুদেশের শাসনতন্ত্রও সেখানে উল্লেখ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর একটি সংশোধনী প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল না। তিনি চোখের পানি ফেলে বের হয়ে এসেছিলেন। মি. জিন্নাকে 'হিন্দু মুসলমানের মিলনের দূত' বলা হতো। এর পরেই ছোট ছোট যে দলাদলি মুসলমানদের

মধ্যে ছিল তা শেষ হয়ে গেল। স্যার মহম্মদ সফি ও মি. জিন্নার দল একতাবদ্ধ হয়ে ১৯২৮ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ডাকলেন দিল্লীতে। সেখানে তাঁদের পুরানা দাবি ফেডারেল সরকারের প্রস্তাব দিলেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের দাবি কি হবে সেগুলিও গ্রহণ করলেন। সেখানে তাঁরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এরপরেই জিন্না সাহেবের ১৪ দফা বের হলো। এতে ছিল, 'It pointed out that no constitution would be acceptable to muslims unless and until it is based on federal principles with residuary powers vested in the province.'

১৯৩০-৩১ সালে যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বিলাতে হয় তাতে ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই একই দাবি স্যার সফি করেছিলেন। এমনকি মওলানা মহম্মদ আলি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ১৯৩১ সালে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, 'মুসলমানদের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ফেডারেল শাসনতন্ত্র–যেখানে প্রদেশগুলি পাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।'

১৯৩৭ সালে কয়েকটা প্রদেশে কংগ্রেস শাসিত মুসলমানদের উপর ভাল ব্যবহার করা হলো না। আলোচনা হয়েছিল প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হউক। কংগ্রেস রাজি হয় নাই। তার পরেই ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগ গ্রহণ করে। যার ফলে আজ ভারতবর্ষ দুই দেশে ভাগ হয়েছে।

আজ যারা ৬ দফার দাবি যথা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করার দাবি বলে উড়াইয়া দিতে চায় বা অত্যাচার করে বন্ধ করতে চায় এই আন্দোলনকে, তারা খুবই ভুল পথে চলছে। ছয় দফা জনগণের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা মরার দাবি। এটাকে জোর করে দাবান যাবে না। দেশের অমঙ্গল করা হবে একে চাপা দেবার চেষ্টা করলে। কংগ্রেস যে ভুল করেছিল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ফেডারেল শাসনতন্ত্র না মেনে আমাদের শাসকগোষ্ঠীও সেই ভুল করতে চলেছেন। যখন ভুল বুঝবে তখন আর সময় থাকবে না। আমরা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করি, তবে আমাদের ন্যায্য দাবিও চাই, অন্যকে দিতেও চাই। কলোনি বা বাজার হিসেবে বাস করতে চাই না। নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার চাই।

৩রা জুলাই ১৯৬৬ ॥ রবিবার

সকালে বৃষ্টি হওয়ার পরে দিনটা একটু ভালই হয়েছে। রৌদ্র উঠেছে। বিছানাগুলি রৌদ্রে দেওয়া দরকার, তাই বের করে রৌদ্রে দিলাম।

মানিক ভাইকে বিজলি পাখা দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। বেচারা একটু আরামে ঘুমাতে পারবেন। মানিক ভাই কষ্ট সহ্য করতে পারেন। যে কোনো কষ্টের জন্য যে তিনি প্রস্তুত আছেন, আমি জানি। তবু তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না। জীবনে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। স্বাস্থ্য একবার নষ্ট হলে আর এ বয়সে ভাল হবে না। এই ভাবনাই আমার ছিল। ১০ সেল সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বে করেছি, সেখানেই আমার সহকর্মীদের রাখা হয়েছে শুধু কষ্ট দিবার জন্য।

আজ আর খবরের কাগজ আসবে না। মিলাদুন্নবীর জন্য বন্ধ। দিন কাটানো খুবই কষ্টকর হবে। আমি তো একাকী আছি, বই আর কাগজই আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজকে ডুবাইয়া রাখি। পুরানা কয়েকটা ইত্তেফাক কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলাম।

জেল কর্তৃপক্ষ যে মাছ আমাকে দিয়েছিল তা খাওয়ার অযোগ্য। ফেরত দিয়ে দিলাম। আমার কাছে সামান্য যা ছিল তাই পাক করতে বললাম। কোনোমতে খাওয়া দাওয়া সেরে বই নিয়ে বসলাম। দুপুর বেলা ঘুমের সাথে আমি রীতিমত যুদ্ধ করি। পড়তে পড়তে ঘুম এলে বাইরে যেয়ে একটু ঘোরাঘুরি করতেছিলাম দেখি যে চটকল ফেডারেশনের সেক্রেটারি আবদুল মান্নানকে নিয়ে যায়। শুনলাম বাজার আনতে গেটে নিয়ে যেতেছে। বাইরে গাছের নিচে বসলেই কাক মহারাজরা বদ কর্ম করে মাথা থেকে সমস্ত শরীর নষ্ট করে দেয়। জেলে কাকের উৎপাত একটু বেশি। কয়েকদিন পূর্বে একটা ধনুক বানাইয়াছি। ধনুকটাকে আমি 'বন্দুক' বলে থাকি। ইটের গুঁড়া দিয়ে কাক বাহিনীদের আমি আক্রমণ করলেই ওরা পালাতে থাকে। আবার ফিরে আসে। কিছু সময় কাক মেরেও কাটাইয়া থাকি।

বিকালে যখন বেড়াচ্ছিলাম দেখি ঢাকার ন্যাপ কর্মী আবদুল হালিমকে হাসপাতালে নিয়ে চলেছে। দুই দিন থেকে ওর জ্বর। নূতন ২০ সেলের ১ নম্বর ব্লকে হালিম ও আর চারজন থাকেন। খুব নিকটে হলেও দেখা বা কথা বলার উপায় নাই। দরজা অন্য দিক থেকে। আমি এগিয়ে যেয়ে ওর মাথায় হাত দিলাম, খুবই জ্বর। বললাম, 'হালিম তুমি যে দলই কর পূর্ব পাকিস্তানের

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তোমার দান আছে। ১৯৪৯ সালে তুমি আমার সাথে আওয়ামী লীগ করেছ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ। তোমার যদি কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় খবর দিও, লজ্জা করো না। তোমার ত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

সে হাসপাতালে চলে গেল। আমি মনে মনে ওর আরোগ্য কামনা করে বিদায় নিলাম।

একজন জমাদার সাহেব আমার এখানে ডিউটি দেয়। সিপাহির কাছ থেকে শুনলাম জমাদার সাহেব তার এক ছেলেকে এম. এসসি পড়াইতেছে। এবার পরীক্ষা দিবে। আমি তাকে ডেকে বললাম, 'ভাই খুব ভাল কাজ করেছেন। এত অল্প বেতন পেয়েও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।' বলল, 'স্যার, আমার ছেলেটাও ভাল। প্রাইভেট টিউশনি করে কিছু টাকা উপার্জন করে নিজের পড়ার খরচ চালাইয়া আমাকেও সাহায্য করে।' তার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হলো।

সূর্য অস্ত গেল। আমিও আমার নীড়ে ফিরে এলাম। দুই তিন দিন হলো রাতে তিন চার বার ঘুম ভেঙে যায়। আর আজে বাজে স্বপ্ন দেখি। শরীরটা ভাল না, পাইলস ও গ্যাস্ট্রিক কষ্ট দেয়।

৪ঠা জুলাই ১৯৬৬ ॥ সোমবার

রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম আড়াইটা বাজে। আমি উঠে বসে পাইপ ধরালাম। আপন মনে পাইপ টানতে আরম্ভ করলাম। মশারির বাইরে বসার কি উপায় আছে! মশক শ্রেণী সাঁড়াশির মতো আক্রমণ করে। তবে একটা গুণ আছে এই জেলখানার মশক শ্রেণীর, শূল বসিয়ে রক্ত খেতে থাকে চুপচাপ। একদিনের জন্যও 'বুনু বুনু' শব্দ শুনি নাই। তারা ডাকাডাকিতে নাই, নীরবে কাজ সারতেই পছন্দ করে। কয়েদিরা যেমন অত্যাচার সহ্য করে, মার খায়, সেল বন্ধ হয়, ডাণ্ডাবেড়ি পরে, হাতকড়ি লাগায়--প্রতিবাদ করার উপায় নাই, কথা বলার উপায় নাই। নীরবে সহ্য করে যায়। তাই বুঝি মশক বাহিনী বড় সাহেবদের খুশি করার জন্য শব্দ না করেই শূল বসাইয়া দেয়। জেলখানায় কত রক্ত খাবে? যত মশাই হউক, মশারিতো কয়েদিরা পাবে না। বোধ হয়

তিন হাজার কয়েদির মধ্যে দুই শত কয়েদি মশারি পায়। রাজবন্দি আর যারা ডিভিশন পায় তারাই মশারি পায়। প্রথম যখন এসেছিলাম মশার আমদানি এত ছিল না।

খবর পেলাম গত রাতে ৬১ জন বিড়ি শ্রমিককে বন্দি করে আনা হয়েছে। তারা কি অন্যায় করেছে জানি না। তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে। বিড়ির পাতা আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে প্রায় তিন চার লাখ শ্রমিক বেকার হয়েছে। তারা ও তাদের সংসারের সকলেই না খেয়ে দিন কাটাতেছে। সরকার পাতা বন্ধ করে দিলেন কিন্তু তাদের কাজের বন্দোবস্ত করার কথা চিন্তা করলেন না। সরকারের কোনো দায়িত্বও নাই বলে মনে হয়। আবার তাদের গ্রেপ্তার করাও শুরু হয়েছে। যারা জনগণের কাজের দায়িত্ব নিতে পারে না বেকার করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাদের নাই। জুলুম করেই চলেছে। সিরাজগঞ্জের এই সকল শ্রমিক লাট বাহাদুরের কাছে দাবি করে ভাতের পরিবর্তে লাঠির আঘাত ও টিয়ার গ্যাস খেয়েছে। গ্রেপ্তার চলেছে সমানে। বাড়িতে যেয়ে যেয়ে কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেল দিতে শুরু করেছে। আমার মনে হয় পাকিস্তানকে একটা কারাগার ঘোষণা করলেই ভাল হয়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে। জেলের মধ্যে সকলকে ভাত ও কাপড় দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। দেশটাকে জেলখানা ঘোষণা করে সকলের খাওয়ার ও থাকার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব নিলেই তো সব গোলমাল থেমে যায়। আর মায়ের সামনে কচি শিশুও না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে না। তোমাদের জুলুম যতই জোরে চলবে, গণআন্দোলনও ততই জোরে শুরু হবে। অত্যাচার চরমে পৌঁছলে, গণআন্দোলনও চরমে পৌঁছবে। দেখে খুশি হয়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নবাব কালাবাগ সাহেবের আমন্ত্রণক্রমে কয়েকজন সম্পাদক, মালিক এবং পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেছেন, যদি ৫ই জুলাই ধর্মঘট বন্ধ রাখা হয় তাহলে জনাব তফাজ্জল হোসেনের গ্রেপ্তার ও নিউনেশন প্রেসের বাজেয়াপ্তের ব্যাপারে একটা সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য তিনি চেষ্টা করতে রাজি আছেন, এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথেও আলোচনা করবেন। তাই সাংবাদিকরা ধর্মঘট স্থগিত রেখেছেন আগামী ২০শে জুলাই পর্যন্ত।

আমার মনে হয় একটা কিছু হবে, কারণ নবাব কালাবাগকে আমি জানি, তাঁর সাথে মতের মিল আমার না থাকলেও তিনি যা বলেন, করতে চেষ্টা করেন। নবাব

সাহেব ও আমি একসাথে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম। তিনি পূর্ব বাংলার গভর্ণর সাহেবের মতো ফালতু কথা বেশি বলেন না।

আজ থেকে ডন কাগজ আমাকে দেওয়া শুরু করেছে। তবে একদিন দেরিতে পাই। এতে আমার দুঃখ নাই, কাগজ যে দেয় এটাইতো ভাগ্যের কথা! যে লোকের পাল্লায় পূর্ব বাংলার লোক পড়েছে, সে কতদূর নিয়ে যায় বলা কষ্টকর।

বিকাল সাড়ে চারটার সময় ডেপুটি জেলার সাহেব এলেন। বললেন, কেমন আছেন? জমাদার সাহেবকে ডেকে যেন কি বললেন, তারপরই বাঁশি বেজে উঠল। পাগলা ঘন্টা, আর যায় কোথা! দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। কয়েদিরা যার যার ঘরে চলে গেল। তালাবন্ধ হয়ে গেল। ফৌজ নিয়ে বন্দুক নিয়ে সার্জেন্ট সাহেব ঢুকলেন সেল এরিয়ায়, যেখানে আমি থাকি। বন্দুকের গুলি হতে লাগল, ফাঁকা গুলি। আধ ঘন্টা পরে আবার ঘন্টা পড়ল, সব ঠিক আছে। একে জেলে 'মাস কাবারী' বলে। মাসে একবার করে কয়েদিদের ভয় দেখাবার জন্য এরকম করা হয়। আমরা তো ভয় পেয়ে বসেই আছি। আবার কেন বাবা!

জেলার সাহেব এলেন। তাকে বললাম, আপনার জেলে সাধারণ কয়েদিদের উপর জুলুম চলেছে, খাওয়া-দাওয়াও ভাল হতেছে না। আশা করি আপনি খেয়াল রাখবেন। বদনাম আপনাকেই মানুষ করবে। আর বদ দোয়াও করবে আপনাকে। জেলার সাহেব কয়েদিদের উপর নিজে কোনো অত্যাচার করেন না, সে আমি জানি।

৫ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

জমাদার ও সিপাহি সাহেবরা মুড়ি খেতে চায়। মুড়ি জেলখানার কয়েদিরা চোখেও দেখে না। মেটকে বললাম, মুড়ি—কাঁচা মরিচ ও পিঁয়াজ দিয়ে তৈয়ার কর। পূর্বেই আমি দেখাইয়া দিয়েছি কী করে তৈয়ার করতে হয়। নিজেও জানি কিছুটা। সাধারণ কয়েদিরা যারা আমার এখানে কাজ করে তাদের জন্যও বানাও। পাশের সেলে যে কয়জন জেল হতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি আছে তাদেরও দিতে হবে। খেয়েদেয়ে 'ডন' কাগজ পড়তে লাগলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক খবরই পাওয়া যায়।

বৃষ্টি নেমেছে ভীষণভাবে, আর থামতেই চায় না। মশারিটা সকালে ধোপা দফায় পাঠিয়ে দিয়েছি, রৌদ্র দেখে। এখন কী উপায় করি? আজ বোধ হয় মশক বাহিনীর আক্রমণ আমাকে নীরবে সহ্য করতে হবে।

মোনায়েম খান সাহেব আবার হুমকি দিয়েছেন। সাবধান! সত্য কথা কেহ লিখতে ও বলতে পারবা না। চাউলের দাম বেশি বাড়ে নাই–বেড়েছে কিছুটা, তবে ভয়ের কোনো কারণ নাই। অনেক সিপাহি ছুটি ভোগ করে বাড়ি থেকে এসেছে। তাদের কাছেও শুনলাম ৫০ থেকে ৬০ টাকাও দাম উঠেছে চাউলের মন। সত্য কথা চাপা দেওয়ার এই চেষ্টা কেন? আপনার সরকারের কী ক্ষতি হতেছে! চাউল তো আপনার গুদামে যথেষ্ট আছে, আর ভয় কি? ছেড়ে দেন বাজারে, অথবা রেশনিং প্রথা গ্রামে গ্রামে প্রচলন করুন। খাজনা আদায় বন্ধ করুন। বিনা পয়সায় কিছু চাউল গরিবদের মধ্যে বিলি করুন, কোনো গোলমাল থাকবে না।

কাগজগুলিকেও তিনি হুমকি দিয়াছেন। জনগণ বোধ হয় বেশি ভয় আর করবে না। বেশি বাড়লে ঝড়ে ভেঙে পড়ে। আপনার দিনও ফুরাইয়া এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বাড়ি এই সুযোগে করে রাখুন। সুবিধা হবে, না হলে অনেক বিপদে বোধ হয় পড়তে হবে ভবিষ্যতে।

আজ একজন জেল কর্মচারী আমাকে জেলের দুর্নীতির কথা বলেছিল। কিছুদিন পূর্বে একজন অর্থশালী লোককে এনেছিল জেল দিয়ে। তাদের ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। একজনের বেশি বয়স। আর যায় কোথায়? পানি আনতে হুকুম হলো, বেচারারা পারে না, কাঁদতে থাকে। তখন কয়েদির মধ্য থেকে কিছু দালাল এসে বলে, যদি কিছু টাকা দিতে পারেন, তবে ভাল কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। কোনো কষ্ট হবে না, বসে বসে লেখাপড়া করতে পারবেন বা হাসপাতালে রাখার বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। বেচারা বোকার মতো বলে, জেলখানায় টাকা পাব কোথায়? তখন ঐ দালালই বুঝাইয়া দেয়: একখানা কাগজ এনে দিবে, বাইরে তার লোকের কাছে লিখে দিতে হবে অমুকের সাথে দেখা করে টাকা দিয়ে যেতে; নতুবা বাঁচবো না। যাদের টাকা আছে তারা তো কোনোমতে জোগাড় করে এনে দেয়, আর যাদের নাই তাদের কোনো কিছু বিক্রি করে অথবা যেভাবে পারে জোগাড় করে দিতে হবে।

একবার টাকা দিলে আর উপায় নাই। টাকা পেয়ে কয়েকদিন ভালই থাকার বন্দোবস্ত করল। আবার জুলুম। জেল কর্মচারী বেচারা ভাল মানুষ। এসব পথে হাঁটে না। অনেক গল্পই আমার সঙ্গে করল। আমি তো এসব ঘটনা বহু জানি। কারণ কারাগার তো আমার পুরানা সাথী। এমন কি গরিব কয়েদিদেরও টাকা এনে দিতে হয় মহকুমা জেলগুলিতে। সে অনেক ইতিহাস, লেখা কষ্টকর। আবার অনেক ভদ্রলোক আছে সিপাহি জমাদারদের ভিতর, যারা না থাকলে কয়েদিরা জেল খাটতে পারত না। নিজেদের সামান্য বেতন থেকেও কয়েদিদের কিছু কিছু জিনিস এনে দেয়। আবার সাহায্যও করে আদরও করে।

বিকালে বৃষ্টি থামলে বের হলাম ঘর থেকে। ধনুক আছে কাকের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ওদের কিছু তাড়া করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দিন কাটাইয়া দিলাম।

৬ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

নাস্তা খেতে বসে দেখলাম, রুটি দুই টুকরা ছাড়া আর কিছুই নাই। বললাম, খেতে আমার ইচ্ছা নাই। কারণ সকালে চা খেয়েছি। কিন্তু মেট কি শোনে? খেতেই হবে কিছু। এক টুকরা রুটি আর জেলখানার একটা কলা খেয়ে নিলাম। জেলখানার কলা কেন বললাম প্রশ্ন আসতে পারে। কন্ট্রাক্টর কয়েদিদের জন্য আনে বাজারের সবচেয়ে ছোট কলা। কারণ যারা আপত্তি করবে, তারা আপত্তি করা দরকার মনে করে না।

গত কালের কাগজ নিয়ে বসলাম। আবার মেট এসে হাজির, 'আর কিছু খাবেন না? এতে চলবে কি করে?' বললাম, 'বাবা মাফ করো। তোমার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। শুধু খাই খাই।' কিছু সময় পরে মুড়ি নিয়ে এল। যে দুইটা ছেলে পরীক্ষা দিতেছে তাদের মধ্যে একজনের ভোর রাত থেকে বমি ও সকালে পাতলা পায়খানা হয়েছে। আমাকে খবর দিয়েছে একটা ডাবের দরকার। আমার কাছে ডাব ছিল, পাঠাইয়া দিলাম। আর ডাক্তারকে খবর দিতে বললাম। ডাক্তার সাহেব এলেন, ওষুধ দিলেন, বেচারা একটু সুস্থ বোধ করল এবং পরীক্ষা দিতে গেল। ভালভাবে পরীক্ষা দিক এটাই কামনা করলাম।

কাগজ এল। দেখি ইন্দোনেশিয়ার পিপলস কংগ্রেস আজ সুকর্ণকে আজীবন প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অপসারিত করিয়াছে, তবে তিনি আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই অন্যতম বিশাল রাষ্ট্রে আজ কমিউনিজম, লেনিনবাদ ও মার্কসবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। পিপলস কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সম্মতি দান করিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের বাড়াবাড়ির জন্যই আজ ইন্দোনেশিয়া এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হইয়াছে। তাড়াতাড়ি করে ক্ষমতা দখল করতে যেয়েই এই অঘটন ঘটাল, লক্ষ লক্ষ কম্যুনিস্ট কর্মীদের জীবন দিতে হলো। এখন গ্রেপ্তার ও অত্যাচার সহ্য করতে হতেছে। দুনিয়ার ডিক্টেটরদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। মনে হয় সুকর্ণকে আজ দয়া করে প্রেসিডেন্ট রাখা হয়েছে। কোনো ক্ষমতাই তাঁর নাই। তাঁর নিজের কথাগুলিকে নিজেরই হজম করতে হতেছে। আজ জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ব্যাংক ও অন্যান্য সঙ্ঘগুলির সদস্য হবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আবার সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে তাকে পড়তে হবে বলে মনে হয়।

বিকালে চা খাবার সময় সিকিউরিটি জমাদার সাহেবকে আসতে দেখে ভাবলাম বোধহয় বেগম সাহেবা এসেছেন। গত তারিখে আসতে পারেন নাই অসুস্থতার জন্য। 'চলিয়ে, বেগম সাহেবা আয়া।' আমি কি আর দেরি করি? তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি পরেই হাঁটা দিলাম গেটের দিকে। সেই পুরান দৃশ্য। রাসেল হাচিনার কোলে। আমাকে দেখে বলছে, 'আব্বা!' আমি যেতেই কোলে এল। কে কে মেরেছে নালিশ হলো। খরগোস কিভাবে মারা গেছে, কিভাবে দাঁড়াইয়া থাকে দেখালো। রেণুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুব জ্বরে ভুগেছ। এখন কেমন আছ'?

'পায়ে এখনও ব্যথা। তবে জ্বর এখন ভালই।'

বললাম, 'ঠান্ডা লাগাইও না'।

আমার চারটা ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে এসেছে। ছেলে দুইটাই বাসায় ফিরেছে। মেয়ে দুইটার একজন কলেজ থেকে, আর একজন স্কুল থেকে সোজা এসেছে। ছোট ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে কখন আমি গেটে আসবো।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মা, আব্বা, ভাইবোনদের খোঁজ-খবর নিলাম। মা ঢাকা আসতে চান না। এতদূর আসতে তাঁর কষ্ট হবে—কারণ অসুস্থ। আবার বয়সও হয়েছে। আব্বা বাড়িতে। তাঁরও কষ্ট হয় সকলের চেয়ে বেশি। একলা আছেন। আজ অনেক সময় কথা বললাম। সবই আমাদের সাংসারিক খবর এবং আমি কিভাবে জেলে থাকি তার বিষয়। বাচ্চারা দেখতে চায় কোথায় থাকি আমি। বললাম, 'বড় হও, মানুষ হও দেখতে পারবা।'

সময় হয়ে গেছে, 'যেতে দিতে হবে'। ফিরে এলাম আমার জায়গায়। হরলিক্স ও আম নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার জন্য না এনে বাচ্চাদের কিনে দেও তো।'

সন্ধ্যা হয়ে এল। ওদের বিদায় দিয়ে আমার স্থানে আমি ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম, আমার জন্য চিন্তা করে লাভ কি? তোমরা সুখে থাক। আমি যে পথ বেছে নিয়েছি সেটা কষ্টের পথ।

৭ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

নতুন বিশ সেলের দোতালায় একটা ব্লকে একজন কয়েদিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। একে 'জাল সেল' বলা হয়। একে তো সেল, তার উপর আবার জাল দিয়ে সামনেটা ঘেরা। ওকে একদিন আমি দেখেছি। আমার জায়গার কাছ দিয়েই দোতালার সিঁড়ি। চেহারাটা যে একদিন খুব ভাল ছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। লোকটার নাম নেছার খাঁ। আজ ১৭ বৎসর জেলে আছে। যাদের যাবজ্জীবন জেল হয় তাদেরও ১২/১৩ বৎসরের বেশি খাটতে হয় না। একে ১৭ বৎসর রাখা হয়েছে কেন? খবর নিয়ে জানতে পারলাম, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জেল-মন্ত্রী এসেছিলেন জেল তদারক করতে। আট সেলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তাকে যাতে সে মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে নালিশ করতে না পারে জেলের দুর্নীতি সম্বন্ধে। কারণ লোকটা বড় সাহসী, মুখের উপর সত্য কথা বলে দেয়। যখন মন্ত্রী সাহেব সেই সেলের পাশ দিয়ে যেতেছিলেন সে দেয়ালে উঠে চিৎকার করে বলেছিল, 'স্যার আমার নালিশ আছে'।

মন্ত্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই লোকটা?' তাঁকে বলা হয়েছিল লোকটা পাগল। তারপর মন্ত্রী সাহেব চলে যাওয়ার পরে যা ঘটবার তাই

ঘটল। তখনকার দিনের বড় সাহেবের হুকুমে জেলখানার পাগলাগারদ ৪০ সেলে এনে বন্দি করা হলো। এবং ঘোষণা করা হলো সে পাগল হয়ে গেছে। পাগলের তো কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। যতদিন ভাল না হবে এবং সিভিল সার্জন সাহেব সার্টিফিকেট দিয়ে সরকারের কাছে না লিখবেন ততদিন ছাড়া পেতে পারে না। এতদিন তাকে পাগল করেই রাখা হয়েছে, যদিও সে পাগল না। এভাবে রাখলে ভাল মানুষও পাগল হয়ে যায়। নতুন সিভিল সার্জন সাহেব এসে ঘোষণা করেছেন, সে পাগল না। তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে লিখেছেন। বোধ হয় শীঘ্রই মুক্তির হুকুম আসবে।

আমার কাছে খুবই খারাপ লাগল। আমাদের সরকারের সময়ই এই অত্যাচার হয়েছিল এজন্য লোকটা এখনও ভুগছে। এর পরেও আমি তিনবার জেলে এসেছি। কেহই এ ঘটনা আমাকে বলে নাই। আর বললেও কি করতে পারতাম? এখন যারা জেল কর্তৃপক্ষ আছেন তারা এদের ছাড়তে দেরি করেছেন। পাগল বলে মুক্তি দেবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হাতে নাই। মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে! যে ভদ্রলোক আমাদের সময় প্রমোশন পেয়েছিলেন, তিনি এই নীচু কাজটা করেছিলেন।

১১টার সময় ডিআইজি জনাব ওবায়দুল্লা দেখতে এসেছেন সেল এরিয়ায়। আমার কাছে আসলে তিনি দুই চার মিনিট বসেন। আজ অনেকক্ষণ বসলেন। হাদিস শরীফ নিয়ে আলোচনা করলেন। খানে দজ্জাল ইমাম মেহেদী আসবেন। ঈসা নবীও আর একবার আসবেন। এজ্জাজ, মাজুজও হাজির হবে। দুনিয়া প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে—আরও অনেক কিছু বলেন। আমিও দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, রসুলআল্লার জন্মের ১৪ শত বছর পর দুনিয়ায় কি হয় বলা কষ্টকর। তিনি যখন উঠলেন তখন আমি বললাম খানে দজ্জাল তো দুনিয়ায় এসেছে, ইমাম মেহেদীর খবর কি? তিনি বুঝলেন আমি কাকে ইঙ্গিত করলাম। হেসে দিয়ে বিদায় নিলেন, কোনো কথা আর বললেন না।

আমি আমার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং আর একবার চায়ের প্রয়োজন জানালাম। মুড়ি ও চা এসে হাজির হলো। যথারীতি মুড়ি নিধন করিয়া বই নিয়া বসলাম।

মনে মনে ভাবলাম, আজও দুনিয়ায় মানুষ অনেক আজগুবি কথা বিশ্বাস করে? বিশ্বাস না করে উপায় কি? কিল খাওয়ার ভয় আছে। যাক, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

৮ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

প্রাতঃভ্রমণ করছি এমন সময় হাসপাতালের দিকে চেয়ে দেখি শাহাবুদ্দিন চৌধুরী সাহেব তাকাইয়া আছেন। আমাকে হাত ইশারা দিয়ে দেরি করতে বলে হঠাৎ চলে গেলেন ভিতরে। তিনটা ছেলেকে কোলে করে কয়েকজন কয়েদি নিয়ে এল বাইরে। দেখলাম একজনের হাত কেটে ফেলেছে, একজনের বুকের কাছে গুলি লেগেছিল, আর একজন হাঁটতেই পারে না কোলে করেই রেখেছে। বাইরের হাসপাতাল থেকে এদের এনেছে। অত্যাচার করে, মারপিট করে, গুলি করে জখম করেছে। এদের জীবন শেষ করে দিয়েছে, তারপর আবার আসামি করে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে এসেছে। কি নিষ্ঠুর এই দুনিয়া! এরাই তো আমাদের ভাই, চাচা, প্রতিবেশী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায় হলে এদের বংশধররা সুযোগ সুবিধা পাবে। এদেরকে বাদ দিয়ে তো কেউ অধিকার ভোগ করবে না। যারা মৃত্যুবরণ করল আর যারা পঙ্গু হয়ে কারাগারে এসেছে, জীবনভর কষ্ট করবে আমাদের সকলের জন্যই। কেন এই অত্যাচার? কেনই বা এই জুলুম! অত্যাচার কতকাল চলবে!

মনকে শক্ত করতে আমার কিছু সময় লাগল। ভাবলাম সকল সময় ক্ষমা করা উচিত না। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু জালেমকে ক্ষমা করা দুর্বলতারই লক্ষণ। ইসলামে ঠিক কথাই বলেছে, 'ক্ষমা করতে পার ভাল না করতে পারলে, হাতের পরিবর্তে হাত, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু নিতে আপত্তি নাই।'

আজ আরও একটা ছেলেকে সাতাশ সেল থেকে নিয়ে এসেছে পুরানা বিশ সেলে। ম্যাট্রিক দেবে। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় বাড়ি। মাথায় আঘাত পেয়েছিল। ধরে নিয়ে ভীষণভাবে মারপিট করেছে। অনেকে জখম নিয়েই কারাগারে এসেছে। খাজা মহীউদ্দিন আমাকে তার পিঠটা দেখালো, এখনও দাগ রয়ে গেছে। তাকে ধরে এনে মেরেছে। শুনলাম ইপিআর-এর লোকগুলি এদের মারধর করে নাই। তারা বেঙ্গল পুলিশকে মিছামিছি গুলি করার জন্য জনসাধারণের সামনেই গালাগালি করেছে। এখনও বহুলোক জেলে আছে। নারায়ণগঞ্জে মামলায় এখনও গ্রেপ্তার চলছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই বাচ্চা

ছেলের দল। কি কষ্টেই যে এরা আছে, বলব কি? বলবার ভাষা নাই। একই কাপড় পরে জেলে এসেছে। দিনের পর দিন সেই কাপড় পরেই রয়েছে।

সন্ধ্যার সময় এক সিপাহি আমাকে বলল, 'দেশের কথা কি বলব স্যার! কয়েকদিন পূর্বে ফরিদপুরের একটা মেয়েলোক আমার এক বন্ধুর কাছে ১৩ দিনের একটা ছেলেকে ১০ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে গিয়াছে। এমনিই দিয়ে যেতে চেয়েছিল, বন্ধু ১০ টাকা দিয়ে দিল। কোনো কথা না বলে ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে সে চলে গেল। একটা কথাও বলল না। শুধু বলল, আমি মাঝে মাঝে দেখতে চাই ছেলেটা ভাল আছে।' আরও বলল, অনেক গ্রামের কচু গাছ ও গাছের পাতাও বোধ হয় নাই। বললাম, এইতো আইয়ুব খান সাহেবের উন্নয়ন কাজের নমুনা। মোনায়েম খাঁ সাহেবের ভাষায় চাউলের অভাব হবে না, গুদামে যথেষ্ট আছে। যে দেশের মা ছেলে বিক্রি করে পেটের দায়ে, যে দেশের মেয়েরা ইজ্জত দিয়ে পেট বাঁচায়, সে দেশও স্বাধীন এবং সভ্য দেশ! গুটিকয়েক লোকের সম্পদ বাড়লেই জাতীয় সম্পদ বাড়া হয় বলে যারা গর্ব করে তাদের সম্বন্ধে কি-ইবা বলব!

বাঙালি জাতটা এত নিরীহ, না খেয়ে মরে যায় কিন্তু কেড়ে খেতে আজও শিখে নাই। আর ভবিষ্যতেও খাবে সে আশা করাও ভুল। চুপ করে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম গ্রামের কথা, বস্তির কথা। গ্রামে গ্রামে আনন্দ ছিল, গান বাজনা ছিল, জেয়াফত হতো, লাঠি খেলা হতো, মিলাদ মাহফিল হতো। আজ আর গ্রামের কিছুই নাই। মনে হয় যেন মৃত্যুর করাল ছায়া আস্তে আস্তে গ্রামগুলিকে প্রায় গ্রাস করে নিয়ে চলেছে। অভাবের তাড়নায়, দুঃখের জ্বালায় আদম সন্তান গ্রাম ছেড়ে চলেছে শহরের দিকে। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ছোটবেলার কত কাহিনীই না মনে পড়ল। কারণ আমি তো গ্রামেরই ছেলে। গ্রামকে আমি ভালবাসি।

৯ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

ভিয়েতনামের হ্যানয় ও হাইফং-এ আবারও বোমাবর্ষণ করেছে আমেরিকা। জাতীয় পরিষদে একটা মুলতবি প্রস্তাব হ্যানয় ও হাইয়াং বোমাবর্ষণের ব্যাপার নিয়ে এনেছিল বিরোধী দল। স্পিকার নাকচ করেছেন, অন্য দেশের ঘরোয়া

ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা উচিত না বলে। কিন্তু বিশ্বশান্তি নিয়ে তো আলোচনা করা যায়। পাকিস্তান সরকারের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির নমুনা!

আইন মন্ত্রী জাফর সাহেব বলেছেন, সরকার উদ্বিগ্ন। চমৎকার কথা। আমি খুশি হয়েছিলাম এই মুলতবি প্রস্তাব এনেছিল বলে। দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখনই অত্যাচার করে, আওয়ামী লীগ তার প্রতিবাদ করে এবং নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদের দালালদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাইয়া যায়। চীন আজ বহুদিন পর্যন্ত শুধু হুমকি মেরেই চলেছে। কখন সাহায্য করবে? যখন ভিয়েতনামের জনগণ অত্যাচারে, নির্বিচারে গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে তখন বোধ হয় একবার যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে তাড়াতে না পারলে জনগণ শান্তির সাথে বাস করতে পারে না। এই সব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেও আজ আমেরিকার অনেক প্রগতিশীল মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। সুদূর মার্কিন দেশেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তবুও চক্ষু খুলছে না জনসন সরকারের।

আমাদের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তিনটা কাগজের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে। একটা সংবাদ, পূর্ব পাকিস্তানের কাগজ, আর দুইটা 'নওয়াই ওয়াক্ত' ও 'কোহিস্তান'—পশ্চিম পাকিস্তানের। প্রায় সকল কাগজকেই সরকার ছলে বলে কৌশলে নিজের সমর্থক করে নিয়েছে। যে দু'চারটা কাগজ এখনও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জনগণের দাবি দাওয়া তুলে ধরছে তাদের শেষ করার পন্থা অবলম্বন করেছে সরকার। ইত্তেফাক প্রেস তো বাজেয়াপ্ত। ঢাকার কাগজের মধ্যে মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান, পয়গাম, পাসবান সরকারের সমর্থক কাগজ। প্রথমোক্ত দু'টাই প্রেস ট্রাস্টের। ইত্তেফাক তালাবন্ধ। সংবাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে শেষ করার অবস্থা। পাকিস্তান অবজারভার তো 'যখন যেমন, তখন তেমন, হায় হোসেন, হায় হোসেনের দলে।' কখন যে আঘাত আসে বলা যায় না।

এক কথায় বাংলাদেশে বিরোধী দলের কোনো কাগজ থাকতে পারবে না। এই সমস্ত থেকে বুঝতে পারা যায় সরকার কোনদিকে চলেছে। এক দলীয় সরকার গঠন করার চেষ্টা করলেই তো ভাল হয়। এই সমস্ত অত্যাচার জুলুম করে লাভ কি? যারা পারবে গোপনে রাজনীতি করবে। আর যারা পারবে না চুপ করে সংসার করবে। দেশকে ধ্বংসের দিকে এরা নিয়ে চলেছে। ফলাফল ভয়াবহ হবে।

আজ সকাল থেকে আমি দূর্বা ঘাস কাটায় নেমে যাই। ঘাস কাটা মেশিন আনা হয়েছে। নতুন ঘাস কাটতে অসুবিধা হয়। আমি তদারক করতে থাকি আর কয়েদিরা কেটে চলেছে। ঝাড়ুদারদের দিয়ে পরিষ্কার করাই। আজ দিনটা কাজের মধ্যে থেকে ভালই লাগছিল। দুপুরে কাগজ পড়ে, আবার বিকালেও এই একই কাজ করে, একটা বাগান সুন্দর করে কেটে তৈরি করেছি। এর পরে যখন ঘাসটা আবার উঠবে তখন আরো সুন্দর হবে।

১০ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ রবিবার

আমি যেখানে থাকি তার সাথেই নূতন বিশ সেলের ২ নম্বর ব্লক। রবিবার ছুটির দিন গানের জলসা বসেছে। নূরু ভালই গান গায়।

আমি আরাম কেদারায় বারান্দার পাশে আরামে বসলাম, গান শুনব বলে। জেলের ভিতর আর একজন কয়েদি আছে, নাম বেলাল। ঢাকা শহরেই বাড়ি, ভাল গজল ও কাওয়ালি গান গায়। সে ফুলের বাগানের পাহারা, আমার বাগানে আজ কাজ করতে আসবে। ৯ টায় এসে সেও হাজির হয়। তার কাছ থেকেও কাওয়ালি শুনলাম কয়েকটা। এদের তবলা হলো এ্যালমুনিয়ামের থালা। থালা বাজাইয়া গান করে। বেলালের গলাটা একটু খারাপ হয়েছে কাওয়ালি গাইতে গাইতে। তার সুযোগ আছে, সব জায়গায় যাইতে পারে। তাই যেখানে যায় সিপাহি জমাদাররা ওকে ধরে কাওয়ালি শোনে। নূরুর বাংলা গান শুনলাম। খুবই সুন্দর গলা। তালও ঠিক আছে। ভাবলাম 'হতভাগা'টা জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে। জেলে পড়ে নানারকম অত্যাচার সহ্য করে আর জেলের খাওয়া খেয়েও গলাটাকে এখনও কিছুটা ঠিক রেখেছে। ধন্যবাদ দিতে হয়। গাইতে কষ্ট হয় বুঝতে পারি। শক্তি না থাকলে গান আসবে কোথা থেকে? তবুও বড় ভাল লাগল ওর গান শুনে। বিশেষ করে পল্লীগীতি ও চমৎকার গায়।

বেলাল বলে গেল, "স্যার কেবল 'পাহারা' হয়েছি। আপনার কাছে এসে কাওয়ালি গেয়েছি শুনলে কি আর রক্ষা আছে?" আমি ওকে রক্ষা করতে পারি? আমিও তো ওর চেয়েও 'সাংঘাতিক' কয়েদি! কেউ আমার সাথে কথা বলতে বা মিশতে পারবে না। একদম সরকারের হুকুম। বাগানে কাজ করতে এসেছিল তাই বোধ হয় একটু সুযোগ পেলাম ওর কাওয়ালি শুনতে।

আইয়ুব সাহেবের সরকারের শুভ সংবাদ, দেশের জন্য শুভ কিনা, বলা কষ্টকর। কনসর্টিয়াম ১৯৬৬-৬৭ সালে পাকিস্তানকে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মনে রাখা দরকার, এই ডলার সবই ঋণ নেওয়া হলো। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কপালে কি আছে আমরা জানি না, তবে সুদ সহ টাকা পূর্ব পাকিস্তানকেই বেশি ফেরত দিতে হবে।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসন শেষ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডান্ডা চালাইতে সক্ষম হইবেন। অবস্থা যে কি হবে! বোধ হয় শিক্ষিত সমাজ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। ভয় নাই, কলম ফেলে দিন। লাঠি, ছোরা চালান শিখুন। আর কিছু তেল কিনুন রাতে ও দিনে যখনই দরকার হবে নিয়ে হাজির হবেন। লেখাপড়ার দরকার নাই। প্রমোশন পাবেন, তারপরে মন্ত্রী হতেও পারবেন।

শুধু ভাবি, 'ব্যাপারটা কি হলো'! কোথায় যেতেছি!

১১ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ সোমবার

সকাল থেকেই মাথা ভার হয়ে আছে, ঠিক হয়ে বসতেই পারছি না। এই অবস্থায় অনেক সময় কাটাইয়া দিলাম বারান্দায়। ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে পড়ে রইলাম। কিছু খেতেও ইচ্ছা করছে না। প্রায় ১১টার সময় ডাক্তার সাহেব এলেন, বললাম আমার অবস্থা। তিনি বললেন রক্তচাপটা দেখতে হবে। রক্তচাপ আমার নাই (ব্লাড প্রেসার যাকে বলা হয়)। কোনোদিন তো ছিল না। দেখা যাক কি হয়! এই খুঁতখুঁতে ব্যারাম বেশি কষ্ট দেয়। যদি কিছু একটা হয় ভালভাবে হয়েই শেষ হয়ে যাওয়াই উচিত। চোখ বুজে থাকলে ভাল লাগে। মেট বার বার তাগিদ দিতেছে কিছু খাবার জন্য। সকালে তো কিছু খেয়েছি, আবার কি? হঠাৎ মেজাজটা খারাপ করে ফেললাম। পরে দুঃখিত হলাম। বললাম, ভাল লাগে না কিছুই খেতে। আমার বেগমের দৌলতে কোনো জিনিসের তো আর অভাব নাই। বিস্কুট, হরলিকস, আম, এমন কি মোরব্বা পর্যন্ত তিনি পাঠান। নিজে আমি বেশি কিছু খাই না, কারণ ইচ্ছা হয় না। আবার ভয়ও হয় যদি পেট খারাপ হয়ে পড়ে! আবারও একদিন

রক্ত পড়েছে। পাইলস ভাল হয়ে গিয়াছিল, আবার হলো। উপায় তো নাই। আমি একলাই শুধু ভুগি না কয়েদিরা প্রত্যেকই কোনো না কোনো ব্যারামে ভোগে। বিশেষ করে রাজবন্দিরা, কারণ এদের তো কোনো কাজ নাই। খাও শুয়ে থাক আর বদহজমে ভোগ, তারপর একটা একটা করে রোগে তোমাকে আক্রমণ করুক এইতো সরকার চায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাক। আরামপ্রিয় হয়ে উঠুক। বাইরে গেলে আর কাজ করতে পারবে না।

আজ পাবনার রণেশ মৈত্রের সাথে আমার হঠাৎ দেখা হলো। ল' পরীক্ষা দিতে পাবনা থেকে আনা হয়েছিল। দুই একদিনের মধ্যে চলে যাবেন এখান থেকে। বললাম, 'আপনার ছেলেমেয়ের কি খবর?' বললেন,' কি আর খবর, না খেয়েই বোধ হয় মারা যাবে। স্ত্রী ম্যাট্রিক পাশ। কাজ কর্ম কিছু একটা পেলে বাঁচতে পারতো; কিন্তু উপায় কি! একে তো হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, তারপর রাজবন্দি, কাজ কেউই দিবে না। একটা বাচ্চা আছে। বন্ধু-বান্ধব সাহায্য করে কিছু কিছু, তাতেই চালাইয়া নিতে হয়। গ্রামের বাড়িতে থাকার উপায় নাই।' মৈত্র কথাগুলি হাসতে হাসতে বললেন। মনে হলো তাঁর মুখ দেখে এ হাসি বড় দুঃখের হাসি।

সন্ধ্যায় তালা বন্ধ করার সময় বাইরের দরজাটা একটু খুলেছিল, তাই দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। আবার বললাম, 'পাবনা যাবেন বোধ হয়। বন্ধু মোশতাককে পাবনায় জেলে নেওয়া হয়েছিল। বোধ হয় সেখানেই আছে, কেমন আছে জানি না। তাকে খবর দিতে বলবেন।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বোধ হয় দুই তিন মিনিট হবে। এক জেলে থেকেও আমরা রাজনৈতিক বন্দি বলে একে অন্যের সাথে দেখা বা কথা বলতে পারি না। আমার সাথে তো কাহাকেও কথা বলতে দেয় না।

খবরের কাগজ এসেছে অনেক বেলায়। কোনো সংবাদই নাই। তবে আতাউর রহমান সাহেবের একটি বিবৃতি আছে খাদ্য সমস্যার উপর—মোনায়েম খাঁ সাহেব সরকারি প্রেস নোটের প্রতিবাদ করে। ঘরে বসে বিবৃতি দিয়ে চাউলের দাম কমানো যায় না। সক্রিয় কর্মপন্থা দরকার। সে সাহস জনাবদের নাই। বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়েই নেতা হয়ে থাকতে চান আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ।

১২ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

ভালই লাগে না, কি যে করব বুঝে উঠতে পারি না। মাথা ব্যথাটা এখন অনেক কমেছে। খবরের কাগজে পড়বার মতো কিছু থাকে না। একঘেয়ে সংবাদ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কি বললেন, কি করবেন, কোথায় গেলেন, কার সাথে দেখা করলেন, দেশের উন্নতি, অগ্রগতি, গুদাম ভরা খাদ্য, অভাব নাই, বিরাট বিরাট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে, কাজ শুরু হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু তথাকথিত মুসলিম লীগের নেতারা এক ঈমান, এক রাষ্ট্র, এক মুসলমান, এক দেশ, এক নেতা বলে সর্বক্ষণ গলা ফাটাচ্ছে। আবার কেহ কেহ বাঙালি মুসলমানদের পাকিস্তানের উপর আনুগত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেহ কেহ মুরব্বিয়ানাচালে দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেটও দিয়ে থাকেন। দুনিয়ায় নাকি পাকিস্তানের সম্মান এতো বেড়ে গেছে যে আসমান প্রায় ধরে ফেলেছে। নানা বেহুদা প্রশংসা, তবুও তাই পড়তে হবে। সময় যে কাটে না। ডন কাগজও দেখলাম, যদি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো ভাল খবর পাওয়া যায় নাই! ঐ একই প্যামফ্লেট। আমার তো মনে হয় সরকার বিরাট প্ল্যান নিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দেশে একদলীয় সরকার করতে চেষ্টা করবে। ভুল হবে এ চেষ্টা করলে। ভীষণ আত্মকলহ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হবে কেহ তা দমাতে পারবে না। আমাদের মতো রাজনীতিবিদরা অনেকে পিছনে পড়ে থাকবে। কারণ তালে তাল মিলায়ে চলতে পারবে না।

দুপুরে ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। কারণ মাথার ব্যথা যেন আর না হয়। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আধা ঘন্টার উপর হবে। উঠে আবার কাগজ নিয়ে পড়তে পড়তে সিকিউরিটি সিপাই এসে বলল, আপনার সাক্ষাৎ আছে, চলুন। বললাম, কে এসেছে। বলতে পারে না। ভাবলাম উকিল সাহেবরা এসেছেন। এডভোকেট রব সাহেব ও আবুল হোসেন সাহেব এসেছেন। তাঁদের সাথে আলাপ করতে করতে দেখি আরেকটা সাক্ষাৎ দিয়েছে আমার বেগমের সাথে। রব সাহেবকে বললাম, হাইকোর্টে রীট পিটিশন করতে– কেন মোশতাক, তাজউদ্দীন, নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতাদের মফস্বল জেলে আলাদা আলাদা করে রেখেছে? আর আমাকে কোন আইনের বলে Solitary confinement-এ রাখা হয়েছে! জেল আইনে দু' মাসের বেশি কাউকেও রাখতে পারে না। একাকী এক জায়গায় রাখা উচিত না। রব সাহেব আইন দেখে রীট পিটিশন করবেন বললেন। তারপরই আমার বেগম ও বাচ্চারা এল। হঠাৎ দেখা পাওয়ার অনুমতি পেল কি করে! রব সাহেব চলে গেলেন।

আমি কিছু সময় বাচ্চাদের সাথে আলাপ করলাম। মা'কে আব্বা খুলনা থেকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। অনেকটা ভাল এখন, তবে আপাততঃ ঢাকা আসবে না। রেণু বলল, কামাল খুব লেখাপড়া আরম্ভ করেছে। আগামীবারে ম্যাট্রিক দিবে। সকলকে মন দিয়ে পড়তে বলে বিদায় নিলাম। বেশি সময় কথা বলার উপায় নাই– ছোট্ট কামরা জেল অফিসের, বিজলি পাখা বন্ধ। ছোট্ট বাচ্চাটা গরমে কষ্ট পাচ্ছে। ছোট মেয়েটা স্কুল থেকে এসেছে। বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলে গেটে দাঁড়াইয়া ওদের বিদায় দিলাম। গেট পার হয়েও রাসেল হাত তুলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। বোধ হয় বুঝে গিয়েছে এটা ওর বাবার বাড়ি, জীবনভর এখানেই থাকবে!

অনেক খাবার নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যায় কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধবদের দিলাম। আবার রাতেও খাবার সময় আশে পাশে কিছু দিলাম, কারণ নষ্ট হয়ে যাবে।

রাতে আমার আব্বাকে স্বপ্নে দেখে জেগে উঠলাম। আব্বার চেহারা মলিন হয়ে গেছে বলে মনে হলো। ভোর রাতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবারও স্বপ্নে দেখি নবাবজাদা নছরুল্লাহ্ খানকে। অনেক বুড়া হয়ে গেছেন, দাঁড়ি পেকে গেছে। আর কিছুই আমার মনে নাই। উঠতে অনেক দেরি হলো ঘুম থেকে।

১৩ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

একই সমস্যা একই সমাধান, গুলি করা। ভারতবর্ষে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালাইয়া আটজনকে হত্যা করেছে। কয়েকশত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। জনসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলির ডাকে প্রতিবাদ দিবস পালন করতে যেয়ে গুলি খেয়ে জীবন দিল। শত শত কর্মী গ্রেপ্তার হলো। কংগ্রেস নেতারা সারাজীবন জেল খেটেছিলেন। গুলির আঘাত নিজেরাও সহ্য করেছেন। আজ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে তারাই আবার জনগণের উপর গুলি করতে একটুও কার্পণ্য করেন না। আমরা দুইটা রাষ্ট্র পাশাপাশি। অত্যাচার আর গুলি করতে কেহ কাহারও চেয়ে কম নয়। গুলি করে গ্রেপ্তার করে সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের উচিত ছিল গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তি চুক্তি করে নেওয়া। তখন পাকিস্তান ও

ভারত সামরিক খাতে অর্থ ব্যয় না করে দুই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারত। দুই দেশের জনগণও উপকৃত হত। ভারত যখন গণতন্ত্রের পূজারি বলে নিজকে মনে করে তখন কাশ্মীরের জনগণের মতামত নিতে কেন আপত্তি করছে? এতে একদিন দুইটি দেশই এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

রাশিয়া উত্তর ভিয়েতনাম সরকারকে সামরিক সাহায্য প্রেরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাশিয়া পূর্ব থেকেই অনেক সাহায্য দিয়াছে। আমেরিকানরা যতই নিজকে শক্তিশালী মনে করুন, রাশিয়া যখন হ্যানয় সরকারকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে তখন যুদ্ধে জয়লাভ কখনই করতে পারবে না। এর পরিণতিও ভয়াবহ হবে। একমাত্র সমাধান হলো তাদের ভিয়েতনাম থেকে চলে আসা। ভিয়েতনামের জনসাধারণ নিজেদের পথ নিজেরাই বেছে নিবে।

২৫শে আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হতে জনাব শোয়েব বিদায় গ্রহণ করে বিশ্বব্যাংকের চাকরি গ্রহণ করবেন। শেষ পর্যন্ত শোয়েব সাহেবকেও যেতে হলো। ভুট্টো সাহেবকে তাড়ানোয় চীনা লবীর লোকেরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নিশ্চয়ই আমেরিকানদের চাপে তাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। শোয়েব সাহেবকে তাড়াইয়া দেখালেন যে আমেরিকানদেরও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ধার ধারেন না। তাই আমেরিকা লবীর নেতা শোয়েবকেও তাড়াইলেন। এটা শোয়েবের সাথে পরামর্শ করেই করা হয়েছে বলে মনে হয়—জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তাকে জায়গা মতোই পাঠান হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা। মনে হয় চাকরী পাকাপাকিই ছিল। আমেরিকানদের দালালি করেছেন মন প্রাণ দিয়ে। পাকিস্তানকে বন্ধক দিয়েছেন তার একটু প্রতিদান তো জনাব শোয়েব পাবেনই!

সকালেই খবর পেলাম চটকল শ্রমিক ফেডারেশন সেক্রেটারি জনাব মান্নান জামিন পেয়েছে। আজই চলে যাবে, আমার সামনেই বিশ সেলে ছিল, সাধারণ কয়েদি করে রাখা হয়েছিল। রাতে ও মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। শুনতাম রাতভর জেগে বসে থাকত। ডিপিআর অস্ত্র নিক্ষেপ করে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখতেও পারতো। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত যেতে দিয়েছে। এত কষ্ট করার পরও মান্নানের মুখে হাসি দেখেছি। মোটেই ভয় পায় নাই। তার উপর আমার বিশ্বাস আছে—শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জন সে দিবে না, তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের মতো।

আজ বিকালে পাবনার রামললিতকে ঢাকা জেল থেকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়েছে।

বিকালে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। আমি বারান্দায়ই পায়চারী করতেছিলাম। বৃষ্টি কিছু কম হয়েছে, দেখা গেল রণেশ বাবু যেতেছেন। তাকে আদাব করে বিদায় দিলাম, আর বললাম, 'যদি পাবনা জেলে যান তবে বন্ধু মোশতাককে বলবেন, চিন্তা না করতে। আমাদের ত্যাগ বৃথা যাবে না।'

জমাদার সাহেব তালাবন্ধ করতে এলেন। বৃষ্টির দিন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে বিদায় হলেন।

১৪ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

১৭৮৯ সালের ১২ই জুলাই ফরাসি দেশে শুরু হয় বিপ্লব। প্যারি নগরীর জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করে। ১৪ই জুলাই বাস্তিল কারাগার ভেঙ্গে রাজবন্দিদের মুক্ত করে এবং রাজতন্ত্র ধ্বংস করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭ বৎসর পরেও এই দিনটি শুধু ফ্রান্সের জনসাধারণই শ্রদ্ধার সাথে উদ্‌যাপন করে না, দুনিয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

তাই কারাগারের এই নির্জন কুঠিতে বসে আমি সালাম জানাই সেই আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের, যারা প্যারি শহরে গণতন্ত্রের পতাকা উড়িয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ দুনিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণ এই দিনটার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারে না।

গতকাল পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি বলে অনেক ব্যক্তির ২২টা রীট আবেদন বাতিল করে দেন।

দেশরক্ষা বিধি বলে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দকে আটক রাখা হয়েছে। কতকাল এদের রাখবে কে জানে?

১। মিয়া মানজার বশীর, ২। খাজা সিদ্দিকুল হাসান, ৩। চৌধুরী কলিমুদ্দিন, ৪। মহম্মদ ইসমাইল, ৫। সিকান্দার হায়াত, ৬। সরদার মহম্মদ জাফরুল্লা, ৭। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, ৮। মালিক গোলাম জিলানী, ৯। খাজা মহম্মদ

রফিক, ১০। সরদার শওকত হায়াৎ, ১১। খাজা আহম্মদ সাফদার, ১২। চৌধুরী মহম্মদ হোসেন, ১৩। আবু সাঈদ এনতার, ১৪। সৈয়দ মকসুদ, ১৫। জনাব আবদুল আজিজ, ১৬। খলিফা শাহনেওয়াজ, ১৭। মাহবুব মোস্তফা, ১৮। কমর ইদরিস, ১৯। সালাউদ্দিন শেখ, ২০। হেলাল আহম্মদ শেখ এবং ২১। মাহমুদ আহমেদ সিন্ধী।

আজ ঢাকা জেলের ডিআইজি সাহেব কয়েদিদের দেখতে ভিতরে এসেছিলেন। আমাকেও দেখতে এসেছিলেন, কিছু সময় বসেছিলেনও। ধর্মকথা আলোচনা করলেন। বললাম, ইসলামের কথা আলোচনা করে কি লাভ? পাকিস্তানের নাম তো ইসলামিক রিপাবলিক রাখা হয়েছে। দেখুন না 'ইসলামের' আদর্শ চারিদিকে কায়েমের ধাক্কায় ঘুষ, অত্যাচার, জুলুম, বেঈনসাফি, মিথ্যাচার, শোষণ এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে যারা আল্লায় বিশ্বাস করে না, তারাও নিশ্চয়ই হাসবে আমাদের অবস্থা দেখে। দেখুন না রাশিয়ায় যেখানে ধর্ম বিশ্বাস করে না সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেষ্টা করছে, ঘুষ, শোষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষের বাঁচবার অধিকার স্বীকার করেছে।

গ্রেট বৃটেনে দেখুন, ন্যায়ের রাজ্য কায়েম করেছে। বেকার থাকলে সরকার থেকে ভাতা দেওয়া হয়–যে পর্যন্ত কাজের বন্দোবস্ত না করতে পারে। বৃদ্ধ অথবা অচল হয়ে পড়লেও পেনশন দেওয়া হয়। চিকিৎসার এবং ঔষধের জন্য এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। বাচ্চা হলে দুধ খাওয়ার জন্য সরকার অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, যাতে শিশু দুর্বল হয়ে না পড়ে। অন্যায়ভাবে কাহাকেও কারাগারে বন্দি করতে পারে না।

ডিআইজি সাহেব খুব ধর্মভীরু, বেশি সময় তিনিই বলেন, আমি শুনি। মাঝে মাঝে দুই এক কথা আমি বলি।

১৫ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

কি ব্যাপার, আমি যে ঘরে থাকি তা মাপামাপি করছে কেন? চল্লিশ ফুট লম্বা, চারফুট চওড়া, কয়টা জানালা, কয়টা দরজা সব কিছু লিখে নিতেছে জমাদার সাহেব। বললাম, ব্যাপার কি? সরকার জানতে চেয়েছে? আরও একটু লিখে নেন না কেন, দক্ষিণ দিকে ছয়টা জানলা, কিন্তু তার এক হাত দূরে চৌদ্দ ফুট

উঁচু দেওয়াল, বাতাস শত চেষ্টা করেও ঢুকতে পারে না আমার ঘরে। জানলা নিচে, দেওয়াল খুব উঁচু। উত্তর হলো, ও সব লেখা চলবে না। লেখুন না আর একটু–দেওয়ালের অন্য দিকে গরুর ঘর, পূর্বদিকে পনের ফিট দেওয়াল ও নূতন বিশ। ভয়ানক প্রকৃতির লোক–যারা জেল ভেঙে দুই একবার পালাইয়াছে তাদের রেখেছিল এখানে। আর উত্তর দিকে ৪০ সেল, সেখানে ৪০ পাগলকে রেখেছে। আর পশ্চিম দিকে একটু দূরেই ৬ সেল ও ৭ সেল, যেখানে সরকার একরারী আসামি রেখেছেন। আর এরই মধ্যে 'শেখ সাহেব'। তিনি বললেন 'ও বাত হামলোক নেহী লেখ্‌তে ছাকতা হায়, নকরি নেহি রহে গা।'

আধা ঘণ্টা পর দেখি সিভিল সার্জন সাহেব জেল ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। আমার কি কি রোগ হয়েছে দেখার জন্য। বললাম, ভালই আছি। পাইলস হয়েছে, কিছু কষ্ট দেয়। পেটটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়। আমাশা আছে। ঘুম একটু কম হয়। বসে থেকে মোটা হয়ে নিষ্কর্মা হয়ে যাবো আর কি! ওজন দেখলেন। ভাঙা একটা মেশিনে, সাত পাউন্ড নাকি বেড়েছে। ভালই, ভুঁড়ি হতে আর বেশি দেরি হবে না। যাহোক ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ভাবলাম 'সরকারও বোধ হয় আমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।' অথবা হাইকোর্টে বলতে হবে যে, দেখ কি ভালভাবে 'শেখ সাহেব'কে রেখেছি আমরা। কোনো কষ্ট দিচ্ছি না। আমাকে যে একলা এক জায়গায় কারও সাথে কথা বলতে বা দেখা করতে দেওয়া হয় না, সে কথা বোধ হয় চাপা দিবারই চেষ্টা করবেন। আজকালকার দিনে সত্য কথা একটু কমই বলা হয়। ওটা নাকি, 'নয়া ডিকটেটোরিয়াল রাষ্ট্রবিজ্ঞান'।

আজ সকালে আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারি মোহাম্মদউল্লাহ এডভোকেট সাহেবকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। ১০ সেলেই রেখেছে। ভদ্রলোক শুধু অফিসের কাজকর্ম দেখেন। কোনোদিন জীবনে একটা বক্তৃতাও করেন নাই, কোনো সভা সমিতিতে বেশি যেতেন না, কোনোদিন মফস্বলে যান নাই, সভা করতে। আজ ১৫ বৎসর নীরবে অফিসের কাজকর্ম করে থাকেন। মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবকে যখন গ্রেপ্তার করেছে তখন আওয়ামী লীগের কাহাকেও আর বাইরে রাখবে না। মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবের ছেলেমেয়েদের খুব কষ্ট হবে, কারণ অর্থাভাব কিছুটা আছে, উপার্জন না করলে চলে না। বড় নিরীহ ভদ্রলোক, কোনোদিন কিছু দাবি করে নাই। একবার জাতীয় পরিষদের

সদস্য পদের জন্য নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল মাত্র ১২ ভোটে পরাজিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে যক্ষা রোগে ভুগে, ভাল হয়ে গিয়েছিলেন। জেলে এসে আবার আক্রান্ত না হয়! একই কারাগারে থেকেও আমার সাথে দেখা হওয়ার উপায় নাই।

আজ দূর থেকে তিনজনের মুখ দেখলাম হাসপাতালে। হাফেজ মুছা, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী ও রাশেদ মোশাররফ হাসপাতালে এসেছে অসুস্থ হয়ে। আমার এখান থেকে হাসপাতালের দোতালায় দাঁড়ালে চেহারাটা দেখা যায়। তবে অনেক দূর, চিৎকার করে বললেও কথা শুনবে না।

১৬ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

১৯৬৬-৬৭ সালের নয়া আমদানী নীতি পড়লাম, বোঝা গেল প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র আমদানিকারকগণ টিকে থাকতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানিরা যাও দুই একজন কিছু কিছু আমদানি করত, তারাও শেষ হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

বৃহৎ ব্যবসায়ী গ্রুপ অবাধ আমদানি নীতির এই সুযোগে তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের সহায়তায় যথেষ্ট পরিমাণ আমদানী করে বাজার থেকে ক্ষুদ্র আমদানিকারকগণকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী সৃষ্টি করার আর একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার ক্ষুদ্র শিল্পপতিরাও এবার চরম আঘাত খেতে বাধ্য হবে। কারণ বোনাস ভাউচার দিয়ে আমদানি করে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় না পেরে তাদের কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য হবে তাদের শিল্পগুলি। জেলের মধ্যে বসে একথা চিন্তা করে লাভ কি? যার সারাটা শরীরে ঘা, তার আবার ব্যথা কিসের! গোলামের জাত গোলামি কর। আমি কারাগারে আমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে 'আরামেই' আছি! ভয় নাই, মাহমুদ আলি, জাকির হোসেন, মোনায়েম খান, আবদুস সবুর খান, মহম্মদ আলী এরকম অনেকেই বাংলার মাটিতে পূর্বেও জন্মেছে, ভবিষ্যতেও জন্মাবে।

দুপুর বেলা কাগজ পড়ছি। হঠাৎ হৈ চৈ করছে কয়েদিরা। কান খাড়া করে শুনলাম। কোর্টের ভিতর ঢাকা গ্যাং ডাকাতি মামলার ১০০ জনের মতো আসামির উপর ঘর বন্ধ করে টিয়ার গ্যাস মেরেছে। কয়েকজনের অবস্থা ভাল না। জেলগেট থেকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়াছে। আমার কাছেই আসামী

একজন থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছিল? সে কোর্ট থেকে এসেছে। বলল, 'সাত-আট বৎসর আমরা হাজতে। বিচার হয় না। মাঝে মাঝে কোর্টে নিয়ে যায়, আর ফিরিয়ে আনে। সিআইডিরা ইচ্ছা করেই দেরি করায়। একরারীদের উপর নির্ভর করে এই মামলা। তারা ইচ্ছামত কোর্টে যায়। আবার ইচ্ছা হলো না, সিআইডির পরামর্শে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাত-আট বৎসর হাজতে। আমাদের কি আর আছে! বাড়ি ঘর আত্মীয় পরিজন কিছুই তো নাই। যারা ছিল, না খেয়ে মরে গেছে বা কোথাও ভিক্ষা করে খেতেছে। আসামীদের পক্ষ থেকে হাকিমকে জানালো, 'স্যার আমাদের বিচার করুন। এখনও নিম্ন কোর্টে, এরপর হবে জজকোর্টে। কারণ ডাকাতি ও খুনী মামলার আসামিই বেশি। গ্যাং কেস আন্তঃজেলা মামলা।'

হাকিম সাহেবও নাকি সিআইডির উপর রাগ করেছে কয়েকবার। আজ যখন কোর্টে নিয়ে বলেছে, আজ মামলা হবে না, একরারী কোর্টে আসে নাই– তখনই এরা প্রতিবাদ করে বলেছে, আমাদের এখানেই রেখে দিন আমরা আর জেলে যাবো না। আর যায় কোথা! গ্যাস পার্টি এনে এরা কোর্টে যেখানে জালের বেড়ার মধ্যে ছিল সেখানে টিয়ার গ্যাস ছেড়ে দিল। কোনো দয়া মায়া নাই। বাকি মানুষ পালাবার পথ পায় নাই। অনেকে চক্ষু মেলতেই পারে না। অনেকে বমি করতে করতে বেহুঁশ হয়ে গেছে। ছয় জনের অবস্থা নাকি খারাপ। জেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ইনসাফ কি এদেশ থেকে একেবারেই উঠে গেল? যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। কিছু কিছু কর্মচারী এতো বেড়ে গেছে, মনে করে, যা ইচ্ছা করতে পারে। শুধু লাট সাহেবকে খুশি রাখতে হবে। ফলাফল যে শুভ হবে না সে বুঝি! তবে পাকিস্তানকে এরা কোথায় নিয়ে চলেছে! ভাবলাম সাত-আট বৎসর যদি একটা মামলা চলে তারপরে যদি শাস্তি হয় তবে অবস্থা কি হয়! ভুগতেই হবে তোমাদের। তোমরা যে 'স্বাধীন দেশের নাগরিক'! 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' তোমাদের রাষ্ট্র! ভুগতেই হবে তোমাদের 'দেশের খাতিরে'। ইহকালে কষ্ট করলে কি হবে, পরকালে অনেক কিছু পাবা। হুরপরি, চিন্তা নাই।

মুড়ি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কারাগারে। কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, আদা আর সরিষার তৈল দিয়ে একবার মাখালে যে কি মজা তাহা আমি তো প্রকাশ করতে পারি না। আমার না খেলে চলে না। সিপাহি জমাদার সাহেবরা যাদের ডিউটি পড়ে তারা মেটকে বলে চুপি চুপি মুড়ি খেয়ে নেয়। যদি বড় সাহেবরা দেখে! আমি দেখেও দেখি না, কারণ মেটকে বলে দিয়েছি মুড়ি চাইলে 'না' বলবা না।

আমি মুড়ি খেতে বসলেই আমার নেতা শহীদ সাহেবের কথা মনে পড়ে। আজ তুমি কোথায়? তোমার মানিক মিয়া, মুজিব ও কর্মীরা কারাগারে বন্দি, অন্যায়ভাবে জুলুম চলছে চারিদিকে, হাহাকার করছে দেশের লোকেরা। তোমার হাতে গড়া ইত্তেফাক আজ বন্ধ। পাকিস্তান আজ এতিম। জানি তোমার দোয়া আছে আমাদের উপরে। জয় জনগণের হবে, কিন্তু জনগণ তোমার সেবা পাবে না।

১৭ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ রবিবার

বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না। আমিও নাছোড়বান্দা। আজ আবার কয়েকজন কয়েদি নিয়ে বাদলা ঘাস ধ্বংসের অভিযান শুরু করলাম। অনেক তুললাম আজ। কয়েদিরা আজ তাদের কাপড় পরিষ্কার করবে। বেশি সময় রাখা যায় না, তাই তারা চলে গেল। আমি কিছু সময় আরও কাজ করলাম ফুলের বাগানে। তারপর পাইপ নিয়ে বই নিয়ে বসে পড়লাম। ভুঁড়ি হতে চলেছে আমার বসে থাকতে থাকতে। ভীষণ খারাপ লাগে ভুঁড়ি হলে। ব্যায়াম করবার উপায় নাই, হাঁটুতে বেদনা। বিকালে হাঁটাচলা করি, একলা কত সময় হাঁটা যায়! ভাল লাগে না, তাই আবার চুপ করে বসে থাকি।

খবর এল আওয়ামী লীগের আর এক নেতাকে নিয়ে এসেছে ধরে। বলল, জালাল সাহেব। বুঝতে বাকি রইল না মোল্লা জালালউদ্দিন, এডভোকেট। ঢাকার প্রায় সকলকেই আনা হয়েছে, জালালই প্রতিষ্ঠানের একটিং সেক্রেটারীর ভার নিবে। ওকেই সেক্রেটারী করার কথা আমি বলেছিলাম। অফিসটা বোধ হয় বন্ধ করতেই চায়। কেই বা চালাবে, সকলকেই তো গ্রেপ্তার করেছে। কয়েকজন তো এবড়ো হয়ে রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারবেন না। কর্মীদের অবস্থা কি হবে, কে চালাবে! টাকা কোথায় পাবে?

সরকার পিছন দরজা দিয়ে বন্ধ করতে চায়। লাভ হবে না। সকলকে এক সাথে আনছে না, এক একজন করে নিয়ে আসছে। সব কয়জন সেক্রেটারীকে নিয়ে এসেছে, এখন একমাত্র মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগম আছে।

জেলখাটা ও কষ্টকরা শিখতে দেও, এতে কর্মীদের মধ্যে ত্যাগের প্রেরণা জাগবে। ত্যাগই তো দরকার। ত্যাগের ভিতর দিয়েই জনগণের মুক্তি

আসবে। জালালকে ১০ সেলে রাখা হয়েছে। দেখা হবার উপায় নাই আমার সাথে। এখন আর আমাকে আঘাত করতে পারে না। চঞ্চলও আমি হই না। আমার কতগুলি বইপত্র আই বি Withheld করেছে। আমাকে খবর দিয়েছে Reader's Digest, টাইমস, নিউজউইক এবং 'রাশিয়ার চিঠি', কোনো বইই পড়তে দিবে না। পূর্বেও দেয় নাই। নভেল পড়তে দেয়। প্রেমের গল্প যত পার পড়ো। একজন রাজনীতিক এগুলি পড়ে সময় নষ্ট করে কি করে! কত অধঃপতন হয়েছে আমাদের কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারীর। রাজনীতির গন্ধ যে বইতে আছে তার কোনো বই-ই জেলে আসতে দিবে না। জ্ঞান অর্জন করতে পারব না, কারণ আমাদের যারা শাসন করে তারা সকলেই মহাজ্ঞানী ও গুণী!

আজ আমি বাবুর্চিগিরি করেছি। কলিজা দিয়েছিল, পাকাতে হবে। আমি ও বাবুর্চি দুইজনই প্রায় সমান। 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান।' তবু ধারণা করে নিয়ে পাকালাম, মনে হলো মন্দ হয় নাই। খাইলাম কিছুটা।

এক একটা মূল্যবান দিন চলে যেতেছে জীবনের। কোনো কাজেই লাগছে না। কারাগারে বসে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছি।

১৮ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ সোমবার

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই কারাগারে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হতেছে। নরসিংদী আওয়ামী লীগের দুইজন কর্মীকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। কাহাকেও আর বাইরে রাখবে না। তবুও দেখে আনন্দই হলো যে, ২৩ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেছে। কাজ করে যেতে হবে। ৬ দফা দাবির সাথে কোনো আপোষ হবে না। আমাদেরও রাজনীতির এই শেষ। কোনো কিছুই আওয়ামী লীগ কর্মীরা চায় না। তারা শুধু চায় জনগণ তাদের অধিকার আদায় করুক।

ন্যাপের সভাপতি নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সব দলকে এক করতে চান, আজ তাদের সভায় বলেছেন। নিম্নতম কর্মসূচি দিয়ে চুপচাপ তাঁহার নতুন বাড়ি বিন্নাচর গ্রামে যেয়ে বসে থাকলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে! সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন আওয়ামী লীগ শুরু করেন সেই সময় হতে এই ভদ্রলোক বহু খেলা দেখাইয়াছেন। মিস জিন্নাহ্‌র ইলেকশন ও অন্যান্য

আন্দোলনকে তিনি আইয়ুব সরকারকে সমর্থন করার জন্য বানচাল করতে চেষ্টা করেছেন পিছন থেকে। তাঁকে বিশ্বাস করা পূর্ব বাংলার জনগণের আর উচিত হবে না। এখন আর তিনি দেশের কথা ভাবেন না। 'আন্তর্জাতিক' হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আইয়ুব–ইয়াহিয়ার কাছে টেলিগ্রাম পাঠান আর কাগজে বিবৃতি দেন। বিরাট নেতা কিনা? 'আফ্রো-এশীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মজলুম জননেতা।' পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাঁচুক আর মরুক তাতে তাঁর কি আসে যায়! আইয়ুব সাহেব আর একটা ডেলিগেশনের নেতা করে পাঠালে খুশি হবেন। বোধহয় সেই চেষ্টায় আছেন।

নূরুল আমীন সাহেব সকল দলকে ডাকবেন একটা যুক্তফ্রন্ট করার জন্য। ৬ দফা মেনে নিলে কারও সাথে মিলতে আওয়ামী লীগের আপত্তি নাই। মানুষকে আমি ধোঁকা দিতে চাই না। আদর্শে মিল না থাকলে ভবিষ্যতে আবার নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিতে বাধ্য। সেদিকটা গভীরভাবে ভাবতে হবে। আইয়ুব সরকারের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা আনতে হলে আদর্শের সাথে যাদের মিল নাই তাদের সাথে এক হয়ে গোঁজামিল দিয়ে থাকা সম্ভবপর হতে পারে না। এতে আইয়ুব সাহেবের ক্ষতি কিছু করা গেলেও জনগণের দাবি আদায় হবে না। এত অত্যাচারের মধ্যেও ছয় দফার দাবি এগিয়ে চলেছে। শত অত্যাচার করেও আন্দোলন দমাতে পারে নাই এবং পারবেও না। এখন যারা আবারও যুক্তফ্রন্ট করতে এগিয়ে আসছেন তারা জনগণকে ভাওতা দিতে চান। যারা আন্দোলনের সময় এগিয়ে আসে নাই তাদের সাথে আওয়ামী লীগ এক হয়ে কাজ করতে পারে না। কারণ এতে উপকার থেকে অপকার হবে বেশি। কোনো নিম্নতম কর্মসূচির কথা উঠতেই পারে না। নিম্নতম কর্মসূচি হলো ছয় দফা। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ঠিক না হলে কোনো দাবিই আদায় হতে পারে না। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পূর্বে ঠিক হওয়া দরকার।

লোহার শিকগুলি ও দেওয়ালগুলি বাধা দেয় সন্ধ্যার পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা আকাশ দেখতে। বাইরে যখন ছিলাম খোলা আকাশ দেখার সময় আমার ছিল না। ইচ্ছাও বেশি হয় নাই। কারণ কাজের ভিতর নিজকে ডুবাইয়া রাখতাম।

১৯ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

আমীর মোহাম্মদ খান, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর– ইত্তেফাক প্রেস বাজেয়াপ্ত ও মানিক মিয়া সাহেবের গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। গতকালই আলাপ হওয়ার কথা ছিল। কি যে হয়েছে জানি না। সমস্ত সময়ই একই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতেছিল। এই জংলী আইন দিয়ে যদি এরা দেশ শাসন করতে থাকে, তবে ফলাফল কি হবে তা বলা কষ্টকর। একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনো কারণ না দর্শাইয়া বাজেয়াপ্ত করা, একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ও কাগজের মালিককে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা, কি জঘন্য প্রকৃতির কাজ হতে পারে তাহা চিন্তা করতেও ভয় পায় বলে মনে হয় না। কোনো খবরই আমরা পাইতেছি না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি এসেছেন। পূর্ব বাংলার ছোটলাট মোনায়েম খান সাহেবও রাওয়ালপিন্ডি গিয়াছেন। নবাব আমীর মোহাম্মদ খানও ওখানেই আছেন। কিছু একটা হবে বলে সকলেই আশা করছেন। নিশ্চয়ই মোনায়েম খান সাহেব বাধা দিবেন। হাইকোর্টেও মানিক ভাইয়ের রীট আবেদন চলছে। রায় স্থগিত রাখা হয়েছে। আমাদের জেলখানায় কিভাবে কাটছে ভুক্তভোগীই বুঝতে পারবেন। যাহা কিছু একটা ফয়সালা হয়ে গেলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

মওলানা ভাসানী সাহেব হঠাৎ সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, '৬ দফা সমর্থন করেন না। তবে স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন।' কারণ, তাঁর পার্টির জন্ম হয় স্বায়ত্তশাসনের দাবির মাধ্যমে। কাগমারি সম্মেলনের কথাও তিনি তুলেছেন। তিনি নাকি দেখে সুখী হয়েছেন যে, 'একসময়ে যারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করবার জন্য তাঁর বিরোধিতা করেছেন তারাই আজকাল স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে'। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গিয়াছেন, ভুলবার যদিও কোনো কারণ নাই, সামান্য কিছুদিন হলো ঘটনাটা ঘটেছে। খবরের কাগজগুলি আজও আছে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কর্মীরা আজও বেঁচে আছে। তারা জানে, বিরোধ ও গোলমাল হয় বৈদেশিক নীতি নিয়ে। সে গোলমালও মিটমাট হয়ে গিয়েছিল সম্মেলনের পূর্বের রাতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ। মওলানা সাহেবই সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে সমর্থন করে ওয়ার্কিং কমিটিতে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের ১২

জন সদস্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আছে, শহীদ সাহেবকে নিয়ে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে। ১২ জনের নেতা প্রধানমন্ত্রী, কেমন করে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করা সম্ভবপর হবে। শহীদ সাহেব যখন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন করে দিয়েছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাড়াতাড়ি সাধারণ নির্বাচন দিতে তখন আমরা বৈদেশিক নীতি নিয়ে আর হৈচৈ করবো না–যে পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন না হয়'। ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, 'পার্লামেন্টারী পার্টির হাতে ক্ষমতা দিতে। বৈদেশিক নীতি বিষয়ে পার্লামেন্টারী পার্টি যাহা ভাল মনে করে, করবেন।' সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাওয়ার পরে মওলানা সাহেব খবরের কাগজে অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, 'বৈদেশিক নীতির প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং ভাসানীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।' বৈদেশিক নীতির উপরে কোনো প্রস্তাবই নেওয়া হয় নাই, আর হবে না বলেও ঠিক করা হয়েছিল। মওলানা সাহেব জানতেন, কাউন্সিল সভায় তাঁর কোনো প্রস্তাবই পাশ হবে না। কারণ, সদস্যগণ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সমর্থন করতেন। কয়েক মাস পরে ঢাকার নিউ পিকচার্স হাউস ও গুলিস্তান সিনেমা হলের সম্মেলনে ভাসানী সাহেব মাত্র ৪৩ ভোট পেয়েছিলেন ৮৩৪ ভোটের মধ্যে। সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কোনো কথাই ওঠে নাই। কারণ, আওয়ামী লীগের যেদিন জন্ম হয় সেইদিন থেকেই স্বায়ত্তশাসনের বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করছে। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গেছেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে পার্লামেন্টে যখন শাসনতন্ত্র তৈয়ার হয়, তখন স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করে আওয়ামী লীগ প্রত্যেক দফায় সংগ্রাম করেছিল। এখনও কেন্দ্রীয় আইন সভার রেকর্ড থেকে তা পাওয়া যাবে। আর আমার কাছেও সেগুলি আছে। এমনকি জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বলেছিলেন, 'আমরা দুইটা দেশ; কিন্তু একটা জাতি তৈয়ার করতে হবে' (বাকি কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই)। সেইজন্যই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এই রকম শত শত এমেন্ডমেন্ট আবুল মনসুর আহমদ সাহেব, জহিরুদ্দিন, দেলদার সাহেব, খালেক সাহেব, আমি ও আরও অনেকে দিয়েছিলাম। স্বায়ত্তশাসন না দেওয়ায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবসহ আমরা সকলে ওয়াক আউট করেছিলাম।

আওয়ামী লীগ ভেঙে যখন ন্যাপ করা হলো, তখন বৈদেশিক নীতির উপরই হয়েছিল বলে এতদিন মওলানা সাহেব বলতেন, এবার নতুন কথা শুনলাম।

কিছুদিন বেঁচে থাকলে অনেক নতুন কথাই তিনি শোনাবেন। যেমন, তিনি কোনোদিনই মওলানা পাশ করেন নাই তবুও মওলানা সাহেব না বললে বেজার হন।

ন্যাপ কেন হয়েছিল? আদর্শের জন্য নয়। মওলানা সাহেবের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা খুব বেশি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেন নাই এবং তাঁর মধ্যে এতো ঈর্ষা দেখা দেয় যে, গোপনে ইস্কান্দার মির্জার সাথে হাত মিলাতেও তাঁর বিবেকে বাধে নাই। তিনি মির্জা সাহেবকে মিশরের নাসের করতে চেয়েছিলেন।

তাঁকে লোকে চিনতে পেরেছে, তাঁর অনশন আমার জানা আছে। নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি আইয়ুব সাহেবকে সমর্থন করবেন, না আন্দোলন করবেন তার কথায় বোঝা কষ্টকর। মওলানা সাহেব ৬ দফা সমর্থন না করলেও আন্দোলন চলছে, চলবে এবং আদায়ও হবে। জনগণ ৬-দফাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে।

২০শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

ইত্তেফাক প্রেস বাজেয়াপ্ত ও মানিক ভাইয়ের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কোনো ফয়সালা বোধহয় হবে না। মোনায়েম খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও নবাব কালাবাগ সাহেবকে বলেছেন পূর্ব বাংলার ৬ দফার আন্দোলন শেষ করে দিয়েছেন। আর কিছুদিন থাকলে একদম নস্যাৎ করে দিতে পারবেন। তাই হয়তো কোনো সমঝোতায় আসলেন না সরকার। খুব ভাল কাজ বোধহয় করলেন না। পরিণতি বেশি ভাল হবে বলে মনে হয় না। মানিক মিয়া রাজনীতি করেন না, তবে তাঁর নিজস্ব মতবাদ আছে। তাঁকে দেশরক্ষা আইনে বন্দি করা যে কত বড় অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ তা কেমন করে ভাষায় প্রকাশ করব। সাংবাদিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়েছে। কোনো একটা ভরসা বোধহয় পেয়ে থাকবেন। গতকাল থেকে আমার, তাজউদ্দীনের, খন্দকার মোশতাকের ও নূরুল ইসলাম চৌধুরীর রীট আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছে। জানি না কি হবে। তবে আমাদের ছাড়বে না সরকার, তা বুঝতে পারি। দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি পেলে, অন্য কোনো আইনে জেলে বন্দি করতে পারে। আর আমার কথা আলাদা। আটটা মামলা চলছে, আরও

কয়েকটা বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছে। দরকার হলে চালু করে দিবে। ধন্য তোমায় মোনায়েম খান সাহেব, ধন্য তোমার রাজনীতি!

নূরুল আমীন সাহেব ঐক্যবদ্ধ হতে অনুরোধ করেছেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকলেই দাবি আদায় হয় না। নূরুল আমীন সাহেব যাদের নিয়ে দল করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আন্দোলনের ও জেলে যাবার কথা শুনলে প্রথমে ঘরের কোণেই আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আর পিছন থেকে আন্দোলনকে আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। বেশি গোলমাল দেখলে পাসপোর্ট নিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদেশে রওয়ানা হয়ে যান। ৬ দফার দাবিতে যে গণঐক্য দেশে গড়ে উঠেছিল, যার জন্য হাসিমুখে কত লোক জীবন দিল, কত লোক কারাবরণ করছে, তখন এই 'ঐক্যবদ্ধ' করার আগ্রহশীল নেতারা কেহ ঘর থেকে বের হওয়া তো দূরের কথা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নাই। আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরা 'সংগ্রাম করবে'! অন্য কেহ বিশ্বাস করলে করতে পারে, কিন্তু আমি করি না। কারণ এদের আমি জানি ও চিনি।

জনসাধারণেরও আর 'নেতাদের ঐক্যের' ওপর বিশ্বাস নাই। জনগণের ঐক্যই প্রয়োজন। তাহা পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠেছে। শুধু সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলেই দাবি আদায় হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ সংগ্রামী দল, সংগ্রাম করে যাবে। আদর্শের মিল নাই, সামান্য সুবিধার জন্য আর জনগণকে ধোঁকা দেওয়া উচিত হবে না। নিম্নতম কর্মসূচিই ছয় দফা। সেই সঙ্গে রাজবন্দিদের মুক্তি, কৃষকদের পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, গরিব কর্মচারীদের সুবিধা ও খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে কর্মসূচি নেওয়া চলে। তবে ৬ দফা বাদ দিয়া কোনো দলের সাথে আওয়ামী লীগ হাত মেলাতে পারে না। আর করবেও না।

দিনভরই আমি বই নিয়ে আজকাল পড়ে থাকি। কারণ সময় কাটাবার আমার আর তো কোনো উপায় নাই! কারও সাথে দু'এক মিনিট কথা বলব তা-ও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। বিকালের দিকে একা একা হাঁটাচলা করি, আর দুনিয়ার অনেক কথাই ভাবি। অনেক পুরানা স্মৃতি আমার মনে পড়ে। বন্ধু-বান্ধবরা আমার সাথে কখন কিভাবে, কি ব্যবহার করেছেন তাও মনে পড়ে। কত মানুষ আমাকে ভালবেসেছে, কতজন আবার ঘৃণাও করেছে। একাকী বসে সে কথাও ভাবি। আমার যেমন নিঃস্বার্থ বন্ধু আছে, আমার জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে, তেমনই আমার শত্রু আছে, যারা হাসতে হাসতে জীবনটা নিয়ে নিতে পারে। আমাকে যারা দেখতে পারেন না, তারা

ঈর্ষার জন্যই দেখতে পারে না। জীবনে আমার অনেক দুঃখ আছে সে আমি জানি, সেই জন্য নিজেকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি। আমার মনে সবসময়েই বেশি পীড়া দেয় যখন আমার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চেহারা ফুটে উঠে আমার চোখের সামনে।

২১শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

জেল-হাসপাতাল থেকে আজ রাশেদ মোশাররফ ও শাহাবুদ্দিন চৌধুরীকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। তাদের শরীর একটু ভাল। তাদের দশ নং সেলে পাঠান হয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা আছে। দোতলা থেকে আমাকে ইশারা করে জানাল তারা আজ চলে যাবে হাসপাতাল থেকে। আমি ওদের দিকে একটু এগিয়ে যেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম। যখন রওয়ানা হলো আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটু চিৎকার করে বললাম 'চিন্তা করিও না, ত্যাগ বৃথা যাবে না। জনগণের দাবি জনগণই আদায় করবে।'

তারা আমার কাছে থাকার জন্য কত ব্যস্ত। অন্তত দূর থেকে হলেও আমাকে দেখতে পেত, এখন আর তা-ও হবে না। তাদের চোখে মুখে বেদনার ছাপ আমি দেখতে পেলাম। হাফেজ মুছা এখনও হাসপাতালে আছে। তার শরীরও ভাল না।

ভেবেছিলাম আজ রেণু ও ছেলেমেয়েরা দেখতে আসবে আমাকে। হিসাবে পাওয়া যায় আর রেণুও গত তারিখে দেখা করার সময় বলেছিল, '২০ বা ২১ তারিখে আবার আসব।' চারটা থেকে চেয়েছিলাম রাস্তার দিকে। মনে হতেছিল এই বোধহয় আসে খবর। যখন ৫টা বেজে গেল তখন ভাবলাম, না অনুমতি পায় নাই। আমিও ঘর থেকে বের হয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য হাঁটতে শুরু করলাম। ভীষণ গরমও পড়েছে। কিছু কিছু ব্যায়ামও করা শুরু করেছি। কারণ, রাতে ঘুম হয় না ভালভাবে। সন্ধ্যার পূর্বে কিছু বেগুন গাছ লাগালাম নিজের হাতে।

সৈয়দ শরীফুদ্দিন পীরজাদা নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। ইনি পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেল ছিলেন। এডভোকেট হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন। এই তো শাসনতন্ত্র! যখন ইচ্ছা মন্ত্রী, যখন ইচ্ছা বিদায়–প্রায় বাদশাহি কায়দায়। অনেক খেলা দেখলাম, আরও কত দেখতে হবে খোদাই জানে!

উত্তর ভিয়েতনাম ঘোষণা করেছে মার্কিন পাইলটদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিচার করা হবে না, বিচার করা হবে যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে। অন্যায়ভাবে অন্যের দেশে বোমাবর্ষণ করা—যুদ্ধ ঘোষণা না করে, এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করতে পারে কি করে?

বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সমীপে বিচারাধীন জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও আমার হেবিয়াস করপাস মামলার শুনানি গতকাল শেষ হয়ে গেছে। বিচারপতি উপরোক্ত মামলাগুলির রায় দান স্থগিত রেখেছেন। আবদুস সালাম খান সাহেব ও অন্যান্য এডভোকেটগণ মামলা পরিচালনা করেন।

২২শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

রাত্রে এমনিই একটু ঘুম কম হয়। তারপর আজ আবার দুইটা পাগল একসাথে চিৎকার করতে শুরু করে। একজন পাগল ৪০ সেল থেকে চিৎকার করতে থাকে। সে একটু চুপ করলে আর একজন ঠিক কুকুর, বিড়ালের মতো ডাকতে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। পরে মশারির ভিতর থেকে হেসে উঠি। কারণ, একজন পাগল সত্য সত্যই একদম কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে পারে। ভোররাতে একটু ঘুম লাগলে আবার শুরু হয় গণনা। জমাদার সাহেবরা গণনা করে দেখে রাত্রে কয়েদিরা ঠিক আছে কিনা। উঠেই পড়লাম বিছানা থেকে। উঠেই দেখি, আমার তিনটা মুরগির মধ্যে একটা মুরগির ব্যারাম হয়েছে। দুইটা ডিম দেয়। যে মুরগিটার ব্যারাম হয়েছে, সেটা দুই-চারদিনের মধ্যেই ডিম দিবে। মুরগিটা দেখতে খুব সুন্দর। ওকে ডেকে আমি নিজেই খাবার দিতাম। ওষুধ দেওয়া দরকার। প্রথমে পিঁয়াজের রস, তারপর রসুনের, যে যাহা বলে তাহাই খাওয়াইতে থাকি। দেখলাম, এত অত্যাচার করলে ও শেষ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে পানি, কিছু খাবার খেতে দেই ও মাথা ধোয়াইয়া দেই। বিকালের দিকে অবস্থা বেশি ভাল লাগে নাই। কি হয়, বলা যায় না।

মনটা খারাপ করে ছয় সেলের কাছে যেয়ে দাঁড়াই। হঠাৎ দেখি পায়ে ডান্ডাবেড়ি দিয়ে একজন হাঁটাচলা করছে। বললাম, 'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা

করলাম, 'আপনাকে ডান্ডাবেড়ি দিয়েছে কেন?' বলল, 'স্যার কোর্টে যেতে হবে, ৫৩ বৎসর জেল দিয়ে দিয়েছে, খাটতে হবে ২৫ বৎসর। আরও ১৯৩টা কেস চলছে। যাকে বলা হয় মুন্সীগঞ্জ 'গ্যাং কেস'। কতদিন জেল হয় খোদায় জানে! জেল থেকে একবার পালাইয়া ছিলাম। তারপর আবার এত বছর জেল, তাই ডান্ডাবেড়ি লাগাইয়া কোর্টে যেতে হয়।' বললাম, 'কেন ডাকাতি করে জীবনটা নষ্ট করলেন? আপনার কে আছে?' তখন তিনি বলতে শুরু করলেন, 'মা-বাবা ছোট বয়সে মারা যায়। এক ফুপাতো ভাই ডাকাত ছিলেন। বোধহয় নাম শুনেছেন, মুন্সীগঞ্জের ফেলু ময়াল। আমাকে ফুসলাইয়া ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। তখন আমার বয়স অল্প, কিছু টাকাও আমাকে দেয় ডাকাতি করে এনে। তারপর লোভ হয়, তার সাথেই ডাকাতি করা শুরু করি। তাকে ছাড়াও দু'একবার করেছি। মোট ১০-১২টা ডাকাতি করেছি সত্য, আজ বুঝতে পেরেছি কি ভুলই না জীবনে করেছি! আজ সেই ফেলু ময়াল, আমার ফুপাতো ভাই সরকারি সাক্ষী (একরারী) হয়েছে। সাত বৎসর মামলা চলেছে আরও কতকাল চলবে খোদাই জানে। তবে আমার জীবনের আর কি আছে? ৫৩ বৎসর জেল! কনফার্ম করে ২৫ বৎসর খাটতে হবে। এ মামলায়ও কয়েক বৎসর জেল হবে। মানে, জীবন এই জেলের সেলের মধ্যেই কাটাতেই হবে। আমার একটা মেয়ে আছে ও স্ত্রী আছে। আর কি কোনোদিন ওদের কাছে থাকতে পারব। মা-বাবা না মরে গেলে বোধহয় এ পথে আসতে হতো না। জীবনে বহু অন্যায় ও পাপ করেছি। খোদা কি মাফ করবে?' চুপ করে আবার বলল, 'মেয়েটা ও স্ত্রীর কি হবে? কিছু তো আর রেখে আসতে পারি নাই। বাহিরে গেলেও আর উপায় নাই। ডাকাতি না করলেও জেলে আসতে হবে। কারণ, দাগী খাতায় নাম উঠেছে। ডাকাতি হলেই পুলিশ আমাদেরই ধরে আনবে।' লোকটির নাম ছোটন। সুগঠিত শরীর, ছোটখাটো লোকটা। অটুট স্বাস্থ্য। মনে হয়, বুলেটও ঢুকবে না ওর শরীরে। কারাগারের এই নিষ্ঠুর ইটের ঘরেই জীবনটা দিতে হবে। তবুও আশা করে পঁচিশ বৎসর খেটে বের হতে পারবে। আবার মুক্ত বাতাস, মুক্ত হাওয়ায় বেড়াতে পারবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করবে। মানুষের আশার শেষ নাই। অনেকে বিশ বৎসর জেল খেটে বের হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে যেয়ে বেশিদিন বাঁচে না। এখানে বেশিদিন থাকলে ভিতরে কিছুই থাকে না, শুধু থাকে মানুষের রূপটা।

আজকাল রীতিমত বিকালে বেড়াই। হিসাব করে এক মাইল থেকে দুই মাইল হাঁটি। অল্প জায়গা কত বার হাঁটলে এক মাইল হয় হিসাব করে নিয়েছি, তাই ঘুরে ঘুরে হাঁটি।

২৩শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

সকালে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলাম। একজন কয়েদি সেলের দরজায় দাঁড়ায়ে আছে। কি যেন বলতে চায়। সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ লোকও আছে। রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও আছে। এই কয়েদিটি সাংঘাতিক প্রকৃতির। জেলের আইন-টাইন বেশি মানে না। অনেক মারধোর খেয়েছে জীবনে। লেখাপড়া কিছুটা জানে। দু'একটা ইংরেজিও মাঝে মাঝে বলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলতে চাও?' বয়স বেশি না, ২৫-২৬ হবে, তাই 'তুমি' বললাম। বলল, 'আপনি পূর্ব বাংলার কথা বলেন, আর আমাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও বলে থাকেন কিন্তু শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাই দায়ী না, পূর্ব পাকিস্তানিরাও দায়ী আছে।' আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। বললাম, 'আরও কিছু বলবে?' উত্তর দিল, 'না'। বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হলো, 'পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রাম নয়; পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সুখে থাকুক, আমরাও সেটা চাই। তবে, পশ্চিম পাকিস্তানে একদিকে শক্তিশালী শোষক শ্রেণী আছে, তাদের সাথে আছে একশ্রেণীর সরকারি কর্মচারী তাহারাই দায়ী। তারাই প্রথম থেকে ষড়যন্ত্র করেছে, ছলে বলে কৌশলে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে হবে। তাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিও আছে। পূর্ব বাংলার নেতারাও দায়ী অনেকখানি। আমাদের নেতারা ১৯৪৭ সাল থেকে বুঝেও স্বার্থের লোভে সুযোগ দিয়েছে শোষণ করতে। বাধা দেয় নাই, প্রতিবাদ করে নাই, যদি বড়কর্তারা বেজার হন! মন্ত্রীত্ব ও চাকরি যদি না থাকে! ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যারাই এই শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের খুশি করার জন্য, তাহাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। এদের দিয়েই স্বায়ত্তশাসনের দাবি, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগে বাধা সৃষ্টি করেছে। এরা বুঝেও বুঝতে চাইতো না। এমনকি

দু'একজন উর্দু হরফে বাংলা লেখার জন্য প্রচার করে বেড়াতো। যখন নৌ-ঘাঁটি চট্টগ্রামে চেয়েছি তখন কেবলমাত্র মন্ত্রীত্ব রক্ষা করার জন্যই এরাই বাধা দিয়েছে বেশি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী বুঝলো এবার বোধহয় আর শোষণ করা চলবে না, তখন আবার ষড়যন্ত্র করল সেই লোকগুলিকে দিয়ে–যারা ইলেকশনের পূর্বে হক সাহেবের মাথায় চেপে, আওয়ামী লীগের কাঁধে পা রেখে ইলেকশনে পার হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ হক সাহেবকে ব্যবহার করল এরা। যখন দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী শাসনতন্ত্র তৈয়ার করতে শুরু করল, আওয়ামী লীগের সদস্যরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে ভিতর ও বাহিরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করল, তখন এই বাঙালিদের ভোট দিয়ে আমাদের দাবিকে ভোটে পরাজিত করে নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করল। তখনও যদি বাঙালিরা এক হতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসন দাবি আদায় করতে পারতাম। আজও যে আমাদের ওপর জুলুম হচ্ছে–মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) সাহেব যদি আইয়ুব সাহেবের হাতে মন্ত্রীত্বের লোভে ধরা না দিতেন, তবে অনেকগুলি দাবি আদায় হতো। আজও দেখুন, আওয়ামী লীগ যখন ৬ দফার দাবি তুলল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তখন এই বাঙালিরাই বেশি বাধা দিতেছে। মোনায়েম খাঁ সাহেব গভর্নর আছেন, কে তাকে তাড়াচ্ছে? তিনি চরম অত্যাচার করে চলেছেন। আমাদের গ্রেপ্তার, ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ, নিউনেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত, তার মালিককে গ্রেপ্তার, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয় গুলি করতে একটুও মনে বাধলো না তার। কাদের গ্রেপ্তার করছে? কাদের গুলি করে হত্যা করা হলো? কে বা কারা শত শত ছাত্রের জীবন নষ্ট করল? তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিশ্চয়ই আসে নাই। যদি এই স্বায়ত্তশাসনের দাবি কৃতকার্যতা লাভ করে, তবে যারা অত্যাচার করল, তাদের ছেলেমেয়ে বংশধররা তার সুবিধা ভোগ করবে কিনা? যারা জীবন দিল তাদের বংশধররাই কি শুধু ভোগ করবে? আমাদের দুঃখের জন্য আমরাই দায়ী বেশি। আমার ঘর থেকে যদি চুরি করতে আমিই সাহায্য করি সামান্য ভাগ পাওয়ার লোভে তবে চোরকে দায়ী করে লাভ কি?'

এই সব কথা বলতে বলতে জমাদার চলে এল, আর সিপাহিও এগিয়ে এল। কয়েদিটা তাড়াতাড়ি সেলে চলে গেল। আমি চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে আবার খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলাম।

বিকালে জেলার সাহেব এলে তাকে বললাম, 'তিনি যেন ১০ সেলের আওয়ামী লীগের লোকদের জন্য এক জায়গায় পাক করার ব্যবস্থা করেন। ১/২ ওয়ার্ডে, সেখানে আরও ডিপিআর আসামি আছে তাদের পাকের বন্দোবস্ত আলাদা করেছে। তারা ডিপিআর-এর বন্দি। ১/২ ওয়ার্ডের রাজবন্দিরা মনে করবে কি? পূর্বে এক জায়গায় পাক হতো। যদি আলাদা পাকের বন্দোবস্ত করতে হয়, তবে যেখানে তাদের রাখা হয়েছে সেখানেই করুন, সেটাই তো আওয়ামী লীগের রাজবন্দিদের দাবি ছিল। তারা তো এক জায়গায় দুই পাক করতে বলে নাই। ১/২ খাতার রাজবন্দিরা নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছে। মনে করবে, সহকর্মীদের কি করে আলাদা পাক করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে?'

জেলার সাহেব বললেন, 'এটা তো আমি চিন্তা করি নাই। নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। কিন্তু করব কি? জায়গা তো নাই। আপনাদের তো জেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় রাখা হয় না। ১০ সেলের কাছেও কোনো পাকের বন্দোবস্ত নাই।' বললাম, 'আমাদের কপাল! সকলের চেয়ে খারাপ জায়গায় আওয়ামী লীগারদের রাখা হবে, যেমন আমাকে একলাই থাকতে হবে। কাহাকেও দিবেন না আমার কাছে।' জেলার সাহেব চুপ করে থাকলেন। আমি জানি, এদের বলে কোনো লাভ নাই। নীচতার সাথে যুদ্ধ করতে হলে নীচতা দিয়েই করতে হয়, তাহা যখন পারব না তখন নীরবে খোদার ওপর নির্ভর করেই জেলখাটতে হবে। বিদায় নিয়ে জেলার সাহেব চলে গেলেন।

আমার মুরগিটা মারা গেছে। অনেক ওষুধ খাইয়েছি। বেচারার খুব কষ্ট হতেছিল, ভালই হলো। আমার একটু কষ্ট হলো। মুরগিটাকে আমার খুব ভাল লাগত। ওর হাঁটাচলার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য ছিল।

২৪শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ রবিবার

আব্বার চিঠি পেলাম আজ সকালে। আমি যখন চিঠি পড়ি একজন কয়েদি পাহারার, লেখাপড়া জানে, জিজ্ঞাসা করল, 'চিঠি কি আপনার আব্বা লিখেছেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি বুঝলে কেমন করে?' বলল, 'দেখলাম লিখেছেন, 'বাবা খোকা'। বাবা ছাড়া একথা আর কে আপনাকে লেখতে পারে!' আমি হেসে উঠলাম এবং বললাম, 'বাবা-মায়ের কাছে আজও আমি

'খোকা'ই আছি। যতদিন তারা বেঁচে থাকবেন ততদিনই আমাকে এই বলেই ডাকবেন। যেদিন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন আর কেহই এ স্নেহের ডাকে আমাকে ডাকবে না। কারণ এ অধিকারই বা কয়জনের আছে! আমার ৪৫ বৎসর বয়স, চুলেও পাক ধরেছে। পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাবা আমি, তথাপি আজও আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে বোধহয় 'সেই ছোট্ট খোকাটি'—এখনও মায়ের ও আব্বার গলা ধরে আদর করি, আমার সাথে যখন দেখা হয়।

আমার বাবা খুব শান্ত প্রকৃতির লোক। সকল সময়ই গাম্ভীর্য নিয়ে থাকেন। তাঁকে আমরা ভাইবোনরা ছোট্টকালে ভালবাসতাম এবং ভয়ও পেতাম। আমার মা আমাদের না দেখলেই কাঁদতেন। তাঁর মধ্যে আবেগ খুব বেশি। কিন্তু আমার বাবার সহ্যশক্তি অসম্ভব। জীবনে মুখ কালো করতে আমি দেখি নাই। বোধহয় একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম বলে বাবা আমাকেই খুব বেশি স্নেহ করতেন। আব্বা এক জায়গায় লিখেছেন, 'তোমার গত ১৯/৬/৬৬ এবং ১/৭/৬৬ তারিখের চিঠি দুইখানা গতকাল পাইয়া তোমার কুশল জানিতে পারিলাম। তবে আমাদের জন্য যে সব সময় চিন্তিত থাক তাহাও বেশ বুঝিলাম। কখনও আমাদের জন্য চিন্তা করিবা না, খোদার মর্জিতে আমাদের মতন সুখী লোক বোধহয় নাই; থাকিলেও খুব কম। আমার সহ্যশক্তিও আছে, বিপদে আপদে কখনও বিচলিত হই না, তাহা তোমার ভালভাবে জানা আছে।'

বারবার আমার আব্বা ও মা'র কথা মনে পড়তে থাকে। মায়ের সাথে কি আবার দেখা হবে? অনেকক্ষণ খবরের কাগজ ও বই নিয়ে থাকলাম কিন্তু মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারি না, ভালও লাগছে না। অনেকক্ষণ ফুলের বাগানেও কাজ করেছি আজ। মনে মনে কবিগুরুর কথাগুলি স্মরণ করে একটু শান্তি পেলাম।

'বিপদে মোরে রক্ষা করো

এ নহে মোর প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

দিনের আলো নিভে গেল, আমিও আমার সেই অতি পরিচিত আস্তানায় চলে গেলাম।

২৫শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ সোমবার

শরীরটা খারাপই হয়ে চলেছে। বসে থাকার জন্যই বোধহয় খুবই দুর্বল লাগে। আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাতে জনগণকে অনুরোধ করেছে—যে পর্যন্ত ৬ দফার দাবি আদায় না হয়। যদিও শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে চলেছে আওয়ামী লীগ, তথাপি সরকার অত্যাচার করে চলেছে। গুলি হলো, গ্যাস মারল, শত শত কর্মীকে জেলে দিল, বিচারের নামে প্রহসন করল, কত লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে কে তা বলতে পারে? সরকার নিজেই স্বীকার করেছে ১১ জন মারা গেছে ৭ই জুনের গুলিতে। আমরা পাকিস্তানকে দুইভাগ করতে চাই বলে যারা চিৎকার করছে তারাই পাকিস্তানের ক্ষতি করছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া উচিত। তারা আলাদা হতে চায় না। পাকিস্তান একই থাকবে, যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া হয়। ইংরেজ কত লোককে হত্যা করেছিল কিন্তু দাবাইয়া রাখতে পারে নাই। এই দেশে কত ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছিল। অনেকেরই সে কথা মনে আছে—গোপীনাথ সাহা, নির্মল, জীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, তারকেশ্বর আরও কত লোককে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিল। তবু আন্দোলন দাবাতে পারে নাই। আন্দোলন আরও জোরে চলেছিল। আমরা যদিও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, তথাপি ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছিল ঐ পথ। এমন দিন এসেছিল ইংরেজ সাহেবরা ঘর থেকে বের হতেও ভয় পেত।

আমি জানি আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে, তাদের উপর অত্যাচার করা কোনো মতেই উচিত হতেছে না। 'সরকার বলে দিলেই তো পারে, তোমরা রাজনীতি করতে পারবা না।' আমরা চিন্তা করে দেখতাম রাজনীতি করব, কি করব না? মার্শাল ল'-এর সময় তো আমরা রাজনীতি করি নাই। চুপচাপ ছিলাম, কারণ রাজনীতি তখন বেআইনী ছিল। আজ দিন যে কিভাবে কেটে গেল আমি জানি না।

২৬শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

আজ নিশ্চয়ই 'দেখা'। ছেলেমেয়ে নিয়ে রেণু আসবে যদি দয়া করে অনুমতি দেয়। পনের দিনতো হতে চলল, দিন কি কাটতে চায়, বার বার ঘড়ি দেখি

কখন চারটা বাজবে। দুপুরটা তো কোনোমতে কাগজ নিয়ে চলে যায়। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, হাঁটতে ইচ্ছা আজ আর হয় না। সাড়ে চারটায় আমাকে নিতে আসল সিপাহি সাহেব। একসাথে দুইটা দেখার অনুমতি, আমার কোম্পানির ম্যানেজার ও একাউনটেন্টও এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করার জন্য। দূর থেকেই ছোট্ট বাচ্চাটা 'আব্বা, আব্বা' করে ডাকতে শুরু করে। এইটাই আমাকে বেশি আঘাত দেয়। দুইজন করে অফিসার পাঠায়। এরা জানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা রাজনীতির ধার ধারে না। এদের সাথে আলোচনা ঘর-সংসারের। মা কিছুটা ভাল আছেন, আব্বা খুলনায় গেছেন, আমার ছোট ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা কেমন, সংসার কেমন চলছে–অর্থাভাব হবে কি না? উপার্জন কম করি নাই, তবে খরচ করে ফেলেছি। এই সমস্ত ঘরোয়া কথাবার্তা। বেচারা কর্মচারীরা বোধহয় লজ্জাও পায়। কি শুনবে বসে বসে। রেণুকে বললাম, মোটা হয়ে চলেছি, কি যে করি! অনেক খাবার নিয়ে আসে। কি যে করব বুঝি না। রেণু আমার বড় মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এনেছে, তাই বলতে শুরু করল। আমার মতামত চায়। বললাম, 'জেল থেকে কি মতামত দেব; আর ও পড়তেছে পড়ুক, আইএ, বিএ পাশ করুক। তারপরে দেখা যাবে।' রেণু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কতদিন যে আমাকে রাখবে কি করে বলব! মনে হয় অনেকদিন এরা আমায় রাখবে। আর আমিও প্রস্তুত হয়ে আছি। বড় কারাগার থেকে ছোট কারাগার, এই তো পার্থক্য।

২৭শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পরই আমাকে একটা নোটিশ দেয়া হলো। নোটিশ পাঠাইয়াছেন, এ আহমদ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট–আমার বিচার হবে জেলগেটে। কোর্টে নেওয়া হবে না। এই মামলাটা রমনা থানার ৮০(৪)/৬৬ নম্বরের মামলা। জি. আর. নম্বর ১৮৯৩/৬৬ ইউ. আর. ৪৭ ডিপিআর ১৯৬৫। এই মামলাটা ঢাকায় আমার গ্রেপ্তারের কিছুদিন পূর্বে দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলায় আমাকে জেলা জজ বাহাদুর জামিন দিলে আবার রাতে আমার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে সিলেট পাঠাইয়া দেয়। ডিপিআর-এ গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনাবিচারে বন্দি করে রেখেও এদের শান্তি নাই। অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকে! আটটা মামলা সমানে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করেছে। একজন লোকেরই এই বুদ্ধি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পিছন

দরজার রাজনীতিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই সকল নীচতা দেখে মনটা আমার বিষিয়ে ওঠে। যে জাতের ভিতর এইরকম নীচ প্রকৃতির লোক জন্ম নিতে পারে, তাদের মুক্তি কি কোনোদিন আশা করা যায়!

নোটিশটা আর ২০/২৫ মিনিট পূর্বে পেলে সুবিধা হতো। আমার স্ত্রীর কাছে বলে দিতে পারতাম জহিরুদ্দিন ও অন্যান্য উকিল সাহেবদের আসতে। কাগজপত্র, নকল কত কি প্রয়োজন। এমনি আইবি আজকাল খুবই কৃপণতা করে, দেখা করতে অনুমতি দিতে। মনে করে, জেলে বসে রাজনীতি করি। তাদের বোঝা উচিত আমরা ও ধরনের রাজনীতি করি না। তাহলে তো প্রকাশ্যে ৬ দফার কথা না বলে গোপনে গোপনে কাজ করে যেতাম। আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। যদি ঐ পথে কাজ করতে না পারি ছেড়ে দিব রাজনীতি। প্রয়োজন কি! আমরা একলা দেশসেবার মনোপলি নেই নাই। যারা সন্ত্রাসবাদীতে বিশ্বাস করে তারাই একমাত্র রাজনীতি করবে, মাটির তলা থেকে ধাক্কা দেবে সুযোগ পেলেই। আমার কি আসে যায়? বহুদিন রাজনীতি করলাম। এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে আরাম করব। তবে সরকার যেভাবে জুলুম চালাচ্ছে তাতে রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয় বোঝা কষ্টকর।

আজ দিনভরে শুয়েই কাটালাম বেশি। নিজের জন্য আমার বেশি ভাবনা নেই। শুধু দুঃখ হয় এদের অত্যাচারের ধরনটা দেখে। আমার উপর এতো অত্যাচার না করে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেললে সব ল্যাঠা মিটে যেত। শুনলাম, আমার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা সব জায়গাতেই মামলা দায়ের করছে। আমি একা এত মামলা সামলাব কেমন করে? আমি ভাসাইয়া দিয়াছি নিজেকে যাহা হবার হবে। খোদাই আমাকে রক্ষা করেছে জালেমদের হাত থেকে, আর ভবিষ্যতেও করবে।

২৮শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

ভীষণভাবে ব্যাথা শুরু হয়েছে, পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত। বুঝতে পারলাম না, কেন এই ব্যথা। বসতেই পারি না। শুয়ে থাকলে একটু আরাম লাগে। হাঁটতে পারি। হাঁটলে বেশি ব্যথা লাগে না, তবে সোজাভাবে হাঁটতে হয়। দিনভরই শুয়ে থাকতে হয়। সরিষার তেল গরম করে মালিশ করালাম দুইবার। রফিক ছাফাইয়াটা মালিশ ভাল করে। রাতে ঘুমাতে পারি নাই।

২৯শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

সারাদিন ব্যথায় কাতর। ডাক্তার ক্যাপ্টেন সামাদ সাহেব এলেন আমাকে দেখতে। খাবার ঔষধ দিলেন, আরও দিলেন মালিশ। বিছানায় পড়ে রইলাম। সন্ধ্যার দিকে কষ্ট করে বের হয়ে বাগানের ভেতর আরাম কেদারায় কিছু সময় বসে আবার শুয়ে পড়লাম। খুবই কষ্ট পেতেছি।

৩০শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

আজ সিভিল সার্জন সাহেব এলেন, ঔষধও দিলেন। ব্যথা একটু কমেছে তবে উঠতে বসতে কষ্ট হয়। সারাদিন তো একলাই আমাকে থাকতে হয়। তারপর আবার শরীর খারাপ। বিকালে বাইরে বসে আছি, দেখি আমাদের অফিস সেক্রেটারি এডভোকেট মোহাম্মদউল্লাহকে নিয়ে চলেছে পুরানা ২০ সেলের এক নম্বর ব্লকে। আমি যেখানে থাকি তার সামনে দিয়েই রাস্তা। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? বুঝতে আমার বাকি রইল না। মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের ১৯৫৫ সালে একবার যক্ষ্মা হয়ে মহাখালী টিবি হাসপাতালে ছিলেন প্রায় ৭/৮ মাস। চিকিৎসা করে ভাল হয়েছিলেন। বোধহয় আবার আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এক্স-রে করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয়েছিল। রিপোর্ট বোধহয় খারাপ। তাই তাকে ১০ সেল থেকে টিবি ওয়ার্ডে নিয়ে এসেছে। জেলখানার টিবি ওয়ার্ড মানে সেল। ভাল লোকের মাথা খারাপ হয়ে যায় সেলে থাকলে। আর অসুস্থ মানুষের কি হবে সহজেই বুঝতে পারা যায়। কথা বলতে না পারলেও দেখতে পারব, খোঁজখবর নিতে পারব। মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের আর্থিক অবস্থা আমার জানা আছে। মহাখালী হাসপাতালে কেবিন নিয়ে থাকতে বহু খরচ। তারপর আবার বাড়ির খরচ। জানি না সরকার মুক্তি দিবে কিনা তাকে! দিন কেটে যায়, আর যাবেও। কোনো কাজেই লাগছি না।

৩১শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ রবিবার

সোনার খাঁচায়ও পাখি থাকতে চায় না। বন্দি জীবন পশুপাখিও মানতে চায় না। আমরা মানুষ, আমাদের মানতে কি ইচ্ছা হয়! মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক কথা আজ মনে পড়ল। যুগে যুগে যারা আদর্শের

জন্য জীবন দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই ক্ষমতা দখলের জন্য করে নাই। একটা নীতি ও আদর্শের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করে গেছে। কত মায়ের বুক খালি হয়েছে, কত বোনকে বিধবা করেছে, কত লোককে হত্যা করা হয়েছে, কত সংসার ধ্বংস হয়েছে। কারণ তো নিশ্চয়ই আছে, যারা এই অত্যাচার করে তারা কিন্তু নিজ স্বার্থের বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্যই করে থাকে। সকলেই তো জানে একদিন মরতে হবে। তবুও মানুষ অন্ধ হয়ে যায় স্বার্থের জন্য। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পরের ছেলেকে যখন হত্যা করে, নিজের ছেলের কথাটি মনে পড়ে না। মানুষ জাতি স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।

পাকিস্তানের ১৯ বৎসরে যা দেখলাম তা ভাবতেও শিহরিয়া উঠতে হয়। যেই ক্ষমতায় আসে সেই মনে করে সে একলাই দেশের কথা চিন্তা করে, আর সকলেই রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী আরও কত কি! মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারাগারে বন্দি রেখে অনেক দেশনেতাকে শেষ করে দিয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিয়েছে, সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কতকাল এই অত্যাচার চলবে কেই বা জানে! এই তো স্বাধীনতা, এই তো মানবাধিকার!

অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম বসে বসে। মনে হয়, এ পথ ছেড়ে দেই, এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করব কি করে? বিবেক যে দংশন করে। বয়স হয়েছে, শরীর তো খারাপই হতে থাকবে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারব কি না? মনকে সান্ত্বনা দেই এই কথা ভেবে, আর কতদিনই বা বাঁচব? চলুক না। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু যদি নাও করতে পারি, ত্যাগ যে করতে পারলাম এটাই তো শান্তি।

ব্যথাটা অনেক সেরে গেছে। আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করতেও আরম্ভ করেছি।

১লা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ সোমবার

বড় আশ্চর্য লাগছে। মোনায়েম খান সাহেব কিছুদিন একেবারেই চুপচাপ। একটাও হুমকি ছাড়েন নাই, পিন্ডি থেকে এসে। সর্বদলীয় সভা জনাব নূরুল আমীন সাহেবের বাড়িতে হয়েছে। নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনে আমার আপত্তি থাকার কোনো কারণ নাই। কিন্তু আন্দোলন করার নেতা কেউই নন। ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং রাজবন্দিদের মুক্তি, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, ইত্তেফাক প্রেস বাজেয়াপ্ত করার

আদেশ প্রত্যাহার, কৃষক শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হতে পারে। আমার মনে হয়, এনডিএফ নেতারা তাদের সেই গৎবাঁধা নীতি ধরে বসে আছেন: 'গণতন্ত্রের দাবি'। আর কোনো দাবির প্রয়োজন নাই, দলও থাকবে না, 'এক কমান্ড' বলে বেড়ান। এতে আন্দোলন হয় না, আর দাবি আদায়ও হয় না। ঘরে বসে গুজগুজ রাজনীতি চলে, আর কোনো মতে একটা আপোস করা যায় কিনা সেই ফন্দি। ন্যাপ আল্যাদের অন্য পথ, সকলের সাথে মিশে কাজ করতে রাজি, তবে তাদের দাবিগুলি নিম্নতম কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

এদেশে এসব হবে না। আন্দোলন যে দল করবে, ত্যাগ যে দল করবে, তারাই জনগণের সমর্থন পাবে এবং শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই দাবি আদায় হবে। আওয়ামী লীগের যারা এখনও জেলের বাইরে আছে তারাই কাজ করে চলুক। দেখা যাক কি হয়। জনসমর্থন ছয় দফার আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে পারলেই হয়। ৭ তারিখে নেতৃত্ব যে ভুল করেছে তা এখানে লেখলাম না।

ভেবেছিলাম এডভোকেট ও আমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ মিলবে, কারণ মামলা আরম্ভ হবে জেলগেটে, ৮ই আগস্ট থেকে। কোর্ট তো জেলগেটেই বসবে। মাত্র ছয়দিন আছে, কখন কাগজপত্র নিবে, নকল নিতে সময় লাগবে কোর্ট থেকে। কোন কোন এডভোকেট থাকবে? এরা বিচারের নামে প্রহসন করতে চায়। মার্শাল ল' যখন চলছিল তখনও বিচার পেয়েছিলাম, আজকাল জামিনের কথা উঠলেই টেলিফোন বেজে উঠে।

২রা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের সঠিক খবর জানার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম। এক্স-রে কি পাওয়া গেছে? ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখতে আসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের কি অবস্থা? তিনি বললেন, এক্স-রেতে ধরা পড়েছে এখনও তিনি ভুগছেন যক্ষ্মা রোগে। একে জেলে ধরে আনার যে কি অর্থ হতে পারে বুঝি না। এ রকম নিরীহ লোক আমার জীবনে দেখিনি। তিনি অফিসের কাজ করেন। কোনোদিন সভায় বক্তৃতা করেন নাই। কোথাও পার্টি গঠন করতে যান নাই। অফিসের কাজগুলি দেখতেন

এইমাত্র। বোধহয় সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছেন তার ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য, নতুবা মুক্তি দিতে। জানি না কি হবে, তবে তাঁর শরীর যদি আরও খারাপ হয় আর কোনো অঘটন ঘটে তবে সরকারই দায়ী হবে।

আমার কাছেই একজন কয়েদি *পাহারা* থাকে, নাম ফয়েজ, বাড়ি মানিকগঞ্জ। বাড়ি থেকে তার লোকেরা দেখা করতে এসে কিছু লেবু দিয়ে গিয়েছিল। সেই লেবুর থেকে চারটা লেবু এনে আমার সেলের কাছে দিয়ে গিয়াছে, বলেছে আমাকে খেতে। আমি ডেকে বললাম, 'ফয়েজ আমার তো রোজই লেবু আসে। তোমরা খাও।' বলে কিনা, 'স্যার, খুব দুঃখ পাব যদি আপনি না খান।' আমার সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। শুধু ভাবলাম, এদের কত বড় মন, থাকলে সবই দিয়ে দিতে পারত। তার বাড়ির থেকে লেবু এসেছে, আমাকেও খেতেই হবে।

পাঁচটা কাগজ রাখি, কোনো সংবাদই নাই। কাগজগুলিকে প্যামফ্লেট করে ফেলেছে। আইয়ুব সাহেবের মাস পহেলা বক্তৃতা ভালভাবে পড়লাম, তবে ভারতের সাথে আলোচনা ও ফয়সালা হতে হলে কাশ্মীরের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া উচিত। ভালই বলেছেন তিনি। পত্রিকায় লিখেছে : 'President Ayub Khan said today, without meaningful talks on the problem of Jammu and Kashmir, any treaty between India and Pakistan to resolve basic disputes would be futile.' আমি 'meaningful' অর্থটা বুঝলাম না। পূর্বেও প্রেসিডেন্ট সাহেবের মুখ থেকে একথা শুনেছি। এর অর্থ কি এই হয় না যে আমাদের আর গণভোটের দাবি নাই। যদি না থাকে, তাহাও পরিষ্কার করে বলা উচিত। ভারতও তার মতের কোনো পরিবর্তন করতে রাজি নয়। 'গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারত, গণতন্ত্রের পথে যেতে রাজি হয় না কেন?' কারণ, তারা জানে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণের মতামত নিলে ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের লোক ভোট দিবে না। তাই জুলুম করেই দখল রাখতে হবে।

দুই দেশের সরকার কাশ্মীরের একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা না করে দুই দেশের জনগণের ক্ষতিই করছেন। দুই দেশের মধ্যে শান্তি কায়েম হলে, সামরিক বিভাগে বেশি টাকা খরচ না করে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যেত। তাতে দুই দেশের জনগণই উপকৃত হতো। আমার মনে হয়, ভারতের একগুঁয়েমিই দায়ী শান্তি না হওয়ার জন্য।

নাইজেরিয়ার খবর দেখলাম, আবার হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। নাইজেরিয়ার লৌহমানব সামরিক রাষ্ট্রপ্রধান জনসন সান্ডন সারনমি নিহত হয়েছেন। একজন কর্নেল ইয়াকুবু নাইজেরিয়ার সর্বময় ক্ষমতা দখল করেছেন।

জনাব আইয়ুব খান সাহেব আজকাল আল্লা ও রসুলের নাম নিতে শুরু করেছেন। খুব ভাল কথা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, 'দেশের দুই অংশকে যুক্ত করার সূত্র আমাদের পয়গম্বর হজরত মহম্মদ (দ.)-এর মহান ব্যক্তিত্বেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। যতদিন এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন জাতীয় একতা অক্ষুণ্ন থাকিবে।' মহান আদর্শের নামে নিশ্চয়ই হজরত মহম্মদ (দ.) দেশের একটা অংশ অন্য অংশকে শোষণ করবে এ কথা বলে যান নাই। তিনি তো ইনসাফ করতে বলেছিলেন। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম হয়েই থাকে এবং হবেও। শোষকদের কোনো জাত নাই, ধর্ম নাই। একই ধর্মের বিশ্বাসী লোকদেরও শোষণ করে চলেছে ছলে বলে কৌশলে। প্রেসিডেন্ট আজও ছয় দফা দাবির উপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। জনাব সবুর তো প্রকাশ্যভাবেই বলে চলেছেন, পাকিস্তানকে দুই ভাগ করার অভিসন্ধি নাকি ৬ দফার মধ্যে আছে? কোথায় পেলেন? কিভাবে পেলেন? পাকিস্তান এক না থাকলে এই দাবিগুলি আদায় হয় কি করে? এই সমস্ত কথা বলে আর মানুষকে ধোঁকা দেওয়া চলবে না। জনগণ বুঝতে শিখেছে।

৩রা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ বুধবার

সকালে দেখতে আসলেন সিভিল সার্জন সাহেব। আমার শরীর ভাল না তাই। শরীর কি ভাল থাকে, একলা থাকলে জেলখানায়? প্রায়ই শরীর খারাপ হয়। আমার স্ত্রীকে কিছুই বলি নাই। কারণ, চিন্তা করে শরীর নষ্ট করবে।

আজ অনেকক্ষণ হাঁটাচলা করলাম। বিকালে চা খেতে বসেছি, দেখি সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের সিপাহি সাহেব এসেছে আমাকে জেলগেটে নিতে। 'দেখা' এসেছে—জহিরুদ্দিন সাহেব, আবুল সাহেব ও আমার স্ত্রী। ছোট তিনটা বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। মামলা সম্বন্ধে আলোচনা হলো কিছুটা। আইবি অফিসারদের সামনেই আলোচনা করতে হবে। দুইজন ইন্সপেক্টর দিয়েছে। সামনেই বসে থাকে কোনো কিছু আলাপ করার উপায় নাই। কিভাবে মামলা চালাব তাহাই আইবি জানতে চায়। আর আমরা তা বলব

কেন? বললাম, নকল (certified copy) নিতে। নকল না দিলে মামলা করব না। বলে দিব, যাহা ইচ্ছা করুক। কাগজপত্র না পেলে মামলা চালাইব কি করে? সালাম সাহেবও আসবেন। শুনলাম অনেক উকিল আসবেন ৮ তারিখে জেল গেটে মামলা করার জন্য। রেণুকে বললাম, কিছু টাকা দিতে নকল নেওয়ার জন্য। ছোট্ট ছেলেটা আমার কানে কানে কথা বলে। একুশ মাস বয়স। বললাম, আমার কানে কানে কথা বললে আইবি নারাজ হবে, ভাববে একুশ মাসের ছেলের সাথে রাজনীতি নিয়ে কানে কানে কথা বলছি। সকলেই হেসে উঠল। এটা রাসেলের একটা খেলা, কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপ করে থাকে আর হাসে। আজ আমার কাছ থেকে ফিরে যাবার চায় না। ওর মায়ের কাছে দিয়ে ভিতরে চলে আসলাম। ছোট্ট মেয়েটা–রেহানা আমার কাছ থেকে সরতে চায় না, তাই তাকে একটু আদর করলাম। মামলায় যে কি হবে জানি না। তবে সরকারের উৎসাহ একটু বেশি মনে হয়। অনেকগুলি মামলাই তো আছে। জেল থেকে কবে যে বের হতে পারব জানি না। সন্ধ্যার একটু পূর্বে আসলাম, 'আমার সেই পুরানা বাড়িতে'।

বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল। একজন সিপাহি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার আপনাকে নাকি আপনার বাবা ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়েছে, রাজনীতি করার জন্য আর বারবার জেলখাটার জন্য?' বললাম, এরকম কথা জীবনে আমি অনেক শুনেছি। আমার বাবা আজও আমাকে যে স্নেহ করেন বোধহয় অনেক পুত্রের কপালেই তা জোটে না জীবনে। আমার আব্বা কখনও আমার সাথে মুখ কালো করে কথা বলেন নাই। এখনও কাছে গেলে ছোট ছেলের মতো আদর করেন। আর কোনোদিন আমাকে কোনো কিছুর জন্য নিরাশ করেন নাই। আমার বাবা কখনও বড়লোক ছিলেন না। অনেক কষ্ট করেছেন, কিন্তু আমার প্রয়োজন তিনি মিটাইয়াছেন। এমনকি আমি জেলে থাকলেও আমার ছেলেমেয়ের দরকার হলে ধান, পাট বিক্রি করে টাকা পাঠাতে কৃপণতা করেন নাই। সিপাহিকে দেখালাম কয়েকদিন পূর্বের চিঠি। তাতে লিখেছেন 'তাঁর (আমার বাবার) মতো সুখী এ জগতে কয়জন আছে।'

মনে মনে বললাম, ওরে আমার রাজনীতি, তোমার জন্য জীবনে কত কথাই না আমাকে শুনতে হলো। এগার মাস মন্ত্রীত্ব করেছিলাম। 'চোর' বলতে কারও বাঁধলো না। আমি নাকি সিনেমা হল করেছিলাম! একজন সিপাহি জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনার বলাকা সিনেমা হলটা সরকার নিয়ে গিয়াছিল, ফেরত দেয় নাই, না!' হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, 'আমার সিনেমা হল বলাকা, নিশ্চয়ই বলাকা সিনেমার মালিক এ খবর পেলে হার্টফেল করে মারা

যাবে। কারণ বেচারা বহু টাকা খরচ করে ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে হলটা কিনেছে। আমার একআনা শেয়ারও যদি থাকত তবে আর কষ্ট করতে হতো না।' বেচারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। 'বলেন কি স্যার, আজও তো অনেকে বলে।' বললাম, 'বলতে দিন, ওটা তো আমাদের কিসমত–যাদের জন্য আমি রাজনীতি করি তাদের কেউ কেউ আমাদের বিশ্বাস করে না।' অনেকক্ষণ ভাবলাম, এই তো দুনিয়া! জনাব সোহরাওয়ার্দীকে 'চোর' বলেছে, হক সাহেবকে 'চোর' বলেছে, নেতাজি সুভাষ বসুকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এই বাঙালিরা 'চোর' বলেছে, দুঃখ করার কি আছে!

৪ঠা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

রেণু কিছু খাবার দিয়ে গেছে–কি করে একলা খেতে পারি? কই মাছ খেতে আমি ভালবাসতাম, তাই ভেজে দিয়েছে। কয়েকটা মাছ পাকিয়ে দিয়েছে, মুরগির রোস্ট, এগুলি খাবে কে? কিছু কিছু খেয়ে বিলিয়ে দিলাম কয়েদিদের মধ্যে। তারা কত খুশি এই জিনিস খেয়ে! কেহ বলে, সাত বৎসর কেহ বা পাঁচ বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর এই জেলে একঘেয়ে খাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে। যখন মিঠা কুমড়া শুরু হয় কয়েক মাস মিঠা কুমড়াই চলে, আবার যখন ক্ষেতে ডাঁটা জন্মায় আবার শুরু হয়ে কিছুদিন চলে, আবার কিছুদিন পুঁইশাক। ডাল তো আছেই। আমার এক ছাফাইয়া ছিল একটু রসিক, সাত বৎসর জেল হয়েছে, প্রায় পাঁচ বৎসর খেটেছে বলে খালাসের সময় হয়ে এসেছে। বলে, এই রকম মজার খাবার পেলে আর কিছুদিন জেলে থাকতে রাজি আছি? মেট বলে, 'পেটে ডালের চর পড়ে গিয়াছিল। বিশ বৎসর সাজা, সাত বৎসর খেটেছি এখন আর ডাল খেতে হয় না।'

আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। জেলখানায় আমার জন্য কাজ করবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার সাথে এক পাক হবে না! আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখনও জমিদার তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ যখন সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।

আমি তো অনেক আরামেই থাকি; কিন্তু সাধারণ কয়েদিদের জীবন তো দুর্বিষহ। কয়েদিরা যেন মেশিন হয়ে গেছে। আমার জন্য যারা কাজ করে তারা ছাড়াও আমার এরিয়ায় যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেককেই আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু খেতে দিতে চেষ্টা করি। কিছু কিছু করে জমাই আমার খাবার থেকে, তারপর ডাকাইয়া ওদের মধ্যে বিলি করি। কত আনন্দ দেখি ওদের মুখে। ২৬ সেলে যারা সিকিউরিটি আইনে বন্দি আছেন, বহুদিন ধরেই আছেন। ধীরেন বাবু ওখানে ফুলের বাগান করেন। আমি শুনেছি এত সুন্দর বাগান নাকি ঢাকা শহরেও নাই। ঐ বাগানটা আমি ১৯৬২ সালে শুরু করি, তখন ওখানে টমেটোর বাগান ছিল। কিছুদিন পরে আমি খালাস হয়ে যাই তখন থেকে তাঁহারা ওখানেই আছেন। আমি খবর দিয়েছিলাম কয়েকটা গোলাপ ফুলের চারা দিতে। আজ বিকালে তিনটা লাল গোলাপের চারা পাঠাইয়া দিয়েছেন। আমি লেগে পড়লাম বাগানে, তাড়াতাড়ি গর্ত করে, সার দিয়ে লাগাইয়া দিলাম। এত ইটের টুকরা পরিষ্কার করতে জান শেষ হয়ে যায়। আমার বাগানটাও এখন সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখতে বেশ লাগে। এইত আমার কাজ। বই পড়া ও বাগান করা।

ওকালতনামা আইবির কাছ থেকে সেন্সার হয়ে এসেছে আমার সই নেবার জন্য। দেখলাম, দুইটা ওকালতনামায় না হলেও প্রায় ৪০ জন এডভোকেট দস্তখত করেছেন। জেলগেটে কোর্ট করে বিচার হবে, কি চমৎকার ব্যবস্থা! আমাকে নাকি বাইরের কোর্টে নিলে, ভয়ানক গোলমাল হবে। এতই যদি ভয় হয়, তবে ছেড়ে দেও এবং ৬ দফার দাবি মেনে নেও।

আমি নাকি ভয়ানক প্রকৃতির লোক? আমাকে নাকি জেলগেট থেকে কেড়ে নিবে? তাই চারজন করে বন্দুকধারী সিপাহি রাখা হয়েছে–জেল দরজার কাছে। ইংরেজ আমল থেকে আমার এবার জেলে আসা পর্যন্ত একজন বন্দুকধারী পাহারা থাকত। ইংরেজ আমলে যখন বিপ্লবীরা গুলি চালায়ে সাদা চামড়াদের হত্যা করত তখনও একজন সিপাহি বন্দুক নিয়ে থাকত, এখন জেল সিপাহি একজন, আর্ম পুলিশ থেকে দুইজন, আর আনছার দুইজন। বন্দুক নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা গেটের কাছে দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়। ভয় নাই, ভয় নাই এ রাজনীতি এখনও আমরা করছি না। পালাব না, আর জেলগেট ভাঙতেও কেহ আসবে না।

আজ ডিপুটি জেলার সাহেব একবার এসেছিলেন।

আমার মুড়ি ফুরাইয়া গিয়াছিল, জমাদার সাহেব আজ মুড়ি কিনে দিয়েছেন।

আমার মুড়ি জেলখানায় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সিপাহি, জমাদার ও কয়েদিদের মধ্যে থেকে অনেকে পালিয়ে মুড়ি খেতে আসে।

সুপ্রিম সোভিয়েত আলেক্সী কোসিগিনকে দ্বিতীয়বারের জন্য সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। মি. কোসিগিন অভিযোগ করেছেন, 'চীন সরকার সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাপক সাহায্য করিতেছে।' আমার মনে হয় কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিভেদকে আমেরিকা পুরাপুরি ব্যবহার করতে ছাড়বে না।

৫ই আগস্ট ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

কয়েদিদের ধারণা, আমি ছাড়া পেলে ওদের মুক্তিরও একটা সম্ভাবনা আছে। একজন কয়েদি কিছুদিন পূর্বে ২০ বৎসর সাজা খেটে মুক্তি পেয়েছিল, তিন বৎসরের মধ্যেই আবার ২৫ বছর জেল নিয়ে ফিরে এসেছে। খবর নিয়ে জানলাম, যারা তাকে খুনের মামলায় সাক্ষী দিয়ে জেল দিয়েছিল তারা খুব প্রভাবশালী লোক। কোথায় একটা ডাকাতি ও খুন হলো আর তাকে আসামি করে সাক্ষী দিয়ে আবার সাজা দিয়ে দিয়েছে। শপথ করে বলল, এ ঘটনা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। বাড়ি যেয়ে বিবাহ করেছিল। ঠিক করেছিল যে কয়দিন বেঁচে আছে, সংসার করবে আর কোনো গোলমালের মধ্যে যাবে না। প্রথম যখন জেলে এসেছিল তখন যে স্ত্রীকে রেখে এসেছিল সে তারই এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে পরে বিবাহ বসে। চাচাতো ভাইয়ের ভয় হয়েছে, যদি প্রতিশোধ নেয়। তাই সেও তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আর একজন বরিশাল থেকে এসেছে। পূর্বে ২০ বছর জেল খেটে গেছে। এবার ২৫ বছর জেল নিয়ে এসেছে। ৪০-৫০ বছর এমনকি ৭০ বৎসর জেল হয়েছে বিভিন্ন ডাকাতি ও খুন মামলায় এরকম কয়েদিও ঢাকা জেলে আছে। জেল খাটছে, হাসছে, খেলছে। 'অল্প দুঃখে কাতর, অতি দুঃখে পাথর', অনেকেই পাথর হয়ে গেছে। মনে করে এই জেলেই তাদের বাড়ি। জীবনে আর যাওয়া হবে না বাইরে। এতদিন জেল খাটলে কি আর বাঁচবে। তবুও আশা করে আর সুযোগ পাইলেই বলে, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের ছাড়বেন, আপনি যদি ক্ষমতায় যান—জেল কি জিনিস আপনিই বোঝেন, তাই আমাদের ছেড়ে দিবেন।' মনে মনে বললাম, আমাকে এরা ছাড়বে না আর... তোমাদের আশা এ জীবনে আর পূরণ হবে না।

৬ই আগস্ট ১৯৬৬ ॥ শনিবার

আজ জনাব আইয়ুব সাহেব তাঁর 'কলোনি' পূর্ব পাকিস্তান দেখতে আসবেন। মাঝে মাঝে মাইকের শব্দ আসে, হাওয়াই আড্ডায় যেয়ে পাকিস্তানের 'লৌহ মানবকে' সাদর অভ্যর্থনা জানাবার অনুরোধ। জনসাধারণ স্বইচ্ছায় যাবে কিনা এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে! তবে ছোট খাঁ সাহেব টাকায় ভাড়া করে কিছু লোক নেবার চেষ্টা করবেন। যদি এক দেশই হবে তবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসলেই তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই অভ্যর্থনার প্রহসন কেন? আইয়ুব সাহেব সবই বোঝেন। মোনায়েম খান সাহেব তার চাকরি রক্ষা করার জন্য এসমস্ত করে থাকেন, আর দুনিয়াকে দেখাতে চান, দেখ কত জনপ্রিয়তা! একবার যদি গণভোটের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা যাচাই করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন তার শোচনীয় অবস্থা। আশা করি তিনি নিজে ভাল করে বুঝে নিবেন অবস্থাটা। কারণ, এরপরও যদি এই জুলুম, অত্যাচার ও ধরপাকড় চলতে থাকে পরিণতি বোধহয় ভাল হবে না। ইত্তেফাক কাগজ সম্বন্ধে তিনি কিছু একটা করবেন অনেকেই আশা করেন। তবে আমার নিজের মতে, মোনেম খান তার অনুমতি না নিয়ে এতবড় কাজ করতে সাহস পান নাই।

আজই দুইজন ছাত্রলীগের নেতাকে ডিপিআরএ গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। একজনের নাম নূরে আলম সিদ্দিকী, আর একজন খুলনার কামরুজ্জামান। এদের পুরানা ২০ সেলে রাখা হয়েছে, ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। নূরে আলম এম এ পরীক্ষার্থী, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা।

সন্ধ্যায় আরও দুই ভদ্রলোককে জেলে আনল, একজন সন্ধ্যার পূর্বে, আর একজন তালাবন্ধ করার পরে। তাদেরও পুরানা ২০ সেলের ৪ নম্বর ব্লকে রাখা হয়েছে। খবর নিয়ে জানলাম একজনের নাম ফজলে আলী, তিন মাস পূর্বে চার্টার্ড একাউনটেন্ট হয়ে বিলাত থেকে এসেছেন। আর-একজন আলমগীর কবির, ন'মাস পূর্বে বিলাত থেকে এসেছেন–সাংবাদিক। কি করেছে জানি না, পূর্ব বাংলায় রাজনীতি করে নাই। কোনোদিন করলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম। বিলাতে বসে কোনো কিছু করেছেন কি না জানি না। বিলাতি কায়দায় কাপড়-চোপড় পরে এসেছে। ভাবলাম, বেচারা কোথায় এসেছে একটু পরেই বুঝতে পারবে। দুনিয়ার দোজখ, পাকিস্তানি জেল। দেড় টাকা খোরাক বাবদ সারাদিন ভরে। এদের ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে ওদের জায়গাটা দেখা যায়। ঐ ঘরে

আমিও একদিন ছিলাম জাকির হোসেন সাহেবের বদৌলতে। কাপড়, জামা, বিছানা কিছুই আনে নাই। একেবারে নতুন লোক। বেশ কষ্ট হবে। বোধহয় বিলাত থাকতে পূর্ব বাংলার দাবি-দাওয়ার কথা একটু একটু বলে থাকবে। ইংরেজের গণতন্ত্র দেখে এসেছে। এইবার পাকিস্তানি গণতন্ত্র দেখবে।

এদের জন্য দুঃখ হলো কিছুটা।

আইয়ুব সাহেব পৌঁছে গেছেন। আজ একজন সিপাহির কাছ থেকে শুনলাম। নিশ্চয়ই হুঙ্কার ছেড়েছেন।

৭ই আগস্ট ১৯৬৬ ॥ রবিবার

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান ছয় দিনব্যাপী সফরের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেছেন। আমি আশ্চর্য হলাম, প্রেসিডেন্ট কিভাবে এসব কথা বলতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি সরকার সমর্থকদের সম্বন্ধে বলেছে। তিনি বলেছেন, 'বিভেদ সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপ যদি সকল সীমা অতিক্রম করে তাহা হইলে তাহাদের রোধ করিবার জন্য অন্য পন্থা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।' তিনি আরও বলেন, 'যে সকল বিভেদ সৃষ্টিকারী জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করেন।

সরকার পক্ষে মি. আফসার উদ্দিন, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, বিচার করছেন। ২টা পর্যন্ত মামলা চলল। ৫ জন সরকার পক্ষের সাক্ষী হাজির হয়েছিল। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে মামলার তারিখ ঠিক হলো। বাকি সাক্ষ্য সেই দিন হবে। গতকাল তেজগাঁ থেকে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। ফজলে আলী ও আলমগীর কবিরকে ডিপিআর-এ ধরে এনেছিল। ২০ সেলের সামনে রেখেছিল, আজ তাদের অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে গেল। যারা তাদের দিতে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে খবর পেলাম পুরানা হাজতে নিয়ে গেছে। ভালই হয়েছে, নূতন লোক সেলে কষ্ট হতেছিল।

আজ আমার তিন মাস পূরণ হলো। ডাইরি লেখাও শেষ করলাম। আগামীকাল থেকে ছোটখাট ঘটনাগুলো লিখবো।

নোটিশ পেয়েছি আর একটা মামলা জেল গেটে হবে সে মামলাটাও বক্তৃতা করার জন্য। আব্দুল মালেক, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, নোটিশ দিয়েছে। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর জেলগেটে মামলা আরম্ভ হবে।

সিলেট আওয়ামী লীগ সম্পাদক আবদুর রহীম ও সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন আহম্মদ এডভোকেটকে পূর্ব পাকিস্তান ডিপিআর-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইয়ুব খান সাহেবের সফর উপলক্ষ্যে গোলমাল নাকি হয়েছিল তাঁর সভায়। ছাত্র ও ন্যাপ কর্মীদের কয়েকজনকেও গ্রেপ্তার করেছে।

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ॥ শনিবার

নূরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। একজন ভাল কর্মী, বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে। ১/২ খাতায় রেখেছে। ডেপুটি জেলার সাহেবকে বলেছি একটু ভাল জায়গায় রাখতে। কিছুদিন পূর্বে মাহমুদউল্লাহ সাহেব, মোস্তফা সরোয়ার, হাফেজ মুছা, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী এবং রাশেদ মোশাররফকে সরকার মুক্তি দিয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ॥ বুধবার

রেণু দেখা করতে এসেছিল। রেহানার জ্বর, সে আসে নাই। রাসেল জ্বর নিয়ে এসেছিল। হাচিনার বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। রেণু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছেলেটাকে পছন্দও করেছে। ছেলেটা সিএসপি। আমি রাজবন্দি হিসেবে বন্দি আছি জেনেও সরকারি কর্মচারী হয়েও আমার মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহার চরিত্রবল আছে। মেয়েটা এখন বিবাহ করতে রাজি নয়। কারণ আমি জেলে, আর বিএ পাশ করতে চায়।

আমি হাচিনাকে বললাম, 'মা আমি জেলে আছি, কতদিন থাকতে হবে, কিছুই ঠিক নাই। তবে মনে হয় সহজে আমাকে ছাড়বে না, কতগুলি মামলাও দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে চলেছে। তোমাদের আবারও কষ্ট হবে। তোমার মা যাহা বলে শুনিও।' রেণুকে বললাম, 'আর কি বলতে পারি?' আবার বললাম, '১০ তারিখে মামলা আছে। আকরাম ও নাছেরকে পাঠাইয়া দিও। বাচ্চারা কেমন আছে জানাইও।'

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

আজ চার মাস পূর্ণ হলো আমি জেলে এসেছি। ডিপিআর-এর বন্দি আমি। এ দুঃখ রাখার জায়গা নাই।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। গতকাল সারাদিন ও সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। দেশের অবস্থাও খুবই ভয়াবহ। বৎসরে দুইবার বন্যা, তারপর আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শুনলাম, ঢাকা শহরের অধিকাংশ জায়গা বন্যার পানিতে ডুবে গিয়াছে। আমি যে ঘরটাতে থাকি এটা বোধহয় দুইশত বৎসরের পুরানা। সমস্ত জায়গা দিয়েই বোধহয় পানি পড়ে। গত রাতটা কোনোমতে কাটাইয়াছি। সামান্য একটু জায়গা প্রায়ই ফাঁক আছে, যেখান দিয়ে পানি পড়ে না। ঘরটার ভিতরে পানির ঢেউ খেলেছে সারাদিন। তিনজন লোক সারাদিন আমার জিনিসপত্র রক্ষা করতে ব্যস্ত রয়েছে। বিছানা থেকে নামার উপায় নাই। খবর পেয়ে জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব ও জমাদার সাহেবরা এসেছিলেন। বললেন, 'কি করে এখানে থাকবেন? পাশেই নতুন ২০ সেলের একটা চার সেলের ব্লক আছে, সেখানে থাকুন।' বললাম, 'সেলের ভিতর, তার উপর পায়খানা-প্রস্রাবখানা নাই, কেমন করে থাকব? একটা টিন দিয়ে দিবেন ওতে আমার চলবে না। আমাকে ভাল জায়গা দিতে হলে সরকারের অনুমতি লাগবে, কি বলেন? রাতে ঘুমাব না, তাতে কি হবে? জীবনে অনেক দিন না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। যদি স্বায়ত্তশাসন ও ৬ দফা আদায় করে নিতে পারি নিব। তবে আমরা রাজবন্দিরা তো খুনী, ডাকাত, একরারীর থেকেও আজকাল খারাপ! দেখুন পুরানা ২০ সেলে রণদা সাহেব বার-এ্যাট-ল', বাবু চিত্ত সুতার ভূতপূর্ব এমপিএ, আবদুল জলিল এডভোকেট, দুইজন ছাত্র—একজন এমএ পরীক্ষা দিবে নূরে আলম সিদ্দিকী, আর একজন বিএ পরীক্ষা দিয়েছে কামরুজ্জামান। আরও আছে শংকর বাবু, পুরানা রাজনৈতিক কর্মী বাড়ি রংপুর, আরও কয়েকজনকে রেখেছেন। তাদের অবস্থা কি? উপর দিয়ে পানি পড়ে। দরজা দিয়ে পানি ঢোকে, একটা করে টিনের পায়খানা। ৭ সেল অনেক ভাল। সেখানে রেখেছেন একরারীদের, আরও অনেক জায়গা ভাল আছে সেখানেও রাখতে পারেন, কিন্তু রাখবেন না। কষ্ট দিতে হবে। আপনারা আমাদের বাধ্য করেছেন মোকাবেলা করে দাবি আদায় করতে।'

বিশ্বাস বোধহয় অনেকেই করবেন না, কিন্তু সত্য কথা রতন নামের আট বৎসরের ছেলে ডিপিআর আইনে জেলে বন্দি আছে, আজও ছাড়া হয় নাই।

কুমিল্লা জেলায় বাড়ি। রতনের বাবা চলে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে। দুই কাকা পাকিস্তানে আছে, বর্ডারে বাড়ি। ভারতে আবার কষ্ট হলে ওর বাবা মা কাকাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়। যুদ্ধ বেঁধে গেলে ওর কাকাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তান সরকার। ওরা খবর নিয়ে জানল ওর বাবা ভারতে থাকে, তাই ওকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল কাকার সাথে। কাকা 'পাকিস্তানি' বলে মুক্তি পেয়েছে। রতন 'ভারতীয়' তাই মুক্তি পায় নাই, জেলেই আছে। ওকে আমাকে একজন কয়েদি দেখাল। কোলে করে বলল, সার ডিপিআরএ বন্দি আজ দশ মাস হলো, আর কতকাল থাকতে হয়! এই দুধের বাচ্চার কে আছে? এমন আশ্চর্য ঘটনা অনেক ঘটছে এই দেশে।

কারাগারে সাক্ষাৎ

জেল কারাগারে সাক্ষাৎ করতে যারা যায় নাই তাহারা বুঝতে পারে না সেটা কি বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। ভুক্তভোগীরা কিছু বুঝতে পারে। কয়েদিরা সপ্তাহে একদিন দেখা করতে পারে আত্মীয়-স্বজনের সাথে। সকাল বেলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করতে হয়। তারপর জেল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তগুলি দেখে নেয় এবং সাক্ষাতের অনুমতি দেয়। গেট থেকে বিকালে যে যে দেখা পাবে তাদের নাম ধরে জেলের ভিতর যেয়ে চিৎকার করে কয়েদি *পাহারারা* ডাকতে থাকে এবং অনুমতিপত্র দিয়ে যায়। দূর দূর থেকে আত্মীয়-স্বজন ভোর বেলা থেকে জেল গেটের বাইরে বসে থাকে–ছেলেমেয়ে, বুড়া-বুড়ি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। তারপর বেলা ৩টা থেকে নামডাকা শুরু হয়। এক সাথে ১০-১২ জন। একই জানলা দিয়ে কথা বলতে শুরু করে। ভিতরের দিকে কয়েদিরা বাইরের দিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন মধ্যখানে লোহার জালের বেড়া ভাল করে চেহারাও দেখা যায় না। দুই চার মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করতে হয়। দেখাও শেষ করতে হয়। ছেলেকে দেখতে আসে বৃদ্ধা বাবা-মা, বাবাকে দেখতে আসে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে দেখতে আসে স্বামী, স্বামীকে দেখতে আসে স্ত্রী। শুধু চিৎকার ও কান্না। দূরে সরে আসে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কয়েদি। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যায়। হতভাগাদের আত্মীয়-স্বজন বহু দূর থেকে আসে, কেহ বা বরিশালের পটুয়াখালী বা ভোলা থেকে, কেহ বা ময়মনসিংহ বা ফরিদপুর থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। তবুও আসে দেখতে কেমন আছে তাদের আপনজন।

এই সাক্ষাৎকে প্রহসনও বলা চলে। অনেক সময়ে কিছু টাকা খরচ করে ভিতরে গেটে এসেও কয়েক মিনিট দেখা করে থাকে কিছু কিছু লোক। না দেখলে বা না ভুগলে কেউই বুঝবে না যখন সাক্ষাৎ হওয়ার পরে ছাড়াছাড়ি করতে হয় তখনকার অবস্থা। সিপাহি ও কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এদের দুঃখ দেখে দুঃখিত হয়। তারপর আস্তে আস্তে তারাও মেশিনের মতো শক্ত হয়ে যায়।

আমরা যারা রাজবন্দি তারা আধ ঘন্টা থেকে একঘন্টা সময় পাই। পাশাপাশি বসে আইবি অফিসারদের শুনিয়ে কথা বলে থাকি। দুঃখ হয় যখন বৃদ্ধা মা-বাবা, স্ত্রী এবং ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা বিদায় নেয়, কেহ বা কাঁদতে কাঁদতে, কেহ বা মুখ কালো করে।

“চিন্তা করিও না। জীবনে বহু ঈদ এই কারাগারে আমাকে কাটাতে হয়েছে, আরও কত কাটাতে হয় ঠিক কি? তবে কোনো আঘাতেই আমাকে বাঁকাতে পারবে না। খোদা সহায় আছে।”

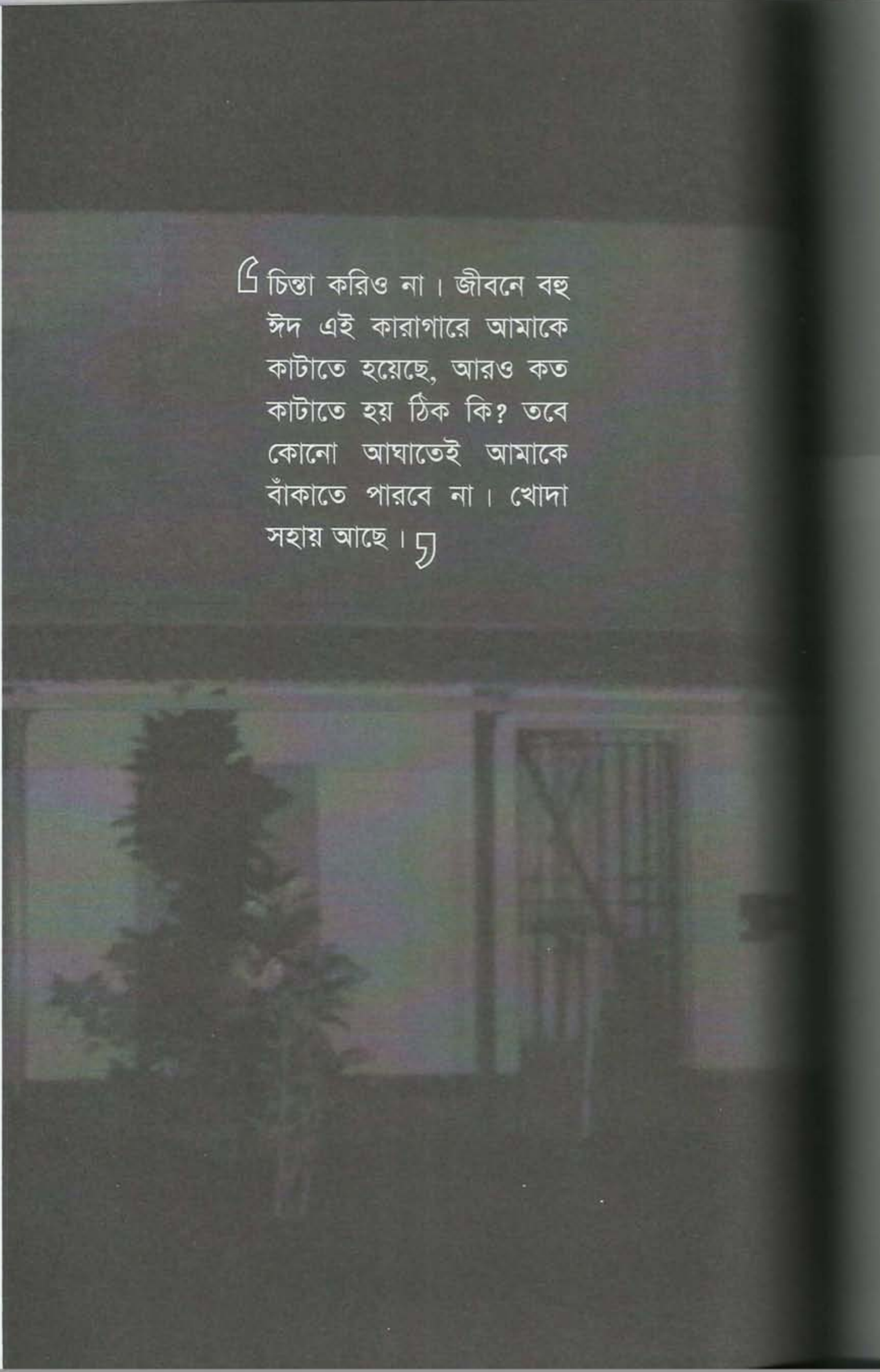

এ খাতাটি ১৯৬৭ সালে লেখা। ১৯৬৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি। তাঁর বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করেছে আইয়ুব-মোনায়েম সরকার। একটি ছোট্ট বাঁধানো খাতা। ২৪০ পৃষ্ঠার। তাঁর কারাগারের জীবনযাপন, ব্যক্তিগত ভাবনা, পারিবারিক কথা ছাড়াও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অনেক কথাই এ খাতায় লিখেছেন।

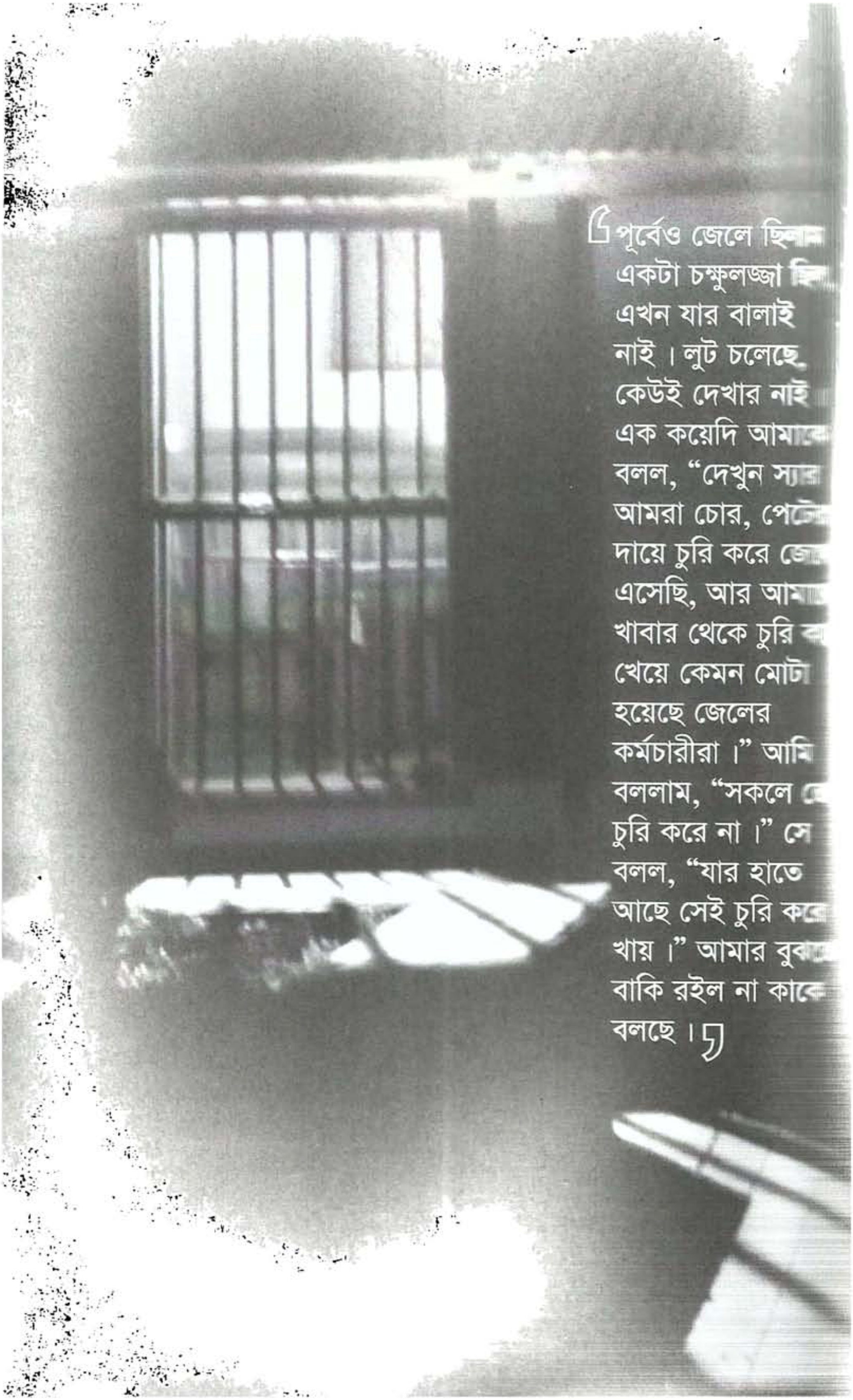

“পূর্বেও জেলে ছিলা
একটা চক্ষুলজ্জা ছি
এখন যার বালাই
নাই। লুট চলেছে,
কেউই দেখার নাই
এক কয়েদি আমাকে
বলল, “দেখুন স্যার
আমরা চোর, পেটে
দায়ে চুরি করে জে
এসেছি, আর আমা
খাবার থেকে চুরি ক
খেয়ে কেমন মোটা
হয়েছে জেলের
কর্মচারীরা।” আমি
বললাম, “সকলে
চুরি করে না।” সে
বলল, “যার হাতে
আছে সেই চুরি করে
খায়।” আমার বুঝতে
বাকি রইল না কাকে
বলছে।”

১লা জানুয়ারি—২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭

শরীরটা খারাপ নিয়ে নতুন বৎসর শুরু। চোখের অসুখে ভুগছিলাম, এখন একটু আরামের দিকে। পায়ে একটা ফোড়া হয়েছিল। এখন এটা কারবানক্যল হয়ে গেছে। ৬/৭ তারিখে জেলগেটে মামলা হবে। হাঁটতে পারি না, তবুও যেতে হবে। কারণ ডাক্তার সাহেব ও সিভিল সার্জন সাহস পায় না আমাকে অসুস্থ ঘোষণা করতে। যদি সরকার রাগ হয়, বদলি করে দেয়। বললাম, স্ট্রেচার নিয়ে আসুন, যাবো। স্ট্রেচার প্রস্তুত, হাকিম শুনে তো অস্থির। স্ট্রেচারে এনে মামলা করলে হৈ চৈ হয়ে যাবে। তাই হাকিম সাহেব আমার এডভোকেট সালাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করে মামলার শুনানি বন্ধ করে দিলেন। আমাকে আর গেটে নেওয়া হলো না। কারবানক্যল সারতে বেশ কয়েকদিন লাগল। ৭/৮ দিন প্রায় শুয়েই কাটালাম।

১১ তারিখে রেণু এসেছে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে। আগামী ১৩ই ঈদের নামাজ। ছেলেমেয়েরা ঈদের কাপড় নিবে না। ঈদ করবে না, কারণ আমি জেলে। ওদের বললাম, তোমরা ঈদ উদ্‌যাপন কর।

এই ঈদটা আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার আব্বা ও মায়ের কাছে বাড়িতেই করে থাকি। ছোট ভাই খুলনা থেকে এসেছিল আমাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। কারণ কারও কাছে শুনেছিল ঈদের পূর্বেই আমাকে ছেড়ে দিবে। ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি নাই। ওরা বুঝতে শিখেছে। রাসেল ছোট্ট তাই এখনও বুঝতে শিখে নাই। শরীর ভাল না, কিছুদিন ভুগেছে। দেখা করতে এলে রাসেল আমাকে মাঝে মাঝে ছাড়তে চায় না। ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে কষ্ট হয়। আমিও বেশি আলাপ করতে পারলাম না শুধু বললাম, "চিন্তা করিও না। জীবনে বহু ঈদ এই কারাগারে আমাকে কাটাতে হয়েছে, আরও কত কাটাতে হয় ঠিক কি! তবে কোনো আঘাতেই আমাকে বাঁকাতে পারবে না। খোদা সহায় আছে।" ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় রেণুকে বললাম, বাচ্চাদের সবকিছু কিনে দিও। ভাল করে ঈদ করিও, না হলে ওদের মন ছোট হয়ে যাবে।

রাত্র ১০টায় হৈ চৈ, আগামীকাল ঈদ হবে।

১২ই সকালবেলা জেলের মধ্যে ঈদ হবে, কারণ সরকারের হুকুম। অনেক সিপাহি ও জেল কর্মচারী রোজা ভাঙতে রাজি হয় নাই। তবে কয়েদিদের

নামাজ পড়তেই হবে, ঈদ করতেই হবে। শুনলাম পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি লোক চাঁদ দেখেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নতি হলে পূর্ব বাংলার উন্নতি হয়! হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখেছে, এখানে নামাজ পড়তেই হবে। আমাদের আবার নামাজ কি! তবুও নামাজে গেলাম, কারণ সহকর্মীদের সাথে দেখা হবে। এক জেলে থেকেও আমার নিজের দলের নেতা ও কর্মীদের সাথে দেখা করার উপায় নাই। আমি এক পার্শ্বে আর অন্যান্যরা অন্য পার্শ্বে।

রাজনৈতিক বন্দিদের বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা করে রাখা হয়। ২ নম্বর ব্লকে শ্রমিক কর্মীদেরই বেশি রাখা হয়েছে। নামাজের আগে রুহুল আমিন, সহিদ (তেজগাঁও), আদমজীর সফি আরও অনেকে ছুটে এল আমার কাছে। শাহজাহানপুরে আমার সহকর্মী আবদুল কাদের ব্যাপারীর ছেলেকেও ধরে এনেছে। তার নাম সিদ্দিক। প্রেসে নাকি কি কাগজ ছাপাইয়াছে। ন্যাপের হালিম, ভাগ্নে মণি পুরানা হাজত থেকে তারা এসেছে। এক জেলে থাকি আমার ভাগ্নে আমার সাথে দেখা করতে পারে না। কি বিচার!

১০ সেল থেকে শামসুল হক, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমিন, ওবায়দুর রহমান, মোল্লা জালাল, মহীউদ্দিন (খোকা), সিরাজ, হারুন, সুলতান এসেছে। দেখা হয়ে গেল, কিছু সময় আলাপও হলো। এরা সকলেই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী। রফিকুল ইসলাম, বজলুর রহমান ও শাহ্ মোয়াজ্জেম নামাজে আসে নাই।

আমার কাছাকাছিই থাকে ছাত্রলীগ কর্মী নূরে আলম সিদ্দিকী ও খুলনার কামরুজ্জামান, ছাত্র ইউনিয়নের রাশেদ খান মেনন এবং আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম। বাবু চিত্তরঞ্জন সুতারও আছেন। আমার পায়ে ব্যথা, তাই বসে বসেই মিললাম সকলের সাথে। কারাগার থেকেই দেশবাসী ও সহকর্মীদের জানাই ঈদ মোবারক। পূর্ব বাংলার লোক সেইদিনই ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারবে, যেদিন তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, এবং দেশের সত্যিকারের নাগরিক হতে পারবে।

নামাজ আমাদের আজই পড়তে হয়েছে। বাড়ির থেকে খাওয়া-দাওয়া কিছুই আসে নাই। কারণ বাইরের লোক তো আমাদের মত বন্দি না, তারা ১৩ তারিখেই ঈদ করবে। ১৩ তারিখেই শতকরা ৯০ জন লোক ঈদ করেছে। কিন্তু কারাগারে খাওয়ার বন্দোবস্তও ১২ তারিখেই হয়েছে।

আজ ১৩ তারিখ খবর পেলাম ঢাকায়ও আজ নামাজ হয়েছে। অনেকেই নামাজ পড়েছে। জেল কর্মচারীরা আজই দেখা করতে এসেছে। তাদের কথা হলো চাকরি করে বলে নামাজও সরকারের ইচ্ছায় পড়বে নাকি?

আজ ১০ সেল থেকে খাবার এসেছে আমাদের জন্য, ২৬ সেলের নিরাপত্তা বন্দিরাও পাঠাইয়াছেন। আমার তো কিছু করার উপায় নাই, একলা মানুষ, এক জায়গায় থাকি। রোজ পাঁচ টাকা দেয়, ৪/৫ জন লোক নিয়ে খেতে হয়, টাকা বাঁচাব কি করে? তাই কিছুই করি নাই। দেখি ১১টার সময় বেগম সাহেবা খাবার পাঠাইয়াছে। কিছু কিছু অন্যান্য জায়গায় পাঠাইলাম। যার যা ছিল পুরানা ২০ সেলের রাজবন্দিদের নিয়ে আজ এক জায়গায় বসে খাব, বলে দিলাম। আইন আজ আর মানি না। তাই সকলকে নিয়ে আমার জেলখানার ঘরে বিছানা পেতে এক সাথে খেলাম। যে ৬০/৭০ জন কয়েদি সেল এলাকায় ছিল তাদেরও কিছু কিছু দিলাম। পান সিগারেট আনাইয়া রেখেছিলাম। কয়েদিরা আমার সাথে যারা দেখা করতে এসেছিল তাদেরও দিলাম। ৪০ সেলের পাগল ভাইদের কিছুই দিতে পারলাম না, সংখ্যায় তারা প্রায় ৭০ জন। সরকার টাকা আনতে দেয় না রাজবন্দিদের। ফল ফলাদিও বন্ধ। তবুও ঠিক করেছি ওদের কিছু আনাইয়া খাওয়াতে হবে। কয়েদিদের 'পোলাও' দিয়েছিল। মুখে দিয়ে দেখলাম পোলাও না, একটু ভাল করে রান্না ভাত। অনেক দিন ধরে কয়েদির খাবার খরচের থেকে টাকা বাঁচাইয়া একদিন ভাল খাওয়াবে। কি আর বলব, চোরের টাকা চুরি করে খায় আজকাল আমাদের মেসের কিছু কিছু কর্মচারী। পূর্বেও জেলে ছিলাম একটা চক্ষুলজ্জা ছিল, এখন তার বালাই নাই। লুট চলেছে, কেউই দেখার নাই। এক কয়েদি আমাকে বলল, "দেখুন স্যার আমরা চোর, পেটের দায়ে চুরি করে জেলে এসেছি, আর আমাদের খাবার থেকে চুরি করে খেয়ে কেমন মোটা হয়েছে জেলের কিছু কর্মচারী।" আমি বললাম, "সকলে তো চুরি করে না।" সে বলল, "যার হাতে আছে সেই চুরি করে খায়।" আমার বুঝতে বাকি রইল না কাকে বলছে।

১৪ তারিখে রেণু বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। ঈদের জন্য এই অনুমতি দিয়েছে। বাইরে সকলেই ১৩ তারিখে ঈদ করেছে। ঈদের আনন্দ তো বন্দিদের থাকতে পারে না! তারপর আবার রেণু এক দুঃখের সংবাদ আমাকে জানাল। আমার ফুফাতো ভাই, ক্যান্সার হয়েছিল,

মারা গিয়াছে। মাদারীপুরে বাড়ি—ছোট বেলায় আমার ফুফা ও ফুফু মারা যান, আমার আব্বাই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমরা এক সাথেই ছিলাম। সিভিল সাপ্লাই অফিসে সামান্য চাকরি করত। কয়েকটা ছেলেমেয়ে রেখে গিয়াছে, জমিজমা যা ছিল প্রায়ই আড়িয়াল খাঁ নদী গ্রাস করে নিয়েছে। কি করে এদের চলবে? ছেলেমেয়েগুলি ছোট ছোট।

সময় কেটে গেল, রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি এসে শুয়ে পড়লাম, আর ভাবলাম এই তো দুনিয়া! রাত কেটে গেল, খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগল না। ছোট বেলায় আমি আর আমার ফুফাতো ভাই ৭/৮ বৎসর এক ঘরেই থেকেছি। ওর ডাকনাম ছিল তারা মিয়া।

১৫ তারিখে ৪০ সেলের পাগলা গারদের পাগল ভাইদের জন্য নিজেই মুরগি পাক করে পাঠাইয়া দিলাম। আমি না খেয়ে জমাইয়া ছিলাম। আমার যাওয়ার হুকুম নাই ওদের কাছে—যদিও খুবই কাছে আমি থাকি। জমাদার সাহেবকে ডেকে বললাম, আপনি দাঁড়াইয়া থেকে ওদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন। তিনি তাই করলেন। ওরা যে আমার বহুদিনের সাথী, ওদের কি আমি ভুলতে পারি? ভুলতে চেষ্টা করলেও সন্ধ্যার পরে ওরা আমাকে মনে করাইয়া দেয়—যখন ওরা আপন মনে চিৎকার করে আবার কেউ অদ্ভুত স্বরে গানও গায়।

মহা হৈ চৈ জেলের ভিতর। কারণ জেলের আইজি সাহেব ঢাকা জেল দেখতে আসবেন আগামীকাল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে কয়েদিদের। চুনা লাগানো হবে। জনাব নিয়ামতুল্লা আইজি হবার পূর্বে এই জেলেই সুপারিনটেনডেন্ট এবং ডিআইজি ছিলেন। তিনি ময়লা আবর্জনা দেখলে ক্ষেপে যান—সকলেই জানে। চমৎকার ব্যবহার, অমায়িক, ভদ্র, কোনো কয়েদি কষ্ট পাক এ তিনি চান না। আমি নিজেই দু'বার তাঁর সময়ে এই জেলে এসেছি। আমার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। এবারও যখন জেলে এসেছি তিনি খবর পেয়েই আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি সকল কয়েদিদেরই সুবিধা অসুবিধা দেখতেন। আমার দিকে তিনি ব্যক্তিগত নজর দিতেন। সাধারণ কয়েদিরা তাকে ভয়ও করে এবং ভক্তিও করে। কাহাকেও তিনি অন্যায়ভাবে কষ্ট দিতেন না। কয়েদিদের খাওয়া ও কাপড়ের দিকে নজর দিতেন। তিনি জেল দেখতে এসে আমার কাছে এলেন, বসলেন। আমার কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সাধারণত কিছু বলি না, কারণ নিজের ইজ্জত নিয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে যাই। আমি বললাম, ভালই

আছি। ডিপিআরের রাজনৈতিক বন্দিদের অসুবিধার কথা বললাম। 'এ' 'বি' 'সি' ভাগ না করে এক ক্লাশই করলে ভাল হয়। প্রায় সকলকেই 'সি' ক্লাস দেওয়া হয়েছে। দেড় টাকায় কি করে চলতে পারে খাবার, নাস্তা, চা ইত্যাদি। আবার কিছুই বাড়ি থেকে আনতে দিবে না। মাসে পাঁচ টাকা দেয় কাগজ, দাঁতন, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি কিনতে। একটা খবরের কাগজ কিনতে তো ছয় টাকা লাগে মাসে। তাঁর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও কিছু করার নাই, কারণ সরকারের হুকুম।

পাগলদের ৪০ সেল দেখাইয়া বললাম, দেখেন জেলের মধ্যে কি অবস্থা, আমাদের মত হতভাগাদের কি অসুবিধা হয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, কি করা যাবে, এতগুলি পাগল কোথায় রাখব? ব্যবস্থা তো নাই। আমি বললাম, চিন্তা করবেন না, প্রথম বেশ কষ্ট হয়েছিল। এখন সয়ে গেছে। সেলগুলির কথা বললাম। দশ সেল, পুরানা বিশ সেল, নূতন বিশ সেলে রাজনৈতিক বন্দিদের অসুবিধার কথাও বললাম। সাধারণ কয়েদিদের বিষয় আলোচনা হলো। তিনি বললেন, আপনাকে তো একলাই রাখা হয়েছে। বললাম, 'আপনারা কি করবেন, উপায় নাই যে। 'বড়কর্তারা' হুকুম দিয়েছে একাই থাকতে হবে'। তিনি বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা'। তাঁর সহানুভূতি থাকলেই বা কি হবে! পূর্ব বাংলার মোতয়াল্লি সাহেবের নজর বড় খারাপ আমার ও আমার পার্টির কর্মীদের উপর। জেলের ভিতরও যাতে কষ্ট পাই তার চেষ্টা তিনি করেন। আইজি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি আমার বইপড়ার কাজে মন দিলাম।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ ॥ ৮ই ফাল্গুন

আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। ঠিক পনের বছর আগে সেদিন ছিল বাংলা ১৩৫৮ সালের ৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ইংরেজি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শহীদ হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বীর সন্তান : ১। আবদুস সালাম, ২। আবদুল জব্বার, ৩। আবুল বরকত, ৪। রফিকউদ্দিন। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। ঠিক পনের বৎসর পূর্বে এইদিনে আমিও জেলে রাজবন্দি ছিলাম ফরিদপুর জেলে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করি। জানুয়ারি মাসে আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানেই ছাত্র

নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি অনশন করব আর ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা দিবস পালন করা হবে বলে স্থির হয়। আমাকে আবার জেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো চিকিৎসা না করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমাকে ও মহিউদ্দিনকে ফরিদপুর জেলে চালান দেওয়া হলো। মহিউদ্দিনও আমার সাথে অনশন করবে স্থির করে দরখাস্ত দিয়েছিল।

আজ ঠিক পনের বৎসর পরেও এই দিনটাতে আমি কারাগারে বন্দি।

প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (এখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ) ও তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে। ঐদিন ১০টায় আমি, জনাব শামসুল হক সাহেব সহ প্রায় ৭৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হই এবং আব্দুল ওয়াদুদ-সহ অনেকেই ভীষণভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়।

১৫ই মার্চ জনাব নাজিমুদ্দীন (তখন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার ছিলেন) সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলাপ করে ঘোষণা করলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আইন সভা হতে প্রস্তাব পাশ করাইবেন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে'। সকল বন্দিকে মুক্তি দিবেন এবং নিজেই পুলিশের অত্যাচারের তদন্ত করবেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমরা মুক্তি পাই।

১৬ই মার্চ আবার বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সভা হয়, আমি সেই সভায় সভাপতিত্ব করি। আবার বিকালে আইন সভার সামনে লাঠি চার্জ হয় ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। প্রতিবাদের বিষয় ছিল, 'নাজিমুদ্দীন সাহেবের তদন্ত চাই না, জুডিশিয়াল তদন্ত করতে হবে'। ২১শে মার্চ বা দুই একদিন পরে কায়েদে আজম প্রথম ঢাকায় আসবেন। সেই জন্য আন্দোলন বন্ধ করা হলো। আমরা অভ্যর্থনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। ছাত্ররা তাঁর সামনেই কনভোকেশনে প্রতিবাদ করল। রেসকোর্স ময়দানেও প্রতিবাদ উঠল। তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন এরপরে কোনোদিন ভাষার ব্যাপারে কোনো কথা বলেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রত্যেক বৎসর ১১ই মার্চকে 'ভাষা দিবস' পালন করেছে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলীম লীগ (এখন আওয়ামী লীগ) এই একই দিনে 'ভাষা দিবস' পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দান সবচেয়ে বেশি। পরে ইয়ুথ লীগও আন্দোলনে শরীক হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে ওয়াদা আইনসভায় করেছিলেন, ১৯৫২ সালে ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তা ভেঙ্গে পল্টনের জনসভায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে'। তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। আমি তখন বন্দি অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রাত্রের অন্ধকারে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সহায়তায় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদের দিন স্থির করা হয়। কারণ ২১শে থেকে বাজেট সেশন শুরু হবে। আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন শুরু করব মুক্তির জন্য। কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, মোল্লা জালালউদ্দিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন, খালেক নেওয়াজ, আজিজ আহম্মদ, আবদুল ওয়াদুদ ও আরো অনেকে গোপনে গভীর রাতে আমার সঙ্গে দেখা করত।

তখন জনাব নুরুল আমীন মুখ্যমন্ত্রী। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলি হলো। আমার ভাইরা জীবন দিয়ে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করল।

এইদিন আমাদের কাছে পবিত্র দিন। ১৯৫৫ সালে নূতন কেন্দ্রীয় আইন সভায় আওয়ামী লীগ ১২ জন সদস্য নিয়ে ঢুকল এবং তাদের সংগ্রামের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বাধ্য হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। আওয়ামী লীগ যখন ১৯৫৬ সালে ক্ষমতায় বসল তখন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করল। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই দিবসটা সরকারিভাবেও পালন করা হয়েছে। শহীদ মিনার করার জন্য পরিকল্পনা করে বাজেটে টাকা ধরে কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল জারি হওয়ার পরে এই দিনটি সরকারি ছুটির তালিকা থেকে বাদ পড়ল, আর মিনারটা চুনকাম করেই শেষ করে দেওয়া হলো।

আমি কারাগারের এই ছোট্ট ঘরটি থেকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই বাংলার যুব সমাজ ও জনসাধারণকে, আর শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ মজহারুল হক (বাকী) জামিন পেয়ে এতদিন জেলের বাহিরে যেতে পারে নাই। আজ সকালে তাকে কোর্টে পাঠাইয়া দিয়েছে। জেল হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে শহীদ দিবস পালন করছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ ॥ শনিবার

আজ আমার ১১টি মামলার একটা মামলা জেলগেটে, যার বিচার চলছে জনাব আফসারউদ্দিন সাহেবের কোর্টে; তার আরগুমেন্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হতে পারে নাই। কারণ আমার এডভোকেট জনাব সালাম খান সাহেব এবং জহিরুদ্দিন সাহেব উপস্থিত হতে পারেন নাই। জনাব মাহমুদুল্লা সাহেব হাজির হয়ে দরখাস্ত করেছিলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম। ডিএসপি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার আর একটি মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হবার কথা, কখন শুরু হবে? তিনি বললেন, সরকার নতুন এডিএম নিযুক্ত করেছেন, শীঘ্রই জেলগেটেই শুরু হবে। আমার এডভোকেট মাহমুদুল্লা সাহেব নোটিশ পেয়েছেন আমাকে হাজির করাবার জন্য। তিনি বলেছেন, আসামি কারাগারে সরকারের তত্ত্বাবধানে আছেন। সরকার ইচ্ছা করলেই হাজির করতে পারেন।

আফসারউদ্দিন সাহেবের কোর্টে মামলার দিন ঠিক হয়েছে মার্চ মাসের ১৮ তারিখে। যাহা হউক, এই মামলা দুই মাসের মধ্যেই যা হয় একটা হয়ে যাবে। আবার নতুন মামলা শুরু হবে। আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বললাম, চিন্তা করি না; ১১টা মামলা, চিন্তা করে কি হবে! গা ভাসাইয়া দিয়াছি। 'সাগরে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার।'

ভেবেছিলাম বড় ছেলেটি আসবে, বাসার খবর পাব। বোধ হয় আসতে পারে নাই। এ সপ্তাহে বাড়ির থেকে 'দেখাও' আসে নাই। বোধ হয় অনুমতি পায় নাই।

১লা মার্চ ১৯৬৭ ॥ বুধবার

গতকল্য মোলাকাত হয়েছে ছেলেমেয়েদের সাথে। শরীরটা যে ভাল যেতেছে না একথা বললাম না—গোপন করলাম যাতে চিন্তা না করে। কারাগারে দিনগুলি কেটে যেতেছে। বই পড়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নাই। খবরের কাগজ আর বই। খবরের কাগজগুলি খুললে শুধু আইয়ুব খান সাহেব ও মোনায়েম খান সাহেবের বক্তৃতা। মোনায়েম খান সাহেব তো রোজই একটা করে বিবৃতি অথবা বক্তৃতা দেন। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী সাহেবকে পরাজিত হতে হয়েছে মোনায়েম খান সাহেবের কাছে। এককালে খবরের কাগজে ভাসানী সাহেবকে পাওয়া যেত এখন খান সাহেবকে পাওয়া

যায়। পূর্ব বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি যিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাহেবের কাছ থেকে নিয়োগ পত্র পেয়েছেন।

১৬ই মার্চ ১৯৬৭ ॥ বৃহস্পতিবার

পাবনায় ভুট্টা খাওয়া নিয়ে ভীষণ গোলমাল চলেছে। প্রায় তিনশত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। একজন লোক মারা গিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা ভূতপূর্ব মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ভূতপূর্ব এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব আমিনউদ্দিন, আওয়ামী লীগ শ্রমিক নেতা আমজাদ হোসেন উকিল আরও বহুনেতা ও ছাত্র কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ত্রাসের রাজত্ব চলেছে সেখানে। অত্যাচার চরমে উঠেছে। ঘরে ঘরে যেয়ে অত্যাচার করছে। পূর্ণ সঠিক খবর এখনও পাই নাই।

১৭ই মার্চ ১৯৬৭ ॥ শুক্রবার

আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই—বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। 'আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস'! দেখে হাসলাম। মাত্র ১৪ তারিখে রেণু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখতে এসেছিল। আবার এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে অনুমতি কি দিবে? মন বলছিল, যদি আমার ছেলেমেয়েরা ও রেণু আসত ভালই হত। ১৫ তারিখেও রেণু এসেছিল জেলগেটে মণির সাথে দেখা করতে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি নূরে আলম—আমার কাছে ২০ সেলে থাকে, কয়েকটা ফুল নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। আমাকে বলল, এই আমার উপহার, আপনার জন্মদিনে। আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। তারপর বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার একটা রক্তগোলাপ এবং বাবু সুধাংশু বিমল দত্তও একটি শাদা গোলাপ এবং ডিপিআর বন্দি এমদাদুল্লা সাহেব একটা লাল ডালিয়া আমাকে উপহার দিলেন।

আমি থাকি দেওয়ানী ওয়ার্ডে আর এরা থাকেন পুরানা বিশ সেলে। মাঝে মাঝে দেখা হয় আমি যখন বেড়াই আর তারা যখন হাঁটাচলা করেন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য।

খবরের কাগজ পড়া শেষ করতে চারটা বেজে গেল। ভাবলাম 'দেখা' আসতেও পারে। ২৬ সেলে থাকেন সন্তোষ বাবু, ফরিদপুরে বাড়ি। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী দলে ছিলেন, বহুদিন জেলে ছিলেন। এবারে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পরে জেলে এসেছেন, ৮ বৎসর হয়ে গেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে প্রায় ১৭ বৎসর জেল খেটেছেন। শুধু আওয়ামী লীগের ক্ষমতার সময় মুক্তি পেয়েছিলেন। জেল হাসপাতালে প্রায়ই আসেন, আমার সাথে পরিচয় পূর্বে ছিল না। তবে একই জেলে বহুদিন রয়েছি। আমাকে তো জেলে একলাই অনেকদিন থাকতে হয়েছে। আমার কাছে কোনো রাজবন্দিকে দেওয়া হয় না। কারণ ভয় তাদের আমি 'খারাপ' করে ফেলব, নতুবা আমাকে 'খারাপ' করে ফেলবে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, ২৬ সেলে যাবেন। দরজা থেকে আমার কাছে বিদায় নিতে চান। আমি একটু এগিয়ে আদাব করলাম। তখন সাড়ে চারটা বেজে গিয়েছে, বুঝলাম আজ বোধ হয় রেণু ও ছেলেমেয়েরা দেখা করার অনুমতি পায় নাই। পাঁচটাও বেজে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জমাদার সাহেব বললেন, চলুন আপনার বেগম সাহেবা ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে রওয়ানা করলাম জেলগেটের দিকে। ছোট মেয়েটা আর আড়াই বৎসরের ছেলে রাসেল ফুলের মালা হাতে করে দাঁড়াইয়া আছে। মালাটা নিয়ে রাসেলকে পরাইয়া দিলাম। সে কিছুতেই পরবে না, আমার গলায় দিয়ে দিল। ওকে নিয়ে আমি ঢুকলাম রুমে। ছেলেমেয়েদের চুমা দিলাম। দেখি সিটি আওয়ামী লীগ একটা বিরাট কেক পাঠাইয়া দিয়াছে। রাসেলকে দিয়েই কাটালাম, আমিও হাত দিলাম। জেল গেটের সকলকে কিছু কিছু দেওয়া হলো। কিছুটা আমার ভাগ্নে মণিকে পাঠাতে বলে দিলাম জেলগেটে থেকে। ওর সাথে তো আমার দেখা হবে না, এক জেলে থেকেও।

আর একটা কেক পাঠাইয়াছে বদরুন, কেকটার উপর লিখেছে 'মুজিব ভাইয়ের জন্মদিনে'। বদরুন আমার স্ত্রীর মারফতে পাঠাইয়াছে এই কেকটা। নিজে তো দেখা করতে পারল না, আর অনুমতিও পাবে না। শুধু মনে মনে বললাম, 'তোমার স্নেহের দান আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। জীবনে

তোমাকে ভুলতে পারব না।' আমার ছেলেমেয়েরা বদরুনকে ফুফু বলে ডাকে। তাই বাচ্চাদের বললাম, 'তোমাদের ফুফুকে আমার আদর ও ধন্যবাদ জানাইও'।

ছয়টা বেজে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি রেণুকে ও ছেলেমেয়েদের বিদায় দিতে হলো। রাসেলও বুঝতে আরম্ভ করেছে, এখন আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। আমার ছোট মেয়েটা খুব ব্যথা পায় আমাকে ছেড়ে যেতে, ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ব্যথা আমিও পাই, কিন্তু উপায় নাই। রেণুও বড় চাপা, মুখে কিছুই প্রকাশ করে না।

ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। ঘরে ঢুকলাম, তালা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। ভোর বেলা খুলবে।

১৮ই মার্চ, ১৯৬৭ ॥ শনিবার

জেলগেটে আমার দ্বিতীয় মামলার সওয়াল জবাব হবে। ১০ ঘটিকা হতে বসে আছি প্রস্তুত হয়ে। ১২টার সময় আমাকে জেলগেটের কোর্টে নিতে এসেছে। যেয়ে দেখি জহির সাহেব, রব সাহেব, মাহমুদুল্লা সাহেব, আবুল হোসেন, জোহা চৌধুরী প্রমুখ এডভোকেট সাহেবরা এসে বসে আছেন হাকিমের সামনে।

আমার আত্মীয়স্বজন ছাড়াও মোস্তফা আনোয়ার, চৌধুরী নিজাম, আলি হোসেন ও কর্মীরাও এসেছে। ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা রেজাও এসেছে। ছাত্রলীগের নির্বাচন নিয়ে খুবই গোলমাল।

শুধু অনুরোধ করলাম, 'তোমরা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিও। ছাত্রলীগকে ভেঙে ফেলে দিও না। সকলকে আমার সালাম দিও।' ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান আমি গড়েছিলাম কয়েকজন নিঃস্বার্থ ছাত্রকর্মী নিয়ে। প্রত্যেকটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন, রাজবন্দিদের মুক্তি আন্দোলন, ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ও ছাত্রদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে বহু জেল-জুলুম সহ্য করেছে এই কর্মীরা। পূর্ব বাংলার ছয় দফার আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের পুরাভাগে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোলমাল হলে আমার বুকে খুব আঘাত লাগে। তাই রেজাকে বললাম, 'প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিও'।

মামলা আজ আর চলবে না। কারণ সরকার পক্ষের উকিল সাহেব অসুস্থ—উপস্থিত হতে পারেন নাই। কোর্টে শুনলাম আমার বিরুদ্ধে ঢাকার পাঁচটি

মামলা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ছয়টি মামলা দায়ের করেছে সরকার—চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পাবনা ও যশোরে। চার্জ শীটও নাকি দিয়েছে। যাহা হউক, প্রস্তুত আছি। হাইকোর্ট থেকে শাহ মোয়াজ্জেমকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়েছে। নূরে আলম সিদ্দিকী ছাত্রকর্মী, কোর্টের থেকে খবর নিয়ে এসেছে হাইকোর্টে তাকেও ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়েছে। এডভোকেট রব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, হাইকোর্ট এখনও ওর মামলার রায় দেয় নাই। ছেলেটা বাইরে যাবে বলে কত খুশি হয়েছে। আট মাস মিছামিছি ওকে ডিপিআর আইনে বন্দি করে রেখেছে। ওর ধারণা একটা মামলা ঢাকা কোর্টে আছে, জামিন পেলেই বাইরে যেতে পারবে। আমাকে বলেছিল, ওর বাবা বসে আছেন ঢাকায়, মুক্তির পরে ওকে নিয়ে বাড়ি যাবেন ঈদ করতে। আগামী ২২ তারিখে ঈদ। কি বলব ওকে ভিতরে যেয়ে। ভাবলাম, ধোঁকা দেওয়া ভাল হবে না। বলেই দেই সত্য কথা। জেলের ভিতরে যেয়ে ওকে খবর দিলাম, তুমি ভুল শুনেছ, তোমার মামলার রায় হয় নাই, ঈদের পরে হবে। মুখটা ওর কালো হয়ে গেল। মনে হলো খুবই আঘাত পেয়েছে। দিন কেটে গেল। রাত্র আটটায় হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমাকে ডাকছে, 'মুজিব ভাই', 'মুজিব ভাই' বলে। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি শাহ মোয়াজ্জেম। বললাম, 'কি ব্যাপার তুমি এখানে?' 'ডিপিআর থেকে মুক্তি পেয়েছি এখন—বিচারাধীন আসামি তাই ১০ সেল থেকে আমাকে নিয়ে এসেছে। ডিপিআরদের কাছে আমাকে রাখবে না।' জমাদার সাহেবকে বললাম, কোথায় রাখবেন? বলল, রাতে আর কোথায় রাখব ২০ সেলে আমার কাছাকাছি। বললাম, 'কাপড় চোপড় বিছানা আছে?' বলল, যা আছে চলে যাবে, খাবারও ১০ সেল থেকে রাতের জন্য আসবে। আমার সাথে কথা বলা নিষেধ, তবু রাস্তা যখন পড়েছে আমার ঘরের কাছ দিয়ে তখন মুখে হাত দিয়ে তো বন্ধ করতে পারে না। বললাম, আর চিন্তা কি! মামলা দুইটি আছে, জামিন পেয়েছ, আর দুই একদিন দেরি হতে পারে।

২২শে মার্চ ১৯৬৭ ॥ বুধবার

আজ কোরবানির ঈদ। গত ঈদেও জেলে ছিলাম। এবারও জেলে। বন্দি জীবনে ঈদ উদ্‌যাপন করা একটি মর্মান্তিক ঘটনা বলা চলে। বার বার আপনজন বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়ে, পিতামাতার কথা মনে পড়ে।

ইচ্ছা ছিল না নামাজে যাই। কিইবা হবে যেয়ে, কয়েদিদের কি নামাজ হয়! আমি তো একলা থাকি। আমার সাথে কোনো রাজনৈতিক বন্দিকে থাকতে দেয় না। একাকী কি ঈদ উদ্‌যাপন করা যায়? জেলার সাহেব নামাজ বন্ধ করে রেখে আমাকে নিতে আসেন। তাই যেতে বাধ্য হলাম।

মোশতাককে আনা হয়েছে রাজশাহী জেল হতে গত মে মাসে। ঢাকা থেকে পাবনা জেলে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাজউদ্দীন এখনও ময়মনসিংহ জেলে আটক আছে। মোশতাক, জালাল, মোমিন সাহেব, ওবায়দুর রহমান, সিরাজ, সুলতান নামাজ পড়তে এসেছে ১০ সেল থেকে। মিজানুর রহমান ও নারায়ণগঞ্জের মহিউদ্দিন নামাজে আসে নাই। পুরানা হাজত থেকে মণি, হালিম আরও অনেকে এসেছে।

১/২ ওয়ার্ড থেকে রুহুল আমিন, প্রতাপউদ্দিন সাহেব, আবদুস সালাম খান ও অনেকে এসেছে। সকলের সাথেই দেখা হয়ে গেল। মোশতাকের শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ১০ সেল থেকে নূরুল ইসলাম আমার সাথেই নামাজে যায়। তাকে সিলেট জেল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার টিবি ভাল হয়ে গিয়েছে।

শাহ মোয়াজ্জেম হাইকোর্ট থেকে হেবিয়াস কর্পাস করে মুক্তি পেয়ে হাজতে আছে। তার বিরুদ্ধে দুইটা মামলা আছে। একটি জামিন পেয়েছে আর একটি জজকোর্ট থেকে জামিন পায় নাই। এখন হাইকোর্টে যেতে হবে। শাহ মোয়াজ্জেম একজন এডভোকেট, তাঁর জামিন না দেওয়ার কি কারণ বুঝতে পারলাম না। বাড়ি থেকে খাবার পাঠাইয়াছিল। আমি শাহ মোয়াজ্জেম, নূরুল ইসলাম, নূরে আলম সিদ্দিকীকে নিয়ে খেলাম। হ্যাঁ খেতে হবে। রেণু বোধ হয় ভোর রাত থেকেই পাক করেছে, না হলে কি করে ১২টার মধ্যে পাঠাল!

নামাজ পড়ার পরে শত শত কয়েদি আমাকে ঘিরে ফেলল। সকলের সাথে হাত মিলাতে আমার প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

২৩শে মার্চ ১৯৬৭—৭ই এপ্রিল ১৯৬৭

আজও কারাগারের কয়েদিদের ছুটি। পাকিস্তান দিবস আজ। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে। মরহুম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এইদিনে পাকিস্তানকে

রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। এই দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র তৈয়ার না করার জন্য দুই পাকিস্তানে আজও ভুল বুঝাবুঝি চলছে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনিতে পরিণত করা হয়েছে। আমি যে ৬ দফা প্রস্তাব করেছি, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে—লাহোর প্রস্তাব ভিত্তি করে, সে প্রস্তাব করার জন্য আমি ও আমার সহকর্মীরা কারাগারে বন্দি। ইত্তেফাক কাগজ ও প্রেস বাজেয়াপ্ত এবং মালিক ও সম্পাদক মানিক ভাই কারাগারে বন্দি। এই দাবির জন্যই ৭ই জুন ৭ শত লোক গ্রেপ্তার হয় এবং ১১ জন জীবন দেয় পুলিশের গুলিতে। আমি দিব্যচোখে দেখতে পারছি দাবি আদায় হবে, তবে কিছু ত্যাগের প্রয়োজন হবে। আজকাল আবার রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন লাহোর প্রস্তাবের দাম নাই। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিলে পাকিস্তান দুর্বল হবে। এর অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি লোককে বাজার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। চিরদিন কাহাকেও শাসন করা যায় না, যতই দিন যাবে তিক্ততা আরও বাড়বে এবং তিক্ততার ভিতর দিয়ে দাবি আদায় হলে পরিণতি ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা আছে। লাহোর প্রস্তাব আমি তুলে দিলাম : 'Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute Independent States in which constituent units shall be autonomous and sovereign.'

March 23, 1940

Moved by Late A. K. Fazlul Haque

আজ ২৫ দিন চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছে। শান্তিপূর্ণভাবে এদের ধর্মঘট চলেছে। টঙ্গিতে গোলমাল সৃষ্টি করে আজ শত শত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হয়েছে। চারজনকে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

২৫/৩০ জনকে ডিপিআর আইনে বন্দি করেছে আর সবাইকে মামলা দিয়ে হাজতে রেখেছে। চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক আবদুল মান্নানকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। কিছুদিন পূর্বেও খাদ্য আন্দোলন করার অপরাধে ন্যাপ সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ, সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সিরাজুল হোসেন খান ও কৃষক নেতা হাতেম আলি খানকে ধরে এনেছে। নতুন বিশ সেলে রাখা হয়েছে। ডিপিআর করে দিয়েছে, বিনা বিচারে বন্দি। জেল-জুলুম, অত্যাচার, গুলি সমানে পূর্ব বাংলায় চলেছে।

আইয়ুব খান সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে এসেছেন ২৭শে মার্চ। এপ্রিল মাসের তিন তারিখে ঢাকা থেকে রাজধানীতে ফিরে গিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসনের অর্থ তিনি করেছেন পূর্ব বাংলাকে নাকি আলাদা করার ষড়যন্ত্র। তিনি যাহাই বলুন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতেই হবে একদিন। না দিলে ফলাফল খুবই খারাপ হবে। ইতিহাস এই শিক্ষাই দিয়েছে। যখনই জনাব পূর্ব বাংলায় আসেন তখনই তাকে বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় লাখ লাখ টাকা খরচ করে। দেখে মনে হয় তিনি বাদশা হয়ে প্রজাদের দেখতে আসেন। পশ্চিম পাকিস্তান তাঁর দেশ আর পূর্ব বাংলা তাঁর কলোনী। কারণ লাহোর করাচী গেলে তো গেট করা হয় না, মালা কিনে বিলি করা হয় না। ট্রাক, বাস ভরে ভাড়াটিয়া লোক নেওয়া হয় না। তিনি দুনিয়াকে দেখাতে চান তাঁর জনপ্রিয়তা। কিন্তু জনগণের ভোটে ইলেকশন হলে পূর্ব বাংলায় তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হত একথা তিনি বুঝেও বুঝতে চান না।

পূর্ব বাংলার মাটিতে বিশ্বাসঘাতক অনেক পয়দা হয়েছে, আরও হবে, এদের সংখ্যাও কম না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের স্থান কোথায় এরা দেখেও দেখে না! বিশেষ করে একদল বুদ্ধিজীবী যেভাবে পূর্ব বাংলার সাথে বেঈমানী করছে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

সামান্য পদের বা অর্থের লোভে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করার সুযোগ দিতেছে দুনিয়ার অন্য কোথাও এটা দেখা যায় না। ছয় কোটি লোক আজ আস্তে আস্তে ভিখারি হতে চলেছে। এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথাও চিন্তা করে না।

কয়েকদিন পূর্বে খবর পেয়েছিলাম আব্বা খুবই অসুস্থ। আমার ভাই তাঁকে খুলনায় নিয়ে এসেছে চিকিৎসা করাতে। একটু আরোগ্যের দিকে চলেছে। আমার ভাই সরকারকে টেলিগ্রাম করেছে আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য

প্যারোলে ছেড়ে দিতে, কারণ আব্বা আমাকে দেখতে চান। ৮০ বৎসরের উপরে বয়স। আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আমি জানি না আমার মত এত স্নেহ অন্য কোনো ছেলে পেয়েছে কিনা! আমার কথা বলতে আমার আব্বা অন্ধ। আমরা ছয় ভাই বোন। সকলে একদিকে, আমি একদিকে। খোদা আমাকে যথেষ্ট সহ্য শক্তি দিয়েছে, কিন্তু আমার আব্বা-মার অসুস্থতার কথা শুনলে আমি পাগল হয়ে যাই, কিছুই ভাল লাগে না। খেতেও পারি না, ঘুমাতেও পারি না। তারপর আবার কারাগারে বন্দি। আমি কারাগারে বন্দি অবস্থায় যদি আমার বাবা বা মায়ের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে সহ্য করতে পারব কিনা জানি না। এখন আমার ৪৭ বৎসর বয়স, আজও আব্বা ও মায়ের গলা ধরে আমি আদর করি, আর আমাকেও তাঁরা আদর করেন। খোদাকে ডাকা ছাড়া কি উপায় আছে।

৬ই এপ্রিল থেকে আমার বড় ছেলে কামাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। কোনো খবর পাই নাই কেমন পরীক্ষা দিল।

আমি সরকার বা আইজির কাছে কোনো দরখাস্ত সচরাচর করি না। আব্বার খবর জানবার জন্য একটা বিশেষ দেখার অনুমতি চেয়েছিলাম আমার স্ত্রীর সাথে। আজ সাত তারিখ, কোনো খবর নাই।

১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকবার এবং অনেকদিন জেল খেটেছি। এবার জনাব মোনায়েম খান যে ব্যবহার করেছেন এরূপ ব্যবহার আগে কেহই করেন নাই। রীতিমত অপমান করেছেন আমাদের। মার্শাল ল'এর সময়ও এ ব্যবহার পাই নাই। খোদা করলে বেঁচে আমি থাকব এবং মোনায়েম খান সাহেবের সাথে নিশ্চয়ই 'দেখা' হবে।

আজ কয়েকদিন পর্যন্ত পাগলের উৎপাতে ঘুমাতে পারি না। যেখানে থাকি তার থেকে মাত্র ৪০ হাত দূরে ৪০ জন পাগল রাখা হয়েছে। আর আমার খাটের থেকে তিন হাত ও ছয় হাত দূরে নিউ বিশ সেলে দুইটা লোহার টিন দিয়ে ঘেরা বড় কপাট। রাতে দুই ঘণ্টা পর পর সিপাহি বদলী হয় আর বিকট শব্দ করে আমার ঘুম ভেঙে দেয়। অনেকদিন সারারাত ঘুমাতে পারি না। আবার কোনো কোনো দিন ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এ জন্য প্রায়ই আমার মাথার যন্ত্রণা হয়। জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছি সিপাহিরা যাতে শব্দ না করে তার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাগল নিয়ে কি করবেন? তারা তো ভয় পায় না।

৮ই এপ্রিল—১০ই এপ্রিল ১৯৬৭

আজ জেল গেটে ১৯৬৫ সালের ২০শে মার্চ তারিখে পল্টন ময়দানের সভায় যে বক্তৃতা করেছিলাম সেই বক্তৃতার মামলার সওয়াল জবাব শেষ হয়। জনাব আবদুস সালাম খান সাহেব ও জহিরউদ্দিন সাহেব আমার পক্ষে সওয়াল জবাব করেন। সরকারি উকিল জনাব মেজবাহউদ্দিন সরকারের পক্ষে করেন। প্রায় চার ঘণ্টা চলে। ৬ দফা দাবি কেন সরকারের মেনে নেওয়া উচিত তার উপরই বক্তৃতা করেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া দরকার। দেশরক্ষা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। আরও অনেককিছু।

আমি নাকি হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণা পয়দা করতে চেয়েছি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমার বুকে ব্যথা, কিন্তু তা বলতে পারব না। আমার পকেট মেরে আর একজন টাকা নিয়ে যাবে, তা বলা যাবে না! আমার সম্পদ ছলে বলে কৌশলে নিয়ে যাবে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা—বলা যাবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটা রাজধানী করা হয়েছে যেমন করাচী, পিন্ডি এখন ইসলামাবাদ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা বন্ধ করার টাকা চাওয়া যাবে না।

দেশরক্ষা আইনে বিচার হয়েছে। এই একই ধরনের বক্তৃতার জন্য ডজন খানেক মামলা দায়ের করা হতেছে। মামলার কিছুই নাই, আমাকে জেল দিতে পারে না। যদি নিচের দিকে জেল দিতে বাধ্য হয় তবে জজকোর্ট ও হাইকোর্টে টিকবে না। সহকর্মী অনেকে এসেছিল, দেখা হলো। কামাল এসেছিল। বলল, পরীক্ষা ভাল দিয়েছে। আব্বা খুলনায় আমার ভাইয়ের বাসায় চিকিৎসাধীনে আছেন। একটু ভালর দিকে। এখনও আরোগ্য লাভ করেন নাই। মাও সাথে আছেন।

সালাম সাহেবের সাথে আরো দুইটা মামলা ও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। পাবনায় জনসাধারণ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর চরম অত্যাচার চলছে। আওয়ামী লীগের সকল নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে ফেলেছে। জামিন দেওয়া হয় নাই। সালাম সাহেব নিজে গিয়েছিলেন জামিন নিতে। তাঁকে দেখা করতে দেয় নাই বন্দিদের সাথে।

১১ই এপ্রিল—১৩ই এপ্রিল ১৯৬৭

শাহ মোয়াজ্জেম হাইকোর্ট থেকে ডিপিআর আইনে মুক্তি পেলেও একটা মামলায় জামিন না পাওয়ার জন্য জেলে সাধারণ কয়েদি হয়ে কষ্ট পেতেছে। বক্তৃতার মামলায় সেশন জজ সাহেবও জামিন দেন নাই। হাইকোর্টে জামিনের জন্য আর্জি পেশ করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত শুনানি হয় নাই। বড় দুঃখ করছিল, বলছিল সহকর্মীরা একটু চেষ্টা করলেই জামিন হয়ে যেত। পুরানা বিশ সেলে আছে। আমার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে নিজেও একজন এডভোকেট। তার অন্যান্য এডভোকেটদের উপর দাবি বেশি।

আমার ওয়ার্ডটার নাম সিভিল ওয়ার্ড। ৪০ হাত দূরের পুরানা ৪০ সেলকে পাগলা গারদ বলা হয়। দিনে প্রায় ৭০ জন আর রাত্রে ৩৭ জন পাগল থাকে। ৩৭টা সেলের তিনটা সেল নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকদিন ধরে পাগলরা রাতে খুব চিৎকার করতে শুরু করেছে। দিনের বেলায় আমি ঘুমাই না, রাতে যাতে ঘুম হয়। কিন্তু পাগলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যাই। রাতে মাঝে মাঝে বসেও থাকতে হয়। জেল কর্তৃপক্ষকে কি বলব? পাগল রাখবার জায়গা আর নাই।

সিভিল ওয়ার্ডের সামনে ছোট একটা মাঠ আছে। সেখানে কয়েকটা আম গাছ আছে। ফুলের বাগান করেছি। জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। আবার কোথায় দিবে ঠিক কি? রাতে যখন ঘুমাতে পারি না তখন মনে হয় আর এখানে থাকবো না। সকাল বেলা যখন ফুলের বাগানে বেড়াতে শুরু করি তখন রাতের কষ্ট ভুলে যাই। গাছতলায় চেয়ার পেতে বসে কাগজ অথবা বই পড়ি। ভোরের বাতাস আমার মন থেকে সকল দুঃখ মুছে নিয়ে যায়। আমার ঘরটার কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০টা-১১টার সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। ওদের খেলা আমি দেখি। ওদের আমি ভালবেসে ফেলেছি বলে মনে হয়। ১৯৫৮ সালে দুইটা হলদে পাখি আসত। তাদের চেহারা আজও আমার মনে আছে। সেই দুইটা পাখির পরিবর্তে আর দুইটা পাখি আসে। পূর্বের দুইটার চেয়ে একটু ছোট মনে হয়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাখি দুইটা আসত। এবার এসে তাদের কথা আমার মনে আসে, আমি খুঁজতে শুরু করি। এবারও ঠিক একই সময় দু'টা হলদে পাখি এখানে আসত। মনে হয় ওদেরই বংশধর ওরা।

তারা বোধ হয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়াছে। ১০টা-১১টার মধ্যে ওদের কথা এমনি ভাবেই আমার মনে এসে যায়। চক্ষু দুইটা অমনি গাছের ভিতর দিয়া ওদের খুঁজতে থাকি। কয়েকদিন ওদের দেখতে পাই না। রোজই আমি ওদের খুঁজি। তারা কি আমার উপর রাগ করে চলে গেল? আর কি ওদের আমি দেখতে পাব না? বড় ব্যথা পাব ওরা ফিরে না আসলে। পাখি দুইটা যে আমার কত বড় বন্ধু যারা কারাগারে একাকী বন্দি থাকেন নাই তারা বুঝতে পারবেন না। আমাকে তো একেবারে একলা রেখেছে। গাছপালা, হলদে পাখি, চড়ুই পাখি আর কাকই তো আমার বন্ধু এই নির্জন প্রকোষ্ঠে। যে কয়েকটা কবুতর আমার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে বাচ্চা দেয়। কাউকেও আমি ওদের ধরতে দেই না। সিপাহি জমাদার সাহেবরাও ওদের কিছু বলে না। আর বাচ্চাদেরও ধরে নিয়ে খায় না। বড় হয়ে উড়ে যায়। কিছুদিন ওদের মা-বাবা মুখ দিয়ে খাওয়ায়। তারপর যখন আপন পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখে এবং মা-পায়রার নতুন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন ওই বাচ্চাদের মেরে তাড়াইয়া দেয়। আমি অবাক হয়ে ওদের কীর্তিকলাপ দেখি।

কাকের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। আমার সামনের আম গাছ কয়টাতে কাক বাসা করতে আরম্ভ করে। আমি বাসা করতে দেব না ওদের। কারণ ওরা পায়খানা করে আমার বাগান নষ্ট করে, আর ভীষণভাবে চিৎকার করে। আমার শান্তি ভঙ্গ হয়। আমি একটা বাঁশের ধনুক তৈয়ার করে মাটি দিয়ে গুলি তৈয়ার করে নিয়েছি। ধনুক মেরেও যখন কুলাতে পারলাম না তখন আমার বাগানী কাদের মিয়াকে দিয়ে বার বার বাসা ভেঙে ফেলি। বার বারই ওরা বাসা করে। লোহার তার কি সুন্দরভাবে গাছের সাথে পেঁচাইয়া ওরা বাসা করে। মনে হয় ওরা এক এক জন দক্ষ কারিগর, কোথা থেকে সব উপকরণ যোগাড় করে আনে আল্লাহ জানে! পাঁচটা আম গাছ থেকে ৫/৭ বার করে বাসা ভেঙে ফেলি, আর ওরা আবার তৈরি করে। ওদের ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখে মনে মনে ওদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হই। তিনটা গাছ ওদের ছেড়ে দিলাম—ওরা বাসা করল। আর একটা গাছ ওরা জবর দখল করে নিল। আমি কাদেরকে বললাম, "ছেড়ে দেও। করুক ওরা বাসা। দিক ওরা ডিম। এখন ওদের ডিম দেওয়ার সময়—যাবে কোথায়?"

এই সমস্ত বাসা ভাঙবার সময় আমি নিজে ধনুক নিয়ে দাঁড়াতাম আর গুলি ছুঁড়তাম। ভয় পেয়ে একটু দূরে যেয়ে চিৎকার করে আরো কিছু সঙ্গী সাথী

যোগাড় করে কাদেরকে গাছেই আক্রমণ করত। দুই একদিন শত শত কাক যোগাড় করে প্রতিবাদ করত। ওদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে আমি মনে মনে প্রশংসা করলাম। বাঙালিদের চেয়েও ওদের একতা বেশি।

এখন চারটা বাসায় ডিম দিয়েছে। একটা বাসায় বসে থাকে আর একটা পাহারা দেয়। দাঁড়কাক ওদের শত্রু। দুই পক্ষের যুদ্ধও দেখেছি। তুমুল কাণ্ড! ছোট কাকদের সাথে শেষ পর্যন্ত পারে না। দাঁড় কাক যুদ্ধ ভঙ্গ করে পালাইয়া যায়। বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে যদি দাঁড়কাকদের মত শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তবে নিশ্চয়ই তারাও জয়লাভ করত। তাই কাকের অধ্যবসায়ের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখে আমার মনে দুঃখও হয়েছে, কারণ আমার ঘর ভেঙেই তো আমাকে কারাগারে বন্দি করে রেখে দিয়েছে।

কিছুদিন পর্যন্ত কাকরা আমাকে দেখলেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করত, ভাবত আমি বুঝি ওদের ঘর ভাঙবো। এখন আর আমাকে দেখলে ওরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করে না, আর নিন্দা প্রস্তাবও পাশ করে না।

১৩ তারিখে আমার ১৯৬৪ সালের আর একটা মামলা শুরু হয়েছে জেলগেটে। এটাও পল্টনের বক্তৃতার মামলা। ঢাকার এডিসি মিঃ খানকে সরকার স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। এটা ১২৪-এ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা। জেলগেটে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছিলেন। আমিও হাজির হয়েছিলাম। শুধু এডভোকেট মাহমুদুল্লা সাহেব এসেছিলেন। জহির, আবুল কেহই প্রথমে আসতে পারে নাই। আমি দরখাস্ত করতে বললাম। মামলা আজ হতে পারবে না কারণ আমার এডভোকেট সাহেবরা আজ আসতে পারবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগামী ২২/৪/৬৭ তারিখে দিন ঠিক করে চলে গেলেন, ঠিক তার দুই মিনিট পরে জহির সাহেব এলেন।

নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোস্তফা, কামাল এসেছিল। কামাল পরীক্ষা ভালই দিয়েছে। এই খবরটার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। আব্বা একটু ভালর দিকে চলেছেন। কিছু সময় কথাবার্তা বলে আমার পুরানা জায়গায় ফিরে এলাম। খোন্দকার মোশতাক জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার শরীর খুবই খারাপ। আমার জায়গা থেকে আমি দেখলাম মোশতাক হাসপাতালের বারান্দায় চেয়ারে বসে রয়েছে। চেনাই কষ্টকর। বেচারাকে কি কষ্টই না দিয়েছে! একবার পাবনা, একবার রাজশাহী একবার ঢাকা জেল।

১৪ই এপ্রিল—১৫ই এপ্রিল ১৯৬৭

১৪ তারিখে ১৫ দিন পরে ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎ পেলাম। একটা দরখাস্ত করেছিলাম বিশেষ দেখার অনুমতি চেয়ে, ডিআইজি সাহেব অনুমতি তো দেনই নাই, জবাব দেওয়াও দরকার মনে করেন নাই। কারও কাছে দরখাস্ত আমি খুব একটা করি না, কারণ উত্তর না দিলে আত্মসম্মানে বাঁধে। আব্বা অসুস্থ তাঁর সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। সেকথাও লিখেছিলাম। বহু জেল খেটেছি এ অবস্থা কোনোদিন দেখি নাই। সকলেই বলে কি করব? উপরের চাপ। অর্থাৎ লাট সাহেবেরা নিষেধ করে দিয়েছেন। লাট সাহেব দেখার অনুমতি দিতে নিষেধ করেছেন এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

আজকাল শাসন ব্যবস্থা যা হয়েছে, হলে হতেও পারে। জানি না সত্য কি মিথ্যা তবে কানে এসেছে জনাব মোনেম খান সাহেব নাকি হুকুম দিয়েছেন আওয়ামী লীগ বিশেষ করে আমার কোনো ব্যাপার হলে তাকে খবর দিতে হবে এবং অনুমতি নিতে হবে। চীফ সেক্রেটারী বা সেক্রেটারী সাহেবও কোনো কিছুর অনুমতি দিতে পারেন না। ১৪ দিন পরে একদিন 'দেখা' আইনে আছে, তাই বোধ হয় তিনি বন্ধ করেন নাই মেহেরবানি করে। হুকুম দিলেই বন্ধ হয়ে যেত, বড়ই দয়া করেছেন! টাকা আনা, খাবার আনা, সকল কিছুই তো বন্ধ করে দিয়েছেন যাতে কারাগারের রাজনৈতিক বন্দিরা কষ্ট পায় এবং আদর্শচ্যুত হয়ে যায়, বন্ড দিয়ে বের হয়ে যায়। ভুল করেছেন তিনি—এঁরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু বাঁকা হবে না। নীতির জন্য, আদর্শের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য যারা ছেলেমেয়ে সংসার ত্যাগ করে কারাগারে থাকতে পারে, যে কোনো কষ্ট স্বীকার করবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

জেল গেটে যখন উপস্থিত হলাম ছোট ছেলেটা আজ আর বাইরে এসে দাঁড়াইয়া নাই দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম। আমি যখন রুমের ভিতর যেয়ে ওকে কোলে করলাম আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মার কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' ওর মা বলল, "বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতে।" রাসেল 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মার গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা।' আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।

এক ঘণ্টা সময়। সংসারের কথা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, আব্বা মা'র শরীরের অবস্থা আলোচনা করতে করতে চলে যায়। কোম্পানী আজও আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেয় নাই, তাই একটু অসুবিধা হতে চলেছে বলে রেণু বলল। ডিসেম্বর মাসে আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি–চারমাস হয়ে গেল আজও টাকা দিল না! আমি বললাম, 'জেল থেকে টেলিগ্রাম করব। প্রথম যদি না দেয় তবে অন্য পন্থা অবলম্বন করব। আমার টাকা তাদের দিতেই হবে। কোনোমতে চালাইয়া নিয়ে যাও। বাড়ির থেকে চাউল আসবে, নিজের বাড়ি, ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা আছে, বছর খানেক ভালভাবেই চলবে, তারপর দেখা যাবে। আমার যথেষ্ট বন্ধু আছে যারা কিছু টাকা ধার দিতে কৃপণতা করবে না'। 'যদি বেশি অসুবিধা হয় নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে ছোট বাড়ি একটা ভাড়া করে নিব', রেণু বলল। সরকার যদি ব্যবসা করতে না দেয় তবে বাড়িতে যে সম্পত্তি আমি পেয়েছি আব্বার, মায়ের ও রেণুর তাতে আমার সংসার ভালভাবে চলে যাবে। রেণু বলল, 'চিন্তা তোমার করতে হবে না।' সত্যই আমি কোনোদিন চিন্তা বাইরেও করতাম না, সংসারের ধার আমি খুব কমই ধারি'।

সরকারের এক বিশেষ দফতরের একজন কর্মচারী যার সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কলকাতায় পরিচয় ছিল–তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবেরও ভক্ত ছিলেন এবং চাকরি করতেন। কলকাতায় বাড়ি। আমাকে কিছু মিষ্টি পাঠাইয়াছেন এই কথা বলে 'আমি যেন তার এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করি।' এঁর সাথে বহুদিন আমার দেখা হয় নাই। তিনি আরো বলেছেন, ছয় দফা দাবি সমর্থন প্রায়ই সকলে করে তবে বলতে পারে না। এঁর পরিচয় আজ দেওয়া উচিত হবে না, কারণ সে এক বিশেষ দফতরে আছে। সরকার খবর পেলে শুধু চাকরিই নিবে না, জেলেও দিতে পারে।

আজ বাংলা নববর্ষ, ১৫ই এপ্রিল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি নূরে আলম সিদ্দিকী, নূরুল ইসলাম আরও কয়েকজন রাজবন্দি কয়েকটা ফুল নিয়ে ২০ সেল ছেড়ে আমার দেওয়ানীতে এসে হাজির। আমাকে কয়েকটা গোলাপ ফুল দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাল। ২৬ সেল হাসপাতাল থেকে বন্ধু খোন্দকার মোশতাক আহমদও আমাকে ফুল পাঠাইয়াছিল। আমি ২৬ সেল থেকে নতুন বিশ সেলে হাজী দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, হাতেম আলি খান, সিরাজুল হোসেন খান ও মৌলানা সৈয়াদুর রহমান সাহেব, ১০ সেলে রফিক সাহেব, মিজানুর রহমান, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুল মোমিন,

ওবায়দুর রহমান, মহিউদ্দিন, সুলতান, সিরাজ এবং হাসপাতালে খোন্দকার মোশতাক সাহেবকে ফুল পাঠাইলাম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে। শুধু পাঠাতে পারলাম না পুরানা হাজতে, যেখানে রণেশ দাশগুপ্ত, শেখ ফজলুল হক (মণি)—আমার ভাগনে, হালিম, আবদুল মান্নান ও অন্যরা থাকে—এবং ১/২ খাতায় যেখানে শ্রমিক নেতারা, ওয়াপদার কর্মচারী ও কয়েকজন ছাত্র থাকে। তাদের মুখে খবর পাঠাইলাম আমার শুভেচ্ছা দিয়ে। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল; কারও সাথে কারও দেখা হয় না—বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দিদের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। এরা তো 'রাষ্ট্রের শত্রু'! বিকালে পুরানা বিশ সেলের সামনে নূরে আলম সিদ্দিকী, নূরুল ইসলাম ও হানিফ খান কম্বল বিছাইয়া এক জলসার বন্দোবস্ত করেছে। বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার, শুধাংশু বিমল দত্ত, শাহ মোয়াজ্জেম আরও কয়েকজন ডিপিআর ও কয়েদি, বন্দি জমা হয়ে বসেছে। আমাকে যেতেই হবে সেখানে, আমার যাবার হুকুম নাই তবু আইন ভঙ্গ করে কিছু সময়ের জন্য বসলাম। কয়েকটা গান হলো, একজন সাধারণ কয়েদিও কয়েকটা গান করল। চমৎকার গাইল। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে, প্রেম করে একজনকে বিবাহ করেছিল। পরে মামলা হয়। মেয়েটা বাবা মায়ের চাপে উল্টা সাক্ষী দেয় এবং নারীহরণ মামলায় ৭ বৎসরের জেল নিয়ে এসেছে। ছোট হলেও জলসাটা সুন্দর করেছিল ছেলেরা।

আমি কারাগার থেকে আমার দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

১০ সেল থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইয়া একটা টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত কবিতাটা লিখে পাঠায়,

> 'আজিকের নূতন প্রভাতে নূতন বরষের আগমনে
> - মুজিব ভাইকে'
>
> 'বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেউ রও,
> ক্ষমা কর আজিকার মত,
> পুরাতন বরষের সাথে,
> পুরাতন অপরাধ হতে।'
>
> নববর্ষের শ্রদ্ধাসহ মিজান
> ১লা বৈশাখ ১৩৭৪ সাল।

১৩৭৩ সালের বৈশাখ হতেই আমার উপর সরকারের জুলুম পুরাদমে শুরু হয়। এর পূর্বেও পাঁচটা মামলা ঢাকা কোর্টে দায়ের করা হয়। একটি মামলায় আমাকে ঢাকার এডিসি জনাব বদিউল আলম এক বৎসরের জেল দেয়,

হাইকোর্ট আমাকে জামিনে মুক্তি দেয়। অন্য মামলাগুলি চলছিল। ৩রা বৈশাখ খুলনায় মিটিং করে ঢাকায় মোটরে ফেরার পথে ৪ঠা বৈশাখ আমাকে যশোরে গ্রেপ্তার করে এবং জামিনে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসি।

৭ই বৈশাখ আবার আমাকে ঢাকায় গ্রেপ্তার করে সিলেটে পাঠায়।

৮ই বৈশাখ আমার জামিনের আবেদন মহকুমা হাকিম অগ্রাহ্য করে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

৯ই বৈশাখ জেলা জজ বাহাদুর আমাকে জামিনে মুক্তি দেন। পুনরায় জেল গেটে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করে।

১০ই বৈশাখ আমার জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করে আমাকে জেলে পাঠাইয়া দেয়।

১১ই বৈশাখ জেলা জজ আমাকে জামিনে মুক্তি দেন আমি মোটরে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করি।

২৪শে বৈশাখ তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জহুর আহমেদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) ও আমাকে ডিপিআর হিসাবে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে বন্দি করে এবং চট্টগ্রামে জনাব এম, এ আজিজকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে বন্দি করে। ২৪শে বৈশাখ থেকে আজ পর্যন্ত কারাগারেই বন্দি আছি।

১৬ই এপ্রিল—২২শে এপ্রিল ১৯৬৭

শরীর কেন যেন আবার কিছুটা খারাপ হয়েছে। কয়েকদিন পর্যন্ত মাথার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্যারিডন খাই। খাওয়ার পরে কিছু সময় ভাল থাকি, আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়, আবার খাই। এইভাবে তিন দিন চলে। মাথার যন্ত্রণা হলে লেখাপড়া করতে পারি না, লেখাপড়া না করলে সময় কাটাই কি করে?

কিছু সময় আজকাল শাহ মোয়াজ্জেমের সাথে আলাপ করতে সুযোগ পাই। ডিপিআর থেকে মুক্তি পেয়ে ও বন্দি আছে কয়েদি হয়ে, এখনও জামিন পায় নাই, কয়েকদিনের মধ্যে জামিন হয়ে যাবে। পুরানা ২০ সেলে রেখেছে। প্রায় একমাস সাধারণ কয়েদি থেকে দুই তিন দিন হলো ডিভিশন পেয়েছে। খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও আবদুল মোমিন সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মোশতাক সাহেবের শরীর খুবই খারাপ, অনেক ওজন কম হয়ে

গেছে। মোমিন সাহেব এখন ভাল। তাদের সাথে দেখা হয়েছিল হাসপাতালের দরজায়। তারা সব দলের ঐক্য চায়, তবে পূর্ব বাংলার দাবি ছেড়ে নয়, ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে। মোমিন সাহেব নতুন জেলে এসেছেন কিন্তু একটুও ঘাবড়ান নাই। খুবই শক্ত। আদর্শনিষ্ঠা আছে, পূর্ব বাংলাকে ভালবাসে, সংগ্রাম চালাইয়া যেতে পারবে। মোশতাক সাহেব তো পুরানা পাপী। অত্যন্ত সহ্য শক্তি, আদর্শে অটল। এবার জেলে তাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে। একবার পাবনা জেলে, একবার রাজশাহী জেলে আবার ঢাকা জেলে নিয়ে। কিন্তু সেই অতি পরিচিত হাসি খুশি মুখ।

নূরুল ইসলাম ও নূরে আলম সিদ্দিকী পুরানা ২০ সেলে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই ছুটে আমার কাছে চলে আসে, সিপাহিদের মুখ শুকাইয়া যায়। জমাদার সাহেবরা কি বলবে? ছেলে মানুষ এরা, জেলের আইন টাইন বেশি মানতে চায় না। আমি বুঝাইয়া রাখি। নূরুল ইসলাম পুরানা কর্মী। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। মাঝে মাঝে ওর সাথে আমি পরামর্শ করি। বড় শান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লেও, জানার ও পড়ার আগ্রহ আছে। আমি ওকে খুবই স্নেহ করি। আজ প্রায় ১০ বৎসর আমার সাথেই আছে। যাহা হুকুম করি হাসিমুখে পালন করে। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না।

নূরে আলম সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভাল লেখাপড়া জানে, এমএ প্রথম ভাগ জেল থেকেই দিয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেছে। বয়স খুবই অল্প। বাংলা ভাষার উপর অধিকার আছে। চমৎকার বক্তৃতাও করে। দেশের প্রতি ভালবাসা আছে। বাংলার মানুষকে ভালবাসে। কিছুটা চঞ্চল প্রকৃতির। তাই একটু বেশি কথা বলে, বয়সের সাথে ঠিক হয়ে যাবে। 'রক্ত কপোত' নামে একটা বই লেখার জন্য একটা মামলার আসামি আছে, মাঝে মাঝে কোর্টে যায়। ছাত্রদের সাথে কোর্টে গেলে দেখা হয় তাতে খুব আনন্দ পায়। তার মা মারা গেছেন। বাবার একমাত্র ছেলে। খুবই আদরের। মাঝে মাঝে বাবা মা'র কথা বলে। তাকে আমি খুবই স্নেহ করি। প্রথম প্রথম ভেবেছিল ছেড়ে দিবে এখন সহজে ছাড়া পাবে না বুঝতে পেরেছে। কতদিন থাকতে হয় তাই মাঝে মাঝে ভাবে। একদিন আমাকে বলে, "বস, আপনাকে যদি ছেড়ে দেয় আর আমাকে রেখে দেয় তবে আমার দশাটা কি হবে?" ওকে অন্য জায়গায় নিতে চেয়েছিল, আমার কাছ থেকে যেতে চায় না। আমি বললাম, "তুমি পাগল, আমার মুক্তির অনেক দেরি কত বৎসর থাকতে হয় ঠিক নাই। আর আমি যখন মুক্তি পাব তার অনেক পূর্বেই তোমরা ছাড়া পাবা। মনে রেখ থরোর কথা–

'Under a government which imprisons any unjustly, the place for a just man is also a Prison.'

আমি ভালই আছি। যেখানে বিচার নাই, ইনসাফ নাই, সেখানে কারাগারে বাস করাই শ্রেয়।

আবার সর্বদলীয় ঐক্য নিয়ে তাড়াহুড়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি এক হয়ে আইয়ুব সাহেবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য। সংগ্রাম কে করবে জানি না, তবে পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন চারিদিক থেকে উঠতে শুরু করেছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, সরকার সমর্থক বা বিরুদ্ধদল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলার লোকদের ধোঁকা দেওয়ার আর একটা ষড়যন্ত্র কিনা কে জানে?

আজ ২২ তারিখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নবাবজাদা নসরুল্লাহ খাঁ, মালিক গোলাম জিলানী, গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, মালিক সরফরাজ ও জনাব আকতার আহম্মদ খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং আবদুস সালাম খান, জহিরুদ্দিন, মশিয়ুর রহমান, নজরুল ইসলাম, এম এ আজিজ, আবুল হোসেন এবং আরো অনেকে জেল গেটে কোর্টে আমার সাথে দেখা করতে আসে। যশোর থেকে আবদুর রশিদ, খুলনা থেকে আবদুল মোমেন এসেছিল। অনেক আলাপ হলো। যুক্তফ্রন্ট করা যায় কিনা? নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট করার আপত্তি অনেকেরই নাই তবে ৬ দফা দাবি ছাড়তে কেহই রাজি নয়। এটা আওয়ামী লীগের কর্মসূচি হলেও জনগণ সমর্থন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, জেল খাটছে। এই দাবি পূরণ না হলে পূর্ব বাংলার জনগণের বাঁচবার কোনো পথ নাই। আমি আমার মতামত দেই নাই কারণ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা নিজেরাই আলোচনা করে তাদের পথ ঠিক করুক। আমি আমার মত চাপাইয়া দিতে যাবো কেন? আমি বন্দি। বাইরের অবস্থা তারাই ভাল জানে। তবে ৬ দফা দাবি দরকার হলে একলাই করে যাবো।

২৩শে এপ্রিল—২৭শে এপ্রিল ১৯৬৭

বিরোধীদলগুলি নিম্নতম কর্মসূচির মাধ্যমে ঐক্যজোট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় সকল দলের নেতৃবৃন্দই এসেছেন। শুধু ন্যাপ নেতারা আসেন নাই। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি ও পূর্ব বাংলার ওয়ার্কিং কমিটির সভা একসাথে ডাকা হয়েছে। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ঐক্যজোটের পক্ষে মত দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভিতরে

তীব্র মতভেদ হয়েছে শুনলাম। যতবারই আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট ও ঐক্যজোট করতে চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। আমি, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন, বিশিষ্ট নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ জেলে আছি। আমরা ৬ দফা দাবির জন্য জেলে এসেছি। আজও প্রচার সম্পাদক আব্দুল মোমিন, কালচারাল সম্পাদক ওবায়দুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রভাবশালী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন, মহীউদ্দিন আহম্মদ সিটি আওয়ামী লীগ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা সিটির অফিস সেক্রেটারি মোহাম্মদ সুলতান এবং ঢাকা জেলা অফিস সেক্রেটারি সিরাজউদ্দিন জেলে।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ একটা প্রস্তাবও পাশ করে নাই আমাদের মুক্তির জন্য।

মোল্লা জালাল ও সিরাজউদ্দিনকে কুমিল্লা জেলে হঠাৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যাপার বুঝলাম না। এই সময় এদের বদলি করার অর্থ কি? এতদিন জেলে রাখার পরেও সরকারের রাগ মেটে নাই। জালালের ফ্যামিলি ঢাকায়। সিরাজের বাবা মা কেহই নাই। ঢাকায় দুই একজন বন্ধু-বান্ধব আছে। জেলের ভিতর আমার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। আমি পড়ে দেখলাম একটা 'শুভঙ্করীর ফাঁকি' ছাড়া আর কিছুই না। ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন না মানলে ঐক্য হয় কি করে?

নিম্নে প্রস্তাবটা উঠাইয়া রাখলাম ভবিষ্যতের জন্য।

Nawabjada Nasrulla's Draft–

1. The constitution shall provide for a federation of Pakistan with Parliamentary form of government, supremacy of legislature, directly elected on the basis of universal adult franchise, complete and full fundamental rights, unfettered freedom of the press and independence of the judiciary.

2. The federal government shall deal with the following subject–
   - (I) Defence
   - (II) Foreign Affairs
   - (III) Currency and Federal Finance
   - (IV) Inter wing communication and trade and such other subject as may be agreed upon.

3. There shall be full regional Autonomy and residuary powers in regard to all other subjects shall vest in the govt. as enmisiged by the constitution in the two wings.

4. It shall be the constitutional responsibility of the government of Pakistan to remove economic disparity between the two wings of the country in the course of ten years and within this period to spend all the foreign exchange earned by East Pakistan exclusively in that wing. The Foreign exchange acquired by the provinces shall be at the absolute disposal of the provincial governments, after allowing for East Pakistan's proportionate share of the defence, foreign expenditure and the central liabilities. The government of Pakistan shall also give priority in foreign aid and loan to East Pakistan till economic disparity is removed and shall adopt such fiscal and monetary policies as would stop the flight of capital from the Eastern wing. For this purpose appropriate legislation shall be enacted from time to time with regard to bank deposit and profits insurance premium and industrial profits in particular.

5. Currency, Foreign Exchange and Central Banking.

   (I) Inter Wing Trade.

   (II) Inter Wing Communication.

   (III) Foreign Trade

Should each be managed by a board consisting of an equal number of members from East and West Pakistan.

6. The Supreme Court and all departments of central services including diplomatic services and autonomous bodies shall consist of an equal number of persons from East and West Pakistan. To achieve this parity future appointments should be made in a manner so that the total strength of such officers be brought at par within a period of ten years.

7. It shall be the constitutional responsibility of the Government of Pakistan to bring at par the effecting fighting and fire power in the

armed services in the two wings of the country and to that end to establish a Military Academy, Ordnance Factories, Cadet Colleges and School, raise recruits for the three services from East Pakistan and shift the Headquarters of the Pakistan Navy to East Pakistan to ensure implementation of the above, a Defence Council consisting of equal number of members from East and West Pakistan shall be established.

8. The Constitution in this declaration means the constitution of 1956 which shall be promulgated immediately. Within six months of the promulgation of the constitution, General Election shall be held to the Central and Provincial Assemblies. The foremost business transacts by the National Parliament shall be The Incorporation of the changes as spelt out in the Preceding clauses into the constitution.

আমাদের দলের অনেক নেতা এটা গ্রহণ করেছেন; এর মধ্যে যে কত ফাঁক রেখেছে যারা একটু চিন্তা করে দেখবে তারা সহজেই বুঝতে পারবে। আমার মত জানবার চেষ্টা করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধী দলের ঐক্য চাই, কিন্তু জনগণের দাবি জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রস্তাব দিয়েছে আমার মত নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে। কোর্টে জহির সাহেব আমার কাছে মত জিজ্ঞাসা করেছেন আর বলেছেন অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে–পিছান কষ্টকর। আমি আমেনা, আজিজ, মোস্তফা ও জহির সাহেবকে বলে দিয়েছি ঐক্যে আমার আপত্তি নাই তবে সকল বিরোধী দলকে নিতে হবে, ন্যাপকে বাদ দেওয়া চলবে না; দ্বিতীয়ত পার্টির কাজ বন্ধ হবে না–৬ দফার আন্দোলন চালাইয়া যাবে পার্টি। আমি ও আমার সহকর্মী যারা জেলে আছি বিশেষ করে খোন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দীন ও আমাকে কোনো সর্বদলীয় কমিটিতে রাখবা না। আমরা ৬ দফা দাবির জন্য জেলে এসেছি। অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে, অনেক কর্মী জেল খাটছে তাদের ত্যাগের দাম আমাকে দিতেই হবে। তাদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না। তবে ঐক্য হউক, এই সমস্ত নেতারা কি করে দেখি? এরা ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে কিনা আমি জানি না। তবে

আমার সন্দেহ আছে! আমি তোমাদের বাধা দিতে চাই না, তবে উপরে উল্লেখিত দাবি না মানলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ যোগদান করবে না। যদি করে তাতে আমি আর কি করতে পারি! আমিতো জেলেই আছি।

২৭ তারিখে আমার একটা মামলার রায়, ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় বক্তৃতা দানের অভিযোগে। জনাব আফসার উদ্দিন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জেলগেটের অভ্যন্তরে কোর্ট করে আমার বিচার করেন এবং আমাকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারা বলে ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

এই দণ্ড দেওয়ার পরেই জহিরের সাথে আমার আলাপ হয়। আমি তাকে বললাম আমাকে জেল দিয়েছে আমি বিনা বিচারে বন্দি আছি। কতকাল থাকতে হয় জানি না, আমার পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করা সম্ভব নয়। যাহা ভাল বোঝ কর। আমি জানি ৬ দফা দাবি পূরণ হওয়া ছাড়া এদের বাঁচবার উপায় নাই। আজ আমি এক বৎসর দেশরক্ষা আইনে বিনা বিচারে জেলে আছি। আমার সহকর্মীরাও আছে। আমি দেখলাম আমার অবর্তমানে দুই গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। একদল ৬ দফা ছাড়া আপোষ করবে না আর একদল নিম্নতম কর্মসূচিতেই রাজি।

আমাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদি করা হয়েছে। রোজ খাবার আড়াই টাকার মত এখন পাব। একলা থাকি একলাই পাক করাইয়া খাই। কি করে চলবে! যারা আমার খানা পাক করে আর যারা আমার দেখাশোনা করে তাদের রেখে তো কোনোদিন কিছু খাই না।

জামিন দিল না। আজ থেকে আমি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। তবে দেশরক্ষা আইনে বিনা-বিচারের আদেশও থাকবে যদি জামিন পাই। জজকোর্টে আপীল করার পরে আবার দেশরক্ষা আইনে বিনাবিচারে জেলে থাকতে হবে। আমার পক্ষে সবই সমান। আর একটা মামলায়ও আমার জেল আছে আড়াই বৎসর। সেটাও বক্তৃতা মামলা, হাইকোর্টে পড়ে আছে। কনফার্ম করেছে এক বৎসর খাটতে হবে যদি হাইকোর্ট থেকে মুক্তি না পাই। বুঝতে পারলাম আরও যে ছয়-সাতটা বক্তৃতার মামলা আছে সব মামলাই নিচের কোর্টে আমাকে সাজা দিবে। শুধু মনে মনে বললাম :

'বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা।
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

কবিগুরুর এই কথাটা আমার মনে পড়ল।

আজ ২৭শে এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯৬২) যখন তিনি ঢাকায় মারা যান সেদিনও আমি জেলে ছিলাম। হক সাহেব ছিলেন পূর্ব বাংলার মাটির মানুষ এবং পূর্ব বাংলার মনের মানুষ। মানুষ তাঁহাকে ভালবাসতো ও ভালবাসে। যতদিন বাংলার মাটি থাকবে বাঙালি তাঁকে ভালবাসবে। শেরে বাংলার মতো নেতা যুগ যুগ পরে দুই একজন জন্মগ্রহণ করে।

শেরে বাংলা হক সাহেব ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন এবং সেই প্রস্তাবের জন্যই আজ আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। লাহোর প্রস্তাবে যে কথাগুলি ছিল আমি তুলে দিলাম—'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এ দেশের কয়েক কোটি মুসলমান দাবি করিতেছে যে সব এলাকা একান্তভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার বদল করিয়া ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক যাহাতে উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্টেটস্-এর রূপ পরিগ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।' ...

এই লাহোর প্রস্তাবের কথা বললে আজ অনেক তথাকথিত নেতারা ক্ষেপে যান এবং আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে শুধু গালি দেন বা কারাগারেও বৎসরের পর বৎসর বন্দি করে রাখেন। যে দিন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গঠন করা যাবে সেইদিনই শেরে বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হবে এবং তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

শেরে বাংলা তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা নিজেই লেখে রেখে গেছেন তা হলো :

Self Analysis

'In my stormy and chequered life chance has played more than her fair part. The fault has been my own. Never at any time have I tried

to be the complete master of my own fate. The strongest impulse of the moment has governed all my actions. When chance has raised me to dazzling heights, I have received her gifts without-stretched hands. When she has cast me down from my high pinnacle, I have accepted her buffets without complaint. I have my hours of pinnacle and regret. I am introspective enough to take an interest in the examination of my own conscience. But this self-analysis has always been ditched. It has never been morbid. It has neither aided nor impeded the fluctuations of my varied career. It has availed me nothing in the external struggle which man wages on behalf of himself against himself. Disappointments have not cured me of ineradicable romanticism. If at times I am sorry for something I have done, remorse assails me only for the things I have left undone.'

Fazlul Haq

শেরে বাংলার এই সামান্য কথা থেকে আমরা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি।

আজ লাহোর প্রস্তাবের মালিকের মৃত্যুবার্ষিকী। আর লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি করে আমি যে ৬ দফা দাবি পেশ করেছি তার উপর বক্তৃতা করার জন্য এ দিনটিতে আমাকে ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। আল্লার মহিমা বোঝা কষ্টকর!

২৮শে এপ্রিল—৩০শে এপ্রিল ১৯৬৭

কারাদণ্ড হওয়ার পরে জেলের ভিতরে যখন আমি ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম আমার ভিতরে আসার পূর্বেই সাধারণ কয়েদিরা খবর পেয়েছে যে, আমাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল এই জুলুমের কি কোনো প্রতিকার নাই? এদের চোখে মুখে বেদনা ভরা। দুই একজন তো কেঁদেই দিল। আমি ওদের হাসতে হাসতে বললাম, 'দুঃখ করবেন না। আমি তো এই পথে জেনে শুনেই নেমেছি। দুঃখ তো আমার কপালে আছেই। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে, কষ্ট ও জুলুম স্বীকার করতে হয়।' আমার কাছে কোনো কয়েদির দেখা করা বা কথা বলা

নিষেধ। তবুও সিপাহি জমাদারদের বলে এরা ফাঁকে ফাঁকে পালাইয়া আসে। কত দরদ ভরা এদের মন। কেন যে এরা আমাকে ভালবাসে আজও বুঝতে পারলাম না। পাষাণ প্রাচীর ঘেরা এই কারাগারের বন্দি কয়েদিরাও আজ চায় নিজের অধিকার নিয়ে বাঁচতে। তারাও বুঝতে শুরু করেছে তাদের শোষণ করছে কোনো এক অঞ্চলের এক শোষকগোষ্ঠী। দিন ভরেই কয়েদিরা আসছে আর আফসোস করছে। হায়রে বাঙালি শুধু কাঁদতেই শিখেছে আর কিছুই করার ক্ষমতা তোমাদের নাই!

আজ ১৪ দিন হয়ে গেছে, রেণু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসবে বিকাল সাড়ে চারটায়। চারটার সময় আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম। পৌনে পাঁচটায় সিপাহি আসলো আমাকে নিতে। আজ তো আমি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি, আইবি অফিসার আইনতভাবে আমরা যখন আলাপ করবো তখন থাকতে পারবে না। যেয়ে দেখলাম আইবি অফিসার ঠিকই এসেছে তবে কিছু দূরে বসে আছে। আমরা যে রুমে বসে আলাপ করবো সে রুমে বসে নাই। রুমে এলে আমি বাধ্য হতাম তাকে বের করে দিতে। আর দিতামও। বহুদিন পরে ছেলেমেয়েদের ও রেণুর সাথে প্রাণ খুলে কথা বললাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা। ঘর সংসার, বাড়ির কথা আরও অনেক কিছু। আমার শাস্তি হয়েছে বলে একটুও ভীত হয় নাই, মনে হলো পূর্বেই এরা বুঝতে পেরেছিল। রেণু বলল, পূর্বেই সে জানতো যে আমাকে সাজা দিবে। দেখে খুশিই হলাম। ছেলেমেয়েরা একটু দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হলো, তবে হাবভাবে প্রকাশ করতে চাইছে না। বললাম, 'তোমরা মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ, আমার কতদিন থাকতে হয় জানি না। তবে অনেকদিন আরও থাকতে হবে বলে মনে হয়। আর্থিক অসুবিধা খুব বেশি হবে না, তোমার মা চালাইয়া নিবে। কিছু ব্যবসাও আছে আর বাড়ির সম্পত্তিও আছে। আমি তো সারাজীবনই বাইরে বাইরে অথবা জেলে জেলে কাটাইয়াছি তোমার মা'ই সংসার চালাইয়াছে। তোমরা মানুষ হও।' ছোট মেয়েটা বলল, 'আব্বা এক বৎসর হয়ে গেল।' আমি ওকে আদর করলাম, চুমা দিলাম। আর বললাম, 'আরও কত বৎসর যায় ঠিক কি?' আপীল করবার কথা বললাম। আর নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও পাবনার মামলাগুলির কাগজপত্র আনাতে এবং হাইকোর্টে মামলা করতে বললাম যাতে সকল মামলা ঢাকায় আনা হয়। জেলে বসেই নিম্ন আদালতের বিচারগুলি হয়ে যায়। সবই বক্তৃতার মামলা।

রেণু শুনল। এখন যাহা পাই একলার পাক করে খাওয়া কষ্টকর। আমাকে বলল, কিছু প্রয়োজন আছে কিনা? বললাম, দেখা যাক কি হয় তারপর দরকার হলে জানাব। রাসেল একবার আমার কোলে, একবার তার মার কোলে, একবার টেবিলের উপরে উঠে বসে। আবার মাঝে মাঝে আপন মনেই এদিক ওদিক হাঁটাচলা করে। বড় দুষ্ট হয়েছে, রেহানাকে খুব মারে। রেহানা বলল, 'আব্বা দেখেন আমার মুখখানা কি করেছে রাসেল মেরে।' আমি ওকে বললাম, 'তুমি রেহানাকে মার? রাসেল বলল, 'হ্যাঁ মারি।' বললাম, 'না আব্বা আর মেরো না।' উত্তর দিল, 'মারবো।' কথা একটাও মুখে রাখে না। জামাল বলল, 'আব্বা আমি এখন লেখাপড়া করি।' বললাম, 'তুমি আমার ভাল ছেলে মন দিয়ে পড়িও।' সন্ধ্যা হয়ে এলে ছেলেমেয়েদের চুমা দিয়ে ও রেণুকে বিদায় দিলাম। বললাম, 'ভাবিও না অনেক কষ্ট আছে। প্রস্তুত হয়ে থাকিও।'

ফিরে এলাম। একটু পরেই তালাবন্ধ হয়ে গেল। আমিও বই নিয়ে বসলাম। রাত্র দশটা পর্যন্ত লেখাপড়া করি আজকাল। তারপর খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোনো দিন শুয়েই ঘুম এসে যায় আবার কোনোদিন পাগল ভাইদের চিৎকার শুনি মশারির ভিতরে শুয়ে।

২৯ তারিখ সকালে বসে কাগজ পড়ছি, ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখতে আসলেন। বললাম, রোগ ও শোক এই দুইটাতো কারাগারের সাথী–কি আর দেখবেন? সকালে ১০টা-১১টা পর্যন্ত কাগজ অথবা বই পড়ি। ১২টার সময় দেখি রেণু কয়েক সের চাউল, কিছু ডাউল, তেল, ঘি, তরকারি, চা, চিনি, লবণ, পিঁয়াজ ও মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ডিভিশন 'ক' কয়েদিরা বাড়ির থেকে এসব আনতে পারে ডিআইজি প্রিজনের অনুমতি নিয়ে। অনুমতি নিয়েই পাঠাইয়াছে দেখলাম। ভালই হয়েছে। কিছুদিন ধরে পুরানা বিশ সেলে যে কয়েকজন ছাত্র বন্দি আছে তারা খিচুড়ি খেতে চায়। বহুদিন আমাকে বলেছে কিন্তু কুলাতে পারব না বলে নড়াচড়া করি না। কিছু কিছু বাঁচাইয়াছি, কয়েকটা মুরগি, কিছু ডিমও জোগাড় করেছি। নূরুল ইসলাম, নূরে আলম সিদ্দিকী ও আরও কয়েকজন মিলে 'খিচুড়ি সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেছে। খিচুড়ি আদায় করতেই হবে। একদিন হঠাৎ আমার পাকের ঘরের কাছে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, সেখানে খবরের কাগজে কালি দিয়ে লিখে কাঁঠাল গাছে টানাইয়া রেখেছে কোনো কয়েদিকে দিয়ে। তাতে

লেখা আছে 'আমাদের দাবি মানতে হবে, খিচুড়ি দিতে হবে।' নীচে লেখা 'খিচুড়ি সংগ্রাম পরিষদ'। আমি তো নূরুল ইসলামের হাতের লেখা চিনি। বাইরে ও পোস্টার লেখতো। তারই হাতে লেখা। আমি তাদের ডেকে বললাম, এসব দাবি টাবি চলবে না। দরকার হলে জনাব মোনেম খানের পন্থা অবলম্বন করব। খুব হাসাহাসি চললো। মাঝে দুই একজনে দুই একবার শ্লোগানও দিয়েছে–'খিচুড়ি দিতে হবে।'

আজ সুযোগ হয়ে গেল। মালপত্র পাওয়া গেল। বিকালে তাদের বললাম 'যাহা হউক তোমাদের ভাবির দৌলতে তোমাদের খিচুড়ি মঞ্জুর করা গেল। আগামীকাল খিচুড়ি হবে।'

যথারীতি রবিবার সকাল থেকে খিচুড়ি পাকের জোগাড়ে আত্মনিয়োগ করা হলো। রেণু কিছু ডিমও পাঠাইয়াছে। কয়েকদিন না খেয়ে কয়েকটা ছোট ছোট মুরগির বাচ্চাও জোগাড় করা হয়েছে। আমি তো জেলখানার বাবুর্চি, আন্দাজ করে বললাম কি করে পাকাতে হবে এবং আমার কয়েদি বাবুর্চিকে দেখাইয়া দিলাম। পানি একটু বেশি হওয়ার জন্য একদম দলা দলা হয়ে গেছে। কিছু ঘি দিয়ে খাওয়ার মত কোনোমতে করা গেল। পুরানা বিশ সেলে আট জন ডিপিআর, তাদের ফালতু, পাহারা, মেট চারজন করে দেওয়া হলো। আমার আশে পাশেও ৮/১০ জন আছে সকলকেই কিছু কিছু দেওয়া হলো। ডিম ভাজা, ঘি ও অল্প অল্প মুরগির গোস্তও দেওয়া হলো। গোসল করে যখন খেতে বসলাম তখন মনে হলো খিচুড়ি তো হয় নাই তবে একে ডাউল চাউলের ঘণ্ট বলা যেতে পারে। উপায় নাই খেতেই হবে কারণ আমিই তো এর বাবুর্চি। শাহ্ মোয়াজ্জেম, নূরে আলম, নূরুল ইসলাম বলল, 'মন্দ হয় নাই।' একটু হেসে বললাম, 'যাক আর আমার মন রাখতে হবে না। আমিই তো খেয়েছি।' যাহা হউক খিচুড়ি সংগ্রাম পরিষদের দাবি আদায় হলো, আমিও বাঁচলাম।

বিকালে শুনলাম মণিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, শরীর খারাপ করেছে। দুইদিন পরে আইন পরীক্ষা দিবে। একটু চিন্তাযুক্ত হলাম। খবর নিয়ে জানলাম, চিন্তার কোনো কারণ নাই।

১লা মে—২রা মে ১৯৬৭

খবরের কাগজের মারফতে দেখতে পেলাম কয়েকটি বিরোধী দল ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটা ঐক্য জোট গঠন করেছে। ঐক্য জোটের নাম দেওয়া হয়েছে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন'। কর্মসূচি পূর্বেই আমি পেয়েছি।

ঐক্যজোটের চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান এবং গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর, কাউন্সিল মোছলেম লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানা, খাজা খয়ের উদ্দিন এবং তোফাজ্জল আলি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জনাব নূরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান খান এবং হামিদুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামী পার্টির জনাব তোফায়েল মোহাম্মদ, জনাব আবদুর রহিম এবং জনাব গোলাম আজম, নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মহম্মদ আলি, জনাব ফরিদ আহম্মদ এবং এম আর খান স্বাক্ষর করেন।

৮ দফা কর্মসূচী

(১) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য। পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে :

(ক) দেশরক্ষা, (খ) বৈদেশিক বিষয়, (গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থনীতি, (ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলি স্বীকৃত হইবে।

(৩) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে, এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা শাসনতন্ত্রের মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিকট অর্পিত হইবে।

(৪) দশ বৎসরের মধ্যে উভয় প্রদেশের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ করা সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকিবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতি পূর্ব পাকিস্তানের আনুপাতিক ভাগ বাদ দিয়া পূর্ব

পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় হইবে। এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বলবৎ থাকা পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। এবং এমন অর্থনীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে পূর্বাঞ্চল হইতে মূলধন পাচার বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের মওজুদ ও মুনাফা বীমা প্রিমিয়াম ও শিল্প ক্ষেত্রে মুনাফা সম্পর্কে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৫) (ক) মুদ্রা, বৈদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং, (খ) আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য, (গ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলির ভার জাতীয় পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত বোর্ডের উপর অর্পণ করা হইবে।

(৬) সুপ্রিম কোর্ট এবং কূটনীতিক সার্ভিস সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগের ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সম-সংখ্যক ব্যক্তি গ্রহণ করা হইবে। এই সংখ্যা সাম্য লাভের জন্য ভবিষ্যতের নিয়োগ এমনভাবে করা হইবে যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে বৈষম্য দূর হয়।

(৭) দেশরক্ষা বাহিনীর শক্তিতে উভয় প্রদেশের মধ্যে সমতাবিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল নির্মাণ করা হইবে। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটা শাখায় লোক নিয়োগ করা হইবে এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হইবে। ইহা বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সমসংখ্যক সদস্য লইয়া একটা প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(৮) এই শাসনতন্ত্রের অর্থ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র অবিলম্বে ক্ষমতায় আসীন হইবার পর জারি করা হইবে এবং জারি করার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কর্মসূচীর দুই ও সাত নম্বর ধারা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সকল অঙ্গ দল ও সংস্থা এই উদ্দেশ্য সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২রা মে—৩রা মে ১৯৬৭

হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং মিসেস আমেনা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতি দেন ঐক্যফ্রন্টের চুক্তিতে স্বাক্ষর সম্বন্ধে। তারা বিবৃতিতে বলেন, ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে আওয়ামী লীগের শামিল হওয়া এবং ঐক্যফ্রন্ট গঠনের চুক্তিতে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর দানের বৈধতা সম্পর্কে।

আবার জহির সাহেবেরও একটি বিবৃতি দেখলাম। মহা চিন্তায় পড়লাম। অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইলাম। তারপর কলম ধরলাম। আমার মতামত দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যাহা চেয়েছিল তাহাই হলো। আওয়ামী লীগ ভাঙতে। এখন দুই দলের ইজ্জতের প্রশ্ন হয়েছে। আমি আশ্চর্য হলাম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রস্তাব দেখে। পাকিস্তান অবজারভারের ২রা মে-র কাগজে এই প্রস্তাবটি উঠেছে তাতে লেখা আছে :

> 'The All Pakistan Awami League Working Committee at its meeting in Dacca on April 23 discussed Six-Point Programme of East Pakistan Awami League. On the basis of this programme it evolved a formula in which besides the restoration of complete democracy in the country the genuine demands of East Pakistan People were incorporated. This formula was unanimously adopted by the East Pakistan Awami League also as the basis for negotiations with other political Parties. Says press release'.

আমি বুঝতে পারলাম না কেমন করে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে এই আট দফা দাবির মধ্যে।

৩রা মে—২৩শে মে ১৯৬৭

কিছুদিন থেকে শরীরের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। প্রায় ৭ সের ওজন কমে গেছে। অর্শ রোগ হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে পায়খানার দ্বার দিয়ে। শরীরের প্রতি যত্ন নিয়েও কিছু হচ্ছে না। দুর্বল হয়ে পড়েছি। ৩রা মে দেশরক্ষা আইনে (বিনা বিচারে) শেষ তিন মাসের সরকারি হুকুমনামা

আমাকে দেওয়া হয় নাই। এক বৎসর শেষ হয়ে গেছে ৩রা মে তারিখে। ৪ তারিখে হুকুম পাব আশা করেছিলাম। বুঝতে পারলাম আমার ১৫ মাস জেল হয়েছে। আমি দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি তাই হুকুম নামা দেওয়া হয় নাই। এখন আমি শুধু দণ্ডভোগ করছি। আপীল দায়ের করা হয়েছে সাজার বিরুদ্ধে। আপীল মঞ্জুরও হয়েছে। আগামী ২৯ তারিখে জামিন সম্বন্ধে শুনানি হবে ঢাকা জেলা জজের কাছে। যদি জামিন পেয়ে যাই তবে সরকার আবারও আমাকে ডিপিআর-এ বিনা বিচার আইনে বন্দি করে রাখবেন। ১৯শে জুন তারিখে মামলার শুনানি হবে বলে জজ সাহেব বলে দিয়েছেন।

হাইকোর্ট থেকে একটা হুকুম পেয়েছি যে বক্তৃতার মামলায় জনাব ম্যাপেক–প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, আমাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে সরকার হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আগামী ২৯ তারিখে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে তার শুনানি হবে বলে নোটিশ পেয়েছি। কাগজটা পাঠাইয়া দিয়েছি রেণু'র কাছে এডভোকেটদের সাথে পরামর্শ করে যে কোনো একজন ভাল এডভোকেট দিয়ে মামলা পরিচালনা করতে। এতগুলি বক্তৃতার মামলা দিয়েছে। দুইটায় সাজা হয়েছে, একটায় খালাস পেয়েছি, তার বিরুদ্ধেও আপীল করতে সরকারের কত উৎসাহ। যদিও এডভোকেট সাহেবরা টাকা নেয় না, তথাপি নকল ও অন্যান্য খরচ বাবদ অনেক টাকা ব্যয় হয়। জেলে আছি উপার্জন নাই। ছেলেমেয়েদের খুবই অসুবিধা হবে। লড়তে হবে, উপায় কি? রাজনৈতিক কারণে মানুষ মানুষকে অত্যাচার করে তবে তার একটা সীমা আছে ও লজ্জা আছে। নিশ্চয়ই জনগণ বুঝতে পারে যে একটা লোককে ধ্বংস করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। সরকার নিশ্চয়ই জানে 'যার কিছুই নাই তার আবার কিছু নষ্ট হবার ভয় কি?' একটা 'দোষ' বোধ হয় আমার আছে সেটা হলো জনগণ আমাকে ভালবাসে এবং যে ৬ দফা দাবি করেছি তাহা সমর্থন করে, তাই বোধ হয় এই অত্যাচার। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোনো ব্যক্তি জনগণের জন্য এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কোনো প্রোগ্রাম দিয়েছে, যাহা ন্যায্য দাবি বলে জনগণ মেনে নিয়েছে। অত্যাচার করে তাহা দমানো যায় না। যদি সেই ব্যক্তিকে হত্যাও করা যায় কিন্তু দাবি মরে না এবং সে দাবি আদায়ও হয়। যারা ইতিহাসের ছাত্র বা রাজনীতিবিদ, তারা ভাল করে জানেন। জেলের ভিতর আমি মরে যেতে পারি তবে এ বিশ্বাস নিয়ে মরব। জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার একদিন আদায় করবে।

মণি জেল হাসপাতাল থেকেই ল' পরীক্ষা দিতেছে, ভালই দিয়েছে খবর পেলাম। শাহ মোয়াজ্জেম আমার পাশেই পুরানা বিশ সেলে আছে। হাইকোর্ট ডিপিআর থেকে খালাস দিয়েছে কিন্তু একটা মামলায় জামিন না হওয়ার জন্য জেলে পড়ে আছে। নূরুল ইসলাম, নূরে আলম সিদ্দিকীও পুরানা বিশে থাকার জন্য একটু আরামেই আছি। কারণ ওদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারি মাঝে মাঝে, ফাঁকে ফাঁকে তাসও খেলে থাকি। যদিও তাস খেলা ভাল জানি না। ব্রীজ খেলতে গেলে উল্টা-পাল্টা খেলে বসি। মোয়াজ্জেম আমার সাথী, মুখ কালা করে ফেলে, কিছু বলতেও পারে না আর সইতেও পারে না।

দুপুর বেলা বিছানায় শুয়ে থাকলে রাতে আর ঘুম হতে চায় না। তাই দুপুর বেলা খাওয়ার পরে কিছু সময় নষ্ট করি। আমি তো একাকীই থাকি, কোনো দেওয়াল ভিতরে না থাকায় ওরা চলে আসে। আর আমি তো কয়েদি হয়েছি, রাজনৈতিক বন্দি তো নই। আর মোয়াজ্জেমও বিচারাধীন আসামি। আর মোয়াজ্জেম কাছে থাকায় অনেক সময় গল্প করে কাটাতে পারি। মোয়াজ্জেম বলে, 'মুজিব ভাই কিছু লেখেন'। আমি বলি, 'কি লিখব, বল, লেখার অভ্যাস তো কোনোদিন করি নাই'।

নূরুল ইসলাম ও নূরে আলম সিদ্দিকীর দুষ্টামী খুব ভাল লাগে। ব্রীজ খেলতে যখন পারি না তখন ব্রে খেলা শুরু করলাম। পরপর কয়েকদিন আমাকেই ব্রে হতে হলো কারণ ও খেলাটাও আমি ভাল জানি না। আমাকে নিয়ে ওরা 'মহা বিপদে' পড়েছে। আস্তে আস্তে শিখে নিয়ে ওদেরও ব্রে করতে শুরু করলাম। পূর্বের মত আর একচেটিয়া অবস্থা নাই। তবে শাহ মোয়াজ্জেমকে ব্রে করা খুব কঠিন, দুই একবার ছাড়া করা যায় নাই। এখন ব্রে খেলা চলছে। সকালে লেখাপড়া, দুপুরে খাওয়ার পরে কাগজপড়া ও ব্রে খেলা। সন্ধ্যার পরে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় যার যার সেলে। আর আমাকে দেওয়ানী ওয়ার্ডে। সন্ধ্যা হলেই বই নিয়ে বসে পড়ি। দশটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ি, ঘুম হলেও শুয়ে থাকতে হবে আর না হলেও শুয়ে থাকতে হবে। বাইরে যেয়ে একটুও হাওয়া খাওয়ার উপায় নাই।

১৭ তারিখে রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। হাচিনা আইএ পরীক্ষা দিতেছে। হাচিনা বলল, "আব্বা প্রথম বিভাগে বোধ হয় পাশ করতে পারব না তবে দ্বিতীয় বিভাগে যাবো।" বললাম, "দুইটা পরীক্ষা বাকি আছে মন দিয়ে পড়। দ্বিতীয় বিভাগে গেলে আমি দুঃখিত হব না, কারণ লেখাপড়া তো ঠিকমত করতে পার নাই।"

রাসেল আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে। এক বৎসর হয়ে গেছে জেলে এসেছি। রাসেল একটু বড় হয়ে গেছে। জামাল আসে নাই, খুলনায় গিয়াছে। শুনলাম বাইরে খুব গোলমাল আওয়ামী লীগের মধ্যে। একদল পিডিএমএ যোগদান করার পক্ষে, আর একদল ছয় দফা ছাড়া কোনো আপোষ করতে রাজি নয়। ১৯ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা। জেলা ও মহকুমার প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদকদেরও ডাকা হয়েছে। সভা আমার বাড়িতেই করতে হবে বলে একটিং সভাপতি ও একটিং সম্পাদক রেণুকে অনুরোধ করেছে। আমি বলেছি সকলে যদি রাজি হয় তাহা হইলে করিও। আমার আপত্তি নাই।

আপোষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। জেলের ভিতর যারা আছে তাদের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। তাজউদ্দীন, মোমিন সাহেব, ওবায়দুর, শাহ মোয়াজ্জেম ও মণি কিছুতেই ৬ দফা ছাড়া পিডিএমএ যোগদান করতে রাজি নয়। খোন্দকার মোশতাক যাতে দলের মধ্যে ভাঙন না হয় তার জন্যই ব্যস্ত। যদিও আমার কাছে মিজানুর রহমান এ কথা ও কথা বলে, তবে সেও পিডিএমএর পক্ষপাতী। রফিকুল ইসলাম আমার কাছে এক কথা বলে আর বাইরে অন্য খবর পাঠায়। জালাল ও সিরাজের মতামত জানি না, কারণ কুমিল্লায় আছে। তাজউদ্দীন ময়মনসিংহ থেকে আমাকে খবর দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জের মহীউদ্দিনের মতামত আমি জানি না। তবে ছাত্রনেতা নূরে আলম, নূরুল ইসলাম–আওয়ামী লীগ কর্মী, সুলতান ঢাকা সিটি কর্মী, শ্রমিক নেতা মান্নান ও রুহুল আমিনও আমাকে খবর দিয়েছে ৬ দফা ছাড়া আপোষ হতে পারে না। কিছু কিছু নেতা পিডিএম এর পক্ষে, কর্মীরা কেউই রাজি না। মানিক ভাইও পিডিএম এর পক্ষে। ৮ দফা পিডিএম দিয়েছে। আমাদের দলের চার নেতা জহির, রশিদ, মুজিবুর রহমান ও নূরুল ইসলাম সাহেব তো বিবৃতিই দিয়েছে আট দফা আওয়ামী লীগের 'মানস পুত্র' বলে। তাদের বিবৃতিতে মনে হয় ৮ দফা দাবি ৬ দফা দাবির চেয়েও ভাল। আমি এটা স্বীকার করতে পারি নাই–তাই আমার মতামত পূর্বেই দিয়ে দিয়েছি। আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে এর মধ্যে। পূর্ব বাংলার লোকেদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, বিশেষ করে মওলানা মওদুদী ও চৌধুরী মহম্মদ আলী। ৮ দফা পূর্ব বাংলাকে ৬ দফা দাবি থেকে মোড় ঘুরাইবার একটা ধোঁকা ছাড়া কিছুই না। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আমিও চাই, তবে এই সকল বড় বড় নেতারা আন্দোলন করার ধার দিয়েও যাবে না তা আমার জানা আছে।

মওলানা মওদুদী আমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আক্রমণও করেছে। ১৮ তারিখে জহির সাহেব, সৈয়দ নজরুল সাহেব, মশিয়ুর রহমান ও আবুল হোসেন আমার সাথে দেখা করতে আসেন। অনেক আলাপ করার পরে আমি বলে দিয়েছি পিডিএম এ যোগদান করতে পারেন না এবং যারা দস্তখত করেছে সেটা অনুমোদনও করতে পারে না ওয়ার্কিং কমিটি। কারণ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে ৬ দফা ছাড়া কোনো আপোষ হবে না। অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে কাউন্সিল ডেকে সিদ্ধান্ত করাইয়া নিবেন। আমার ব্যক্তিগত মত ৬ দফার জন্য জেলে এসেছি বের হয়ে ৬ দফার আন্দোলনই করব। যারা রক্ত দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসনদ ৬ দফার জন্য, যারা জেল খেটেছে ও খাটছে তাদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারব না। পরে জানাইয়া দেই। এও বলেছি এমনভাবে প্রস্তাব করবেন যাতে যারা দস্তখত করেছে তারা যেন সসম্মানে ফিরে আসতে পারে। তবে যদি পিডিএম কোনো আন্দোলন করে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি আছি–সহযোগিতা চাইলে, এইভাবে প্রস্তাব করবেন। প্রস্তাব সেইভাবেই করা হয়েছে। দেখলাম কাগজে আমার কথা মতই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে :

> 'The meeting of the E.P.A., League Working Committee discussed the 8-point programme of the PDM and resolved that the matter be referred to East Pakistan Awami League Council for final decision.
>
> It is further resolved that pending decisions by the council the East Pakistan Awami League will extend it responsive cooperation to any movement of the PDM for the restoration of democratic rights of the peoples of Pakistan.
>
> The meeting of the East Pakistan Awami League working committee reiterates its faith in the six-points programme and will continue the movement for its realization.'

ওয়ার্কিং কমিটির সভা শেষ করেই জনাব জহিরুদ্দিন, মশিয়ুর রহমান, মুজিবর রহমান (রাজশাহী), আবদুর রশিদ ও নূরুল ইসলাম চৌধুরী পিডিএম এ যোগদান করার জন্য লাহোর রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। তারাও সভায় যোগদান করেছে। বুঝতে আর বাকি রইল না এরা পিডিএম করতেই চায়। ৬ দফার আর প্রয়োজন নাই তাদের কাছে।

পিন্ডি থেকে জনাব কামরুজ্জামান এমএনএ, জনাব ইউসুফ আলী এমএনএ, জনাব নূরুল ইসলাম এমএনএ আওয়ামী লীগের এই তিন সদস্য পিডিএম সম্মেলনে যোগদান করেছেন। ৬ দফা ছাড়া পিডিএমএ যোগদান করতে এদের নিষেধ করা হয়েছে।

ন্যাপও পিডিএম এ যোগদান করবে না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে বাদ দিলে আন্দোলন কে করবে? সারা পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কর্মী ছাড়া অন্য দলের একটি কর্মীও জেলে নাই। ত্যাগ করলে এই দুই দলের নেতা ও কর্মীরা করছে। ঘরে বসে বিবৃতি দিয়ে এই দলের কর্মীরা রাজনীতি করে না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে এই পিডিএম করার পিছনে বিরাট ষড়যন্ত্র আছে।

লাহোরের সভায় পিডিএম কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে নবাবজাদা নসরুল্লাহকে সভাপতি আর মাহমুদ আলীকে সম্পাদক করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিকে প্রেসিডেন্ট করার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এটা পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কর্মীদের ধোঁকা দেওয়ার ষড়যন্ত্র। কিছুতেই পারবে না—এ বিশ্বাস আমার আছে।

২৪শে মে ১৯৬৭ ॥ বুধবার

আজ ২৪শে মে সকালে সিভিল সার্জন সাহেব আমাকে দেখতে এসেছেন। কারণ আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজে ছাপা হওয়ার জন্য সরকার বোধ হয় জানতে চেয়েছেন আমার শরীরের অবস্থা। ওজন নিলেন, পাইলসের অবস্থা শুনলেন, মাথার যন্ত্রণা, পিঠে বেদনা ও গ্যাসট্রিক নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছি আমি। কয়েকদিন পূর্বে, বোধ হয় ১০/১২ দিন হয়ে গেছে মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এনে দেখার জন্য নোট দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কেহই আসেন নাই বা আনা হয় নাই। মুক্তি তো আমাকে দেবে না। চিকিৎসাও ভালভাবে করবে না। আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। খুবই পরিশ্রম করতে পারতাম, আজ আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। হাঁটতেও ইচ্ছা হয় না। বসে বসে কাটাই অথবা শুয়ে থাকি। একদিন সকালে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে গিয়াছিলাম, পাশেই একটা বসার জায়গা থাকায় ধরে নিজকে সামলাইয়া নিয়েছিলাম। এত দুর্বল কেন যে হয়ে পড়লাম বুঝতে পারি নাই। রেণুকে ও ছেলেমেয়েদের বেশি কিছু বলি না কারণ ওরা চিন্তা করবে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে জেল খাটব কেমন করে? জেলের ভিতর সামান্য অসুখ হলেই মন খারাপ হয়, মনে হয় কত বড়

ব্যারামই না হয়েছে! বিশেষ করে আপনজনের কথা মনে পড়ে। আপনজনের সেবা চায় মন বার বার, বোধহয় এটাই নিয়ম, যা পাওয়া যায় না বা পাওয়া যাবে না তারই উপর আগ্রহ হয় বেশি। তাই ভাবি, জীবনের কত হাজার হাজার দিন এই কারাগারে একাকী কাটাইয়া দিলাম আর কতকাল কাটাতে হয় কেইবা জানে! তবুও দুঃখ আমার নাই, নীতি ও আদর্শের জন্য অত্যাচার সহ্য করছি। যুগে যুগে অনেক নেতা ও মনীষী নিজের আদর্শ এবং সত্যের জন্য জীবন দিয়েছে। কারাগারে বসে ধুঁকে ধুঁকে মারা গিয়েছে। তাঁদের কথা কেউই তো আজ মনে করে না। এই বাংলাদেশের কত ছেলে ইংরেজের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে জীবন দিয়েছে—তাদের নাম কেউ মনেও করে না। কেহ যদিও মনে করে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয়। এই বাংলাদেশের যুবকদের গলায় বাঙালিরাই তো ইংরেজের হুকুমে ফাঁসির দড়ি পরাইয়া দিয়েছে। একটু দুঃখ তো করে নাই, অনুতাপ তো দূরের কথা। বাংলার মাটির দোষই বোধহয়! যে বাঙালিরা আমাকে আসামি করছে, আটকাইয়া রাখছে, জেল দিতেছে—তারাও তো এই মাটিরই মানুষ এবং উচ্চ শিক্ষিত। এদের ছেলেমেয়ে ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যই তো আমি ও আমার মত শত শত কর্মীরা কারাবরণ করেছি। আরও কত লোকই না জীবন দিল তারই ভাইয়ের গুলিতে। এরাও একদিন বুঝবে, তবে সময় থাকতে না।

সিভিল সার্জন ও জেলের ডাক্তার সাহেবকে বললাম, 'যদি পারেন ভাল চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত করুন।' এই অত্যাচারীদের কাছে মাথা নত করব না, মরতে হয় কারাগারেই মরব। পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। মৃত্যু যদি জেলেই থাকে, হবে। একদিন তো মরতেই হবে! সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর বন্ধ করে দেয়, আর ভোরবেলা তালা খুলে দেয়। কি করে স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে!

২৫শে মে ১৯৬৭ ॥ বৃহস্পতিবার

আজ জেলের ডিআইজি মওলানা ওবায়দুল্লা সাহেব সেল এলাকায় এসেছেন কয়েদিদের নালিশ শুনতে। প্রায় আধাঘণ্টা আমার কাছে ছিলেন, অনেক বিষয় আলাপ আলোচনা হলো। বললাম, আমি তো এখন রাজনৈতিক বন্দি নই, এখন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। পুরাপুরি জেল কর্মচারীদের অধীনে। আইবির হুকুম বোধ হয় এখন নিতে হয় না। মওলানা সাহেব বললেন, "চিঠিপত্র আইবির মাধ্যমে যাওয়া আসা করবে এটা আইনে আছে। আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করার সময় সাদা পোশাকে পুলিশ কর্মচারী থাকতে পারে না।"

"আমাদের সূর্য অস্তের সময় যে তালাবন্ধের নিয়ম আছে সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য তা একঘণ্টা বাড়িয়ে দিবার নিয়ম করেছিলেন সেটা আপনারা অনুসরণ করুন, কারণ এই গরমে সূর্যাস্তের সময় তালাবন্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে থাকা সম্ভবপর নয়।" অনেক আইন নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর বললেন, আমি সরকারকে লেখব অনুমতির জন্য। এই সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের বন্দি করে কষ্ট দেবার সকল পন্থাই অবলম্বন করেছে। এখানেও যাহা হবে বুঝতেই পারি।

দৈনিক সংবাদ কাগজটাও বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। শুধু প্রকাশকের নাম বদলাবার অনুমতি না দিয়ে ১৬ বৎসরের কাগজটা বন্ধ করে দিতে পারে কোনো সভ্য সরকার? আবার বলে বেড়ায় গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এদেশে নাকি খুবই আছে। যে ভাবে ও যে পথে সরকার চলছে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে তাহা আমি দিব্য চোখে দেখতে পারি।

আজ পিডিএম এর সভা শেষ হয়েছে, কয়েকটা প্রস্তাবও নিয়েছে।

২৭শে মে–২৮শে মে ১৯৬৭

ডিপুটি জেলার সাহেব খবর দিলেন ২৭ তারিখে জেলগেট কোর্টে আমার ১২৪ক ধারার মামলা শুরু হবে। আরও বললেন, আপনার ছেলেমেয়েদের সাথেও কাল দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন। শরীর ও মন দুটোই খারাপ। অসহ্য গরম পড়েছে—যাকে বলা হয় ভ্যাপসা গরম। জেলের ভিতর এমনিই গরম থাকে। ১৪ ফিট দেওয়াল ঘেরা, বাতাস চেষ্টা করলেও আসতে কষ্ট হয়।

ভোর থেকে প্রস্তুত হয়ে আছি, কখন ডাক পড়বে ঠিক নাই। প্রথম খবর পেলাম হাকিম ১০টায় আসবেন। আবার খবর পেলাম ১১টায় আসবেন। আসতে আসতে প্রায় ১২টা বেজে গেছে। সিপাহি এসে বলল, "চলুন স্যার হাকিম এসেছেন সকলে বসে আছে।" তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলাম।

জেলগেট নাজিমুদ্দীন রোডে, আর আমি থাকি ডিক্রি এলাকায় উর্দু রোডের পাশে। জেলটা ছোট না। যেয়ে দেখি জনাব সালাম সাহেব, জহিরুদ্দিন সাহেব, মশিয়ুর রহমান সাহেব, মাহমুদুল্লা সাহেব, আবুল হোসেন এডভোকেট এসেছেন। এদিকে একটু পরেই আমেনা, মোস্তফাও এসেছে। খুলনা থেকে আলি ও অন্যান্য কর্মীরা এসেছে। মামলা শুরু হলো। সরকারি উকিল জনাব আলীম সাহেব এসেছেন সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে। ভদ্রলোক এতবড় বেহায়া যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। না জানে

ইংরেজি, না জানে বাংলা, না জানে ভদ্রলোকদের সাথে আলাপ করতে। সরকারের নেমক খেয়েছে তার কর্তব্য পালনে একটু ত্রুটি নাই। তার নাকি একমাত্র গুণ হলো সাক্ষীদের ভাল করে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে পারে। তিনটা সাক্ষী হলো। জেরা পরে করা হবে। এটাও আমার পল্টন ময়দানের ১৯৬৪ সালের বক্তৃতার মামলা। দেড় ঘণ্টা সাক্ষী হলো, তারপর হাকিম চলে গেল। এডভোকেট সাহেবরা বসলেন আমাকে নিয়ে আলাপ করতে।

জহিরুদ্দিনের ইচ্ছা আর সালাম সাহেব চান পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ পিডিএম-এ যোগদান করুক। যেভাবে পিডিএম প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে আছে ৮ দফার বিপরীত কোনো দাবি করা যাবে না। অর্থ হলো, ৬ দফা দাবি ছেড়ে দিতে হবে। আমি পরিষ্কার আমার ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ৬ দফা ছাড়তে পারব না। যেদিন বের হব ৬ দফারই আন্দোলন করব। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পিডিএম কমিটিতে যোগদান করতে পারবে না। কাউন্সিল সভা হউক দেখা যাবে। যদি পার্টি যেতে চায় আমার আপত্তি কি? কতদিন থাকব ঠিক তো নাই। এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ৬ দফা আন্দোলনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ, শোষক ও শাসকগোষ্ঠী এই ষড়যন্ত্র করেছে। আমাদের নেতারা বুঝেও বুঝতে চায় না। নবাবজাদা নসরুল্লাহ সাহেব বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পিডিএম-এ যোগদান না করলে তার সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। যখন তিনি সভাপতি হয়েছেন পিডিএম-এর তখন তো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পিডিএম-এ যোগদান করে নাই। দেখলাম, জহির সাহেব ও সালাম সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মশিয়ুর ভাই আমাকে গোপনে বললেন, "লাহোর যেয়ে আমার কিছুটা ধারণা হয়েছে এর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র আছে।" আমাকে আরও বললেন, আমি যদি যোগদান না করি তবে তিনিও পিডিএম থেকে পদত্যাগ করবেন।

আমেনাকে বললাম, "৭ই জুন শান্তিপূর্ণভাবে পালন করিও। হরতাল করার দরকার নাই। সভা শোভাযাত্রা পথসভা করবা।" সকলেই তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা ও অসুবিধার কথা বলল।

আড়াইটার সময় ফিরে এলাম। গোসল করে খাবার খেয়ে কাগজ নিয়ে বসলাম। পাঁচটায় আবার গেটে যেতে হলো। রেণু এসেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। হাচিনা পরীক্ষা ভালই দিতেছে। রেণুর শরীর ভাল না। পায়ে বেদনা, হাঁটতে কষ্ট হয়। ডাক্তার দেখাতে বললাম। রাসেল আমাকে পড়ে শোনাল, আড়াই বৎসরের ছেলে আমাকে বলছে, '৬ দফা মানতে হবে—সংগ্রাম, সংগ্রাম

–চলবে চলবে–পাকিস্তান জিন্দাবাদ', ভাঙা ভাঙা করে বলে, কি মিষ্টি শোনায়! জিজ্ঞাসা করলাম, "ও শিখলো কোথা থেকে?" রেণু বলল, "বাসায় সভা হয়েছে, তখন কর্মীরা বলেছিল তাই শিখেছে।" বললাম, "আব্বা, আর তোমাদের দরকার নাই এ পথের। তোমার আব্বাই 'পাপের' প্রায়শ্চিত্ত করুক।" জামাল খুলনা থেকে ফিরে এসেছে। রেহানা খুলনায় যাবার জন্য অনুমতি চায়। বললাম, 'স্কুল বন্ধ হলে যাইও।' কামালও বাড়ি যেতে চায় আব্বাকে দেখতে। বললাম, 'যেও।' কোথা থেকে যে সময় কেটে যায় কি বলব? জেলে সময় কাটতে চায় না, কেবল দেখা করার সময় এক ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যায়। ছেলেমেয়েরা বিদায় নিয়ে চলে গেল, আমিও আমার চির পরিচিত দেওয়ানী ওয়ার্ডের দিকে চললাম। ওবায়েদ কোর্টে গিয়াছিল দেখা হয়ে গেল পথে। বললাম, 'খবর কি?' ওবায়েদ বলল, 'আপনার যাহা মত আমাদেরও সেই মত।'

শাহ মোয়াজ্জেম ও নূরে আলম মাঠের মধ্যে বেড়াইতেছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, ভাবি কেমন আছে। বললাম, আমার শরীর খারাপ হওয়াতে বোধ হয় তারও শরীর খারাপ হয়েছে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুতে হলো। দরজা বন্ধ করতে আসবে। জমাদার চাবি নিয়ে হাজির। সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমিও ভিতরে চলে গেলাম। খট করে বন্ধ হয়ে গেল বাইরের তালা। আমিও চা খেয়ে বই নিয়ে বসলাম।

২৮ তারিখের কাগজে দেখলাম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জয়দেবপুর ও ফতুল্লা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে–যাতে ৭ই জুন '৬ দফা দাবি দিবস' পালন করতে না পারে। বুঝতে আর কষ্ট হলো না।

সংবাদ ও ইত্তেফাক বন্ধ করার ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন শুরু হয়েছে, এটাকে দমাতে হবে। এটাই হলো সরকারের উদ্দেশ্য।

আর একটা আশ্চর্য জিনিস আজ কাগজে দেখলাম, কলেজগুলির অনুমোদন নিতে হবে সরকারের থেকে। ইংরেজকেও হার মানাইয়া দিয়েছে এই সরকার। কলেজের অনুমোদন দিত বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজ আমল থেকে এ পর্যন্ত চলছিল এই নীতি। হঠাৎ সরকারের হাতে এই ক্ষমতা নেওয়ার অর্থ বুঝতে কারই বা কষ্ট হয়! ভুল করছেন, বুঝতে পারছেন না! বাঁধন শক্ত হলে ছিঁড়েও তাড়াতাড়ি।

শাহ মোয়াজ্জেম একটা বই লিখেছে, আমায় পড়ে শোনাল। ভালই লিখেছে, অনেকক্ষণ ওর সাথে আলাপ হলো আজ। বোধ হয় ৫/৭ দিনের মধ্যে জামিন

পেয়ে জেল থেকে চলে যাবে। আবার একলা পড়ে যাবো। মাঝে মাঝে ২০ সেল ছেড়ে আমার কাছে চলে আসে। আমি চাই ওর মুক্তি হউক। আমার এই জীবনটাই একাকী কাটাতে হবে এই নিষ্ঠুর ইটের ঘরে।

২৯শে মে–৩১শে মে ১৯৬৭

যে মামলায় আমাকে ১৫ মাস জেল দিয়েছে জনাব আফসার উদ্দিন আহম্মেদ জেল গেটে কোর্ট করে, সেই মামলায় আমাকে জেলা জজ বাহাদুর জামিন দিয়েছে খবরের কাগজে দেখলাম। জামানতের কাগজ আজও জেল গেটে আসে নাই। দুই একদিনের মধ্যেই আসবে বলে মনে হয়। আবার রাজনৈতিক বন্দি হয়ে যাবো। এক মাসের বেশি বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করলাম। রেণু এসেছিল জেল গেটে মণিকে দেখতে। ছেলেমেয়েরা ভালই আছে। মাংস মাছ পাকাইয়া নিয়ে এসেছিল, গেট থেকে পাঠাইয়া দিয়েছে। গরম করে করে দুইদিন এগুলিই খেলাম। শাহ মোয়াজ্জেম, নূরে আলম, নূরুল ইসলাম ও চিত্ত বাবুকে রেখে তো খেতে পারি না, তাদেরও ভাগ দিলাম। আজ দিলাম অন্যান্য সকলকে। বড় ভাল লাগে সকলকে দিয়ে খেতে। কয়েদিদের একঘেয়ে পাক খেতে খেতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে একটু পরিবর্তন হলে ভালই হয়। রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে ঘরের জিনিস আনার হুকুম নাই। তবে কয়েদি হলে আনতে পারে। বিচিত্র দেশ, বিচিত্র আইন! রাজনৈতিক বন্দিদের ফল ফলাদি আনারও হুকুম নাই।

আজ কাগজ দেখে ভীষণ আঘাত পেলাম। খবরটা পেয়ে আমার কথা বলাও বন্ধ হয়ে গিয়াছিল। ভাবতেও কষ্ট হয় বন্ধু সহকর্মী ডা. গোলাম মওলা ইহজগৎ ছেড়ে চলে গিয়াছেন। ডা. মওলা এমএসসি এমবিবিএস পাস করা ডাক্তার ছিল। আমার সাথে পরামর্শ করে মাদারীপুরে প্র্যাকটিস করত। যেমন চেহারা তেমনি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিল। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়স হয়েছিল। এত ভাল স্বভাব ও মধুর ব্যবহার খুব অল্প লোকেরই আমি দেখেছি। মাদারীপুরের নড়িয়া থেকে ১৯৫৬ সালে এমএনএ হয়। ১৯৬২ সালে আবার আইয়ুব সাহেবদের পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। একদিনের জন্যও দলত্যাগ করে নাই। দেশের লোক তাকে ভালবাসতো। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাকে তার ব্যবহারের জন্য সম্মান করত ও ভালবাসতো। ডাক্তার হিসেবে তার যথেষ্ট নাম ছিল। দেশ একজন নিঃস্বার্থ নেতাকে হারাল। আর আমি হারালাম আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীকে। কিছুই করতে পারব না শুধু খোদাকে ডাকা ছাড়া। বন্দি জীবনে এই সমস্ত খবর খুব কষ্ট দেয়। ডা. মওলার চেহারা বার বার ভেসে উঠছিল আমার চোখের

সামনে। আমাদের সকলকেই তোমার পথের সাথী একদিন হতে হবে মওলা। দুই দিন আগে আর পরে। তোমার আত্মা শান্তি পাক এই দোয়াই খোদার দরবারে করি।

২২শে জুন ১৯৬৭ ॥ বৃহস্পতিবার

২২শে জুন খবরের কাগজে দেখলাম নারায়ণগঞ্জের বজলুর রহমান, ঢাকার হারুনুর রশিদ, তেজগাঁর মাজেদুল হক, রাজশাহী থেকে মুজিবুর রহমান, সিলেট থেকে জালালউদ্দিন সাহেব, দেওয়ান ফরিদ গাজী ও সিরাজউদ্দিন, টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ আলি, খুলনার শেখ মোহাম্মদ আলি, চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরীকে মুক্তি দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। এরা সকলেই আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতা। যাহা হউক সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, ছাড়তে যখন শুরু করেছে কিছু কিছু লোককে ছাড়বে।

২৫ তারিখে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল হকও মুক্তি পেয়েছে। বেগম সাহেবা এসেছিলেন আমার বড় বোনকে সাথে নিয়ে। আমাকে দেখেতো কেঁদেই অস্থির। বললাম, "বুজি, তুমি কাঁদ কেন? আমার সত্যই কোনো কষ্ট হয় না। আর ভিতর বাইরে সবই সমান। যারা দেশ চালায় তাদের অনেকের মধ্যে দয়া মায়া তো দূরের কথা মনুষ্যত্বও নাই। চিন্তা করিও না।"

আমার বড় বোন ১৯ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছে। একটা মেয়ে কোলে আর একটা ছেলে পেটে ছিল যখন ভগ্নিপতি মারা যান। আমার ভাগ্নে আজ বড় হয়ে অর্থশালী হয়েছে, তিনটা ছেলেমেয়ে হয়েছে। আজও আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। দেখা করতে এসে একদিন ছোট বাচ্চার মত কেঁদেছিল আর বলেছিল, "মামা ভাববেন না। মামী ও বাচ্চাদের যত টাকা লাগবে আমি দিব।" ওর টাকাও আছে, প্রাণও আছে।

৮ই ফেব্রুয়ারি ২ বৎসরের ছেলেটা এসে বলে, "আব্বা বালি চলো"। কি উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, "তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।" ও কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে!

দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখে নাই। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।

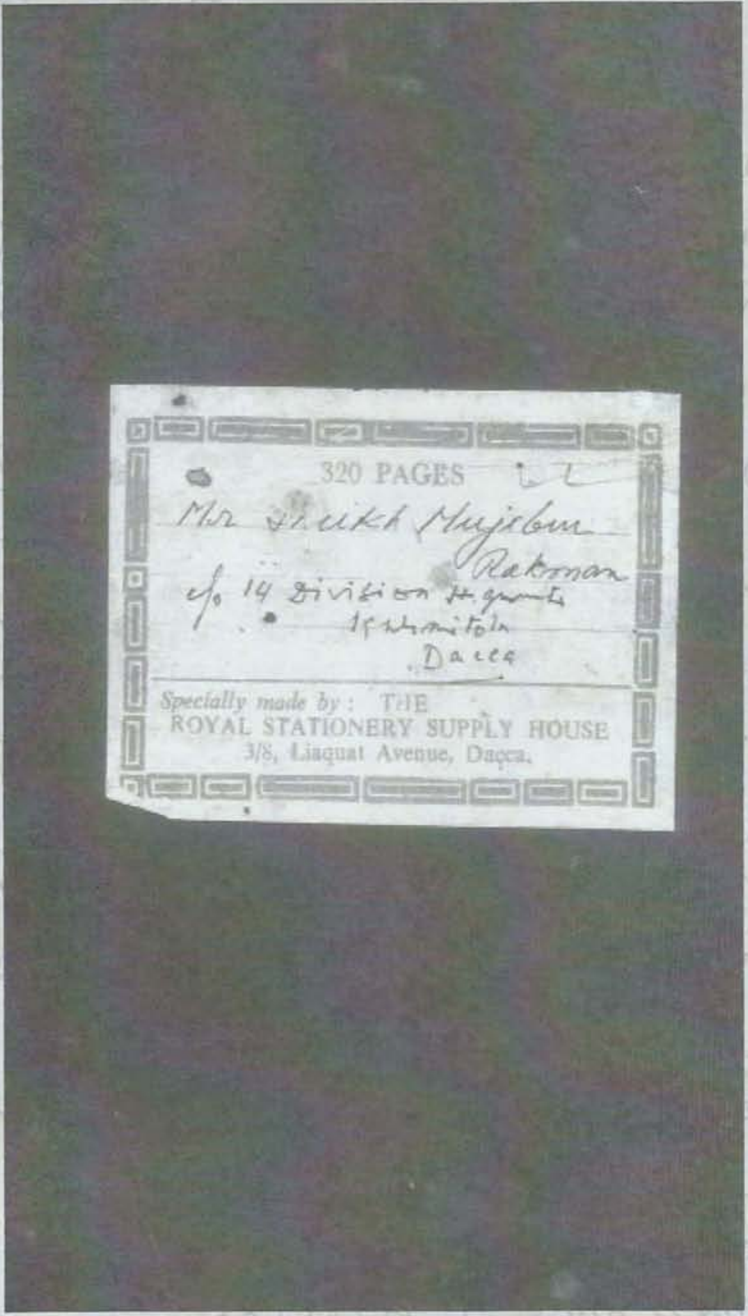
320 PAGES
Mr Sheikh Mujibur Rahman
c/o 14 Division
Dacca
Specially made by: THE
ROYAL STATIONERY SUPPLY HOUSE
3/8, Liaquat Avenue, Daçca.

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত ১২টার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হয়। কারাগারের গেট দিয়ে বাইরে এলে সেনাবাহিনীর লোকজন তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করে রাখে। এসময় বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের কোনো সংবাদ বাইরে প্রকাশ না হওয়ায় তিনি বেঁচে আছেন কিনা জনগণের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ, সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দেয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার কুর্মিটোলা অফিসার মেসের ১০নং কক্ষে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি অবস্থায় এই স্মৃতিকথা লেখা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবাঙালি সদস্যরা তাঁকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সতর্ক পাহারায় রেখেছিল।

পাঁচ মাস পর দুঃসহ বন্দি জীবনযাপনের সময় এই খাতাটি বেগম মুজিব তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। রয়েল স্টেশনারি সাপ্লাই হাউজের ৩২০ পৃষ্ঠার রুল টানা খাতাটির মাত্র ৫২ পৃষ্ঠা লেখার তিনি সুযোগ পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পরই প্রথম পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আর তখনই এই খাতাখানা দেয়া হয়। তবে মামলা চলার কারণে তিনি খুব বেশি লিখতে পারেন নাই। এটা তাঁর লেখা শেষ খাতা।

১৯৬৬ সালের ৮ই মে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে দিন যাপন করতেছিলাম।

১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি রাত্রে যথারীতি খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ি। দেওয়ানি ওয়ার্ডে আমি থাকতাম। দেশরক্ষা আইনে বন্দি আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন এডভোকেট আমার কামরায় থাকতেন। ১৭ মাস একাকী থাকার পরে তাকে আমার কাছে দেওয়া হয়। একজন সাথী পেয়ে কিছুটা আনন্দও হয়েছিল। হঠাৎ ১৭ই জানুয়ারি রাত্র ১২টার সময় আমার মাথার কাছে জানলা দিয়ে কে বা কারা আমাকে ডাকছিলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখি নিরাপত্তা বিভাগের ডেপুটি জেলার তোজাম্মেল সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাত্রে কি জন্য এসেছেন? তিনি বললেন, দরজা খুলে ভিতরে এসে বলব। ডিউটি জমাদার দরজা খুলে দিলে তিনি ভিতরে এসে বললেন, আপনার মুক্তির আদেশ দিয়েছে সরকার। এখনই আপনাকে মুক্ত করে দিতে হবে। মোমিন সাহেবও উঠে পড়েছেন। আমি বললাম, হতেই পারে না। ব্যাপার কি বলুন। তিনি বললেন, সত্যই বলছি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে–এখনই, কাপড় চোপড় নিয়ে চলুন। আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম, আমার যে অনেকগুলি মামলা রয়েছে যার জামানত নেওয়া হয় নাই। চট্টগ্রাম থেকে কাস্টডি ওয়ারেন্ট রয়েছে, আর যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পাবনা থেকে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট রয়েছে। ছাড়বেন কি করে? এটাতো বেআইনি হবে। তিনি বললেন, সরকারের হুকুমে এগুলি থাকলেও ছাড়তে পারি। আমি তাকে হুকুমনামা দেখাতে বললাম। তিনি জেল গেটে ফিরে গেলেন হুকুমনামা আনতে।

আমি মোমিন সাহেবকে বললাম, মনে হয় কিছু একটা ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। হতে পারে এরা আমাকে এ জেল থেকে অন্য জেলে পাঠাবে। অন্য কিছু একটাও হতে পারে, কিছুদিন থেকে আমার কানে আসছিল আমাকে 'ষড়যন্ত্র' মামলায় জড়াইবার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে চেষ্টা করা হতেছিল। ডিসেম্বর মাস থেকে অনেক সামরিক, সিএসপি ও সাধারণ নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েছে দেশরক্ষা আইনে–রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা উপলক্ষ্যে, সত্য মিথ্যা খোদাই জানে!

প্রথম খবর পাই জেলের মধ্যে ঈদের নামাজে। এই দিন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বন্দিরা কিছু সময়ের জন্য এক জায়গায় নামাজ পড়তে জমা হয়। আমাকে দেখে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী কেঁদে ফেলে এবং বলে তাকে ২১ দিন পুলিশ কাস্টডিতে রেখেছিল। মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। তারপর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসা করে একটু আরোগ্য লাভ করলে জেলে পাঠাইয়া

দিয়েছে। আমাকে জড়াইয়া ধরে কেঁদে দিয়ে বলল, শুধু আপনার নাম বলাবার জন্য আমাকে এত মেরেছে, সহ্য করতে পারি নাই বলে যাহা বলেছে তাহাই লিখে দিয়ে এসেছি। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম আর বললাম, আল্লার উপর নির্ভর কর। যাহা হবার হবেই। আমাকে বলল, সরকারের কাছে দরখাস্ত করব।

ফজলুর রহমান সিএসপিও বলল, আপনাকে জড়াবার খুব চেষ্টা চলছে। আরও দুই একজন ভূতপূর্ব সামরিক বাহিনীর কর্মচারীও আমাকে বলল। এর মধ্যে মি. কামালউদ্দিন নামে একজন ভূতপূর্ব নৌ-বাহিনীর কর্মচারীর পুরানা ২০ সেল থেকে জেল গেটে যাবার সময় আমার সাথে দেখা হয়ে গেল। আমাকে আদাব করলেন। আমি বললাম, আপনাকে তো কোনোদিন দেখি নাই, আপনি কে? বলল, আমার নাম কামালউদ্দিন। পুলিশ হাজতে নিয়ে অসম্ভব মেরেছে। সমস্ত শরীর পচাইয়া দিয়েছে। সোজাভাবে শুয়ে থাকতে পারি না। পায়খানার দ্বারের মধ্যে কি ঢুকিয়ে দিয়েছিল যন্ত্রণায় অস্থির। এই দেখুন জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে জায়গায় জায়গায় পোড়াইয়া দিয়েছে। আপনার নাম লেখাইয়া নিয়েছে আমার কাছ থেকে যদিও অনেক বলেছি যে 'শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় নাই'। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ লাইনেই উপস্থিত আছেন, টাইপ করে কাগজ দেয়, তাই পড়ে দিয়ে আসতে হয়। না পড়লে আবার মারতে শুরু করে। কি করব স্যার, লিখে দিয়ে এসেছি, তবে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস করব। সেখানে সব বলব। মামলা সে করেছিল, খবরের কাগজে অত্যাচারের করুণ কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়েছিল কামাল উদ্দিনের মামলায়। এরপরে জেলে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেসনোট পড়লাম, তাতে ২৮ জনের নাম দিয়েছে। জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএসপি ও ফজলুর রহমান সিএসপি সহ সামরিক বেসামরিক লোকের নাম রয়েছে। তিনজন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মীর নামও দেখলাম। প্রেসনোটে লেখা ছিল এই ২৮ জন লোকই ষড়যন্ত্র করেছে। মোমিন সাহেবকে বললাম, বোধ হয় চিন্তা ভাবনা করে আমাকে বাদ দিয়েছে, কারণ আজ ১৭ মাস আমি কারাগারে বন্দি। এতবড় মিথ্যা কথা সরকার বলবে কেমন করে! তিনি ও অন্যান্য রাজবন্দিরা জানতে পেরেছিলেন বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের থেকে—যে আমাকে জড়াবার চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আমাকে খবরও পাঠাইয়াছিল। আমার সাথে দেখা করতে এসে রেণু (আমার স্ত্রী) আমাকে বলেছিল, তোমাকে জড়াবার চেষ্টা হতেছে। জানি না খোদা কি করে। আল্লার উপর নির্ভর কর।

আমি বললাম, দেশরক্ষা আইনে জেলে রেখেছে, ১১টা মামলা দায়ের করেছে আমার বিরুদ্ধে। কয়েকটাতে জেলও হয়েছে, এরপরও এদের ঝাল পড়ল না। ৬ দফার ঝাল এতো বেশি জানতাম না। আইবি ও জেল অফিসার সামনে বসে থাকে, কথা বলা যায় না। আমার শরীরও খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল, কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, হাসপাতালে যেতে হয় নাই, তবে ভর্তি করে খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করেছিল। অনেক ওজন কম হয়ে গিয়েছিল। একটু আরোগ্য লাভ করেছিলাম। তখনও ভর্তি ছিলাম যেদিন আমার 'মুক্তির' আদেশ নিয়ে ডিপুটি জেলার রাত ১২টায় হাজির হয়েছিলেন।

ডিপুটি জেলার হুকুমনামা নিয়ে এলেন, আমাকে দেখালেন। আমি পড়ে দেখলাম, দেশরক্ষা আইন থেকে আমাকে 'মুক্তি' দেওয়া হয়েছে। মোমিন সাহেব প্রথমে খুশি হয়েছিলেন পরে তিনি বুঝতে পারলেন ভিতরে কিছু 'কিন্তু' আছে। বিছানা কাপড়গুলি বেঁধে দিল কয়েদিরা। মোমিন সাহেবকে বললাম, বাড়িতে রেণুকে খবর দিতে, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়াছে। আমি দেখলাম, ডিপুটি জেলার ও সিপাহি জমাদার, যারা আমাকে ও মালপত্র নিতে এসেছে তাদের মুখ খুব ভার। কারো মুখে হাসি নাই। আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, অন্য কোনো বিপদে আমাকে ফেলছে সেটা আর কিছু না, 'ষড়যন্ত্র মামলা'। বিদায় নিবার সময় মোমিন সাহেবকে বললাম, বোধ হয় আর আপনাদের সাথে দেখা হবে না। আপনারা রইলেন এদেশের মানুষের জন্য, আমি চললাম। খোদা আপনাদের সহায় আছেন। আমাকে যারা খানা পাকাইয়া খাওয়াতো, কাজ করে দিত, তাদের কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে প্রায় ১টার সময় জেলগেটে হাজির হলাম।

বইখাতা ও খাবার জিনিসপত্র রেখে এলাম। বলেছিলাম, আপনাদের জিনিসগুলি রেখে আমার জিনিসপত্র কামালকে (আমার বড় ছেলে) খবর দিলে নিয়ে যাবে এসে। আমাকে কোথায় নিয়ে যায় ঠিক নাই।

জেলগেটে এসেই দেখি এলাহি কাণ্ড! সামরিক বাহিনীর লোকজন যথারীতি সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াইয়া আছেন আমাকে 'অভ্যর্থনা' করার জন্য। আমি ডিপুটি জেলার সাহেবের রুমে এসে বসতেই একজন সামরিক বাহিনীর বড় কর্মকর্তা আমার কাছে এসে বললেন, "শেখ সাহেব আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো"। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় আপনার কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আমাকে দেখালে বাধিত হব। তিনি একজন সাদা পোশাক

পরিহিত কর্মচারীকে বললেন, পড়ে শোনাতে। তিনি পড়লেন, "আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হলো।" আমি বললাম, ঠিক আছে, চলুন কোথায় যেতে হবে। সামরিক বাহিনীর কর্মচারী বললেন, "কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার মালপত্র আপনি যেখানে থাকবেন সেখানে পৌঁছে যাবে।"

আমাকে কোনো লিখিত আদেশ দিল না। আমি ডিপুটি জেলার সাহেবের কাছ থেকে টাকাগুলি বুঝে নিয়ে রওয়ানা করছি, এমন সময় ঢাকা জেলের জেলার ফরিদ আহম্মদ হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বললেন, "আপনাকে তো আমরা ছাইড়া দিলাম।" এই ভদ্রলোকের কথায় আমার প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল এবং কড়া উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। শুধু বললাম, বাজে কথার দরকার নাই। এই ভদ্রলোকের উপর রাগ করে লাভ নাই, কারণ একে আমি পূর্বের থেকেই জানতাম। এই জেলেই কয়েক বৎসর পূর্বে ডিপুটি জেলার ছিল। তখনও আমি রাজবন্দি ছিলাম। এখন জেলার হিসেবে কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে। নানা কারণে অন্যান্য কর্মচারী ও কয়েদিরা একে মোটেই দেখতে পারে না। আর সত্যই ভদ্রলোক কথা বলতেও জানে না।

আমি জেলগেটে দেখলাম ঢাকা জেলের সুপারেনটেনডেন্ট বা ডিআইজি সাহেবের রুমে আলো জ্বলছে। তিনিও এই সময় উপস্থিত হয়েছেন—বোধ হয় আমাকে 'মুক্তি দিবার জন্য'।

জেলের লোহার দরজা খুলে দেওয়া হলো। সামনেই একটি গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চারদিকে সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা পাহারায় রত আছেন। একজন মেজর সাহেব আমাকে গাড়িতে উঠতে বললেন। আমি গাড়ির ভিতরে বসলাম। দুই পার্শ্বে দু'জন সশস্ত্র পাহারাদার, সামনের সিটে ড্রাইভার ও মেজর সাহেব। গাড়ি নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে রমনার দিকে চলল। আমি পাইপ ধরাইয়া রাত্রের স্নিগ্ধ হাওয়া উপভোগ করতে লাগলাম, যদিও শীতের রাত। ভাবলাম কোথায় আমার নূতন আস্তানা হবে! কোথায় নিয়ে যাওয়া হতেছে! কিছুই তো জানি না। গাড়ি চললো কুর্মিটোলার দিকে।

বহুকাল পরে ঢাকা শহর দেখছি, ভালই লাগছে। মনে মনে শেরে বাংলা ফজলুল হক, জননেতা সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের কবরকে সালাম করলাম। চিরনিদ্রায় শুয়ে আছ, একবারও কি মনে পড়ে না এই হতভাগা দেশবাসীদের কথা! শাহবাগ হোটেল পার হয়ে, এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে।

এয়ারপোর্ট ত্যাগ করে যখন ক্যান্টনমেন্ট ঢুকলাম তখন আর বুঝতে বাকি রইল না। মনে মনে বাংলার মাটিকে সালাম দিয়ে বললাম, "তোমাকে আমি ভালবাসি। মৃত্যুর পরে তোমার মাটিতে যেন আমার একটু স্থান হয়, মা।"

অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে আমার আব্বা ও মায়ের কথা। খবর পেলে এই বৃদ্ধ বয়সে দুইজনের কি অবস্থা হবে? আব্বার বয়স ৮৪ বৎসর আর মায়ের বয়স ৭৫ বৎসর। আর কতদিনই বা বাঁচবেন! দুঃখ পেয়ে আঘাত সহ্য করতে না পারলে যে কোনো অঘটন হয়ে যেতে পারে। বোধ হয় আমি আর দেখতে পাব না। এর মধ্যেই এসে পৌঁছলাম একটা ঘরের সামনে। এখানেও সামরিক বাহিনী পাহারা দিতেছে। দরজা খুলে দিল। আমি নেমে পড়লে আমাকে সাথে করে একটা কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে তিনজন সাদা পোশাক পরিহিত কর্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। আমার সাথে কেহ কোনো আলাপ করলেন না, আমিও চুপ করে দাঁড়াইয়া রইলাম। কয়েক মিনিট পরে বললাম, শরীর ভাল না, কোথাও বসতে অনুমতি দিন। আমাকে পাশের আর একটা কামরায় নিয়ে বসতে দেওয়া হলো। কয়েক মিনিট পরে এক ভদ্রলোক এলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ষড়যন্ত্র ব্যাপার সম্বন্ধে'। বললাম, কিছুই জানি না।

এর মধ্যে এক ভদ্রলোক বলিষ্ঠ গঠন, সুন্দর চেহারা, আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তিনি একজন ডাক্তার। আমার হার্ট পেট রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন। কিছুই না বলে চলে গেলেন পাশের কামরায়। কয়েক মিনিট পরে আর একজন কর্মচারী এসে বললেন, চলুন। একটা জীপ গাড়িতে করে আমাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। এক কামরাবিশিষ্ট একটা দালান। সাথে গোসলখানা, ড্রেসিং রুম, স্টোর রুম আছে। দু'খানা খাট পাশাপাশি। একটা খাটে একটা বিছানা আছে। আর একটা খাট খালি পড়ে আছে। আমাকে বলা হলো আপনার মালপত্র এসে গেছে দেখে নেন। বিছানা খুলে বিছানা করে নিলাম। একজন কর্মচারী—যার নাম লেফটেন্যান্ট জাফর ইকবাল সাহেব, তিনি আমার পাশের খাটেই ঘুমাবেন সামরিক পোশাক পরে—সাথে রিভলবার আছে। লেফটেন্যান্ট সাহেব একাকী প্যাসেন্স খেলতে লাগলেন। আমি বিছানায় বসে পাইপ টানতে লাগলাম, কোনো কথা নাই। কুর্মিটোলার কোন জায়গায় আমি আছি নিজেই জানি না।

আধা ঘন্টার মধ্যে সেই দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত সামরিক কর্মচারী এলেন—যাদের সাথে পূর্বেই দেখা হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো অসুবিধা আছে কিনা? এখানেই আপাতত আমাকে থাকতে হবে।

আমাকে চা খেতে অনুরোধ করলেন। আমি আগ্রহের সাথে রাজি হলাম। কারণ ঘুম ভাঙ্গাইয়া আমাকে নিয়ে এসেছে, জড়তা এখনও যায় নাই। তিনজন এক সাথে চা খেলাম। আমি বললাম, "আমাকে কেন আপনারা এনেছেন জানি না, তবে সত্য চাপা থাকবে না। অন্যায় ভাবে আমার উপর অত্যাচার করে কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না।" একজন মনে হলো—মেজর হবে, একটু টিটকারী দিয়ে কথা বলছিলেন, এমনকি আমার স্ত্রীও জড়িত আছে এমন ইঙ্গিতও দিতে ভুল করলেন না। আমি তাহাকে লক্ষ্য করে বললাম, "দেখুন, আমার স্ত্রী রাজনীতির ধার ধারে না। আমার সাথে পার্টিতে কোনো দিন যায় নাই। সে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাইরের লোকের সাথে মেলামেশাও করে না। আমার রাজনীতির সাথে তার সম্বন্ধ নাই।" এই সময় আমি দেখলাম আর একজন ভদ্রলোক যিনি কর্নেল হবেন বলে মনে হলো, অন্য আর একজনের দিকে চেয়ে ইশারা দিয়ে নিষেধ করল। কর্নেল ভদ্রলোকের নাম পরে জানতে পারলাম শের আলি বাজ। খুবই ভদ্র, অমায়িকভাবে আলোচনা করছিলেন। কর্নেল শের আলি বাজ যাবার সময় বলে গেলেন, থাকবার খাবার কোনো অসুবিধা হবে না। ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। তার কথাবার্তার মধ্যে কোনো আক্রোশ খুঁজে পেলাম না। পরে জানতে পারি এর বাড়ি পেশওয়ার জেলায়।

আমি শুয়ে পড়লাম। আলো জ্বালান থাকলো। ঘুমের ব্যাঘাত তো নিশ্চয়ই হবে। তারপর মনের অবস্থা খারাপ। যাহা হউক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠতে দেরি হলো। রাত্রে যে ভদ্রলোক আমার কামরায় পাহারায় ছিলেন তিনি সকালবেলা চলে গেলে আর একজন ভদ্রলোক নাম লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদ জাফর ডিউটিতে এলেন।

দরজা জানালা বন্ধ। জানালা ও দরজার কাচগুলিকে লাল রং করে দেওয়া হয়েছে। ঘরগুলি অন্ধকার তাই আলো জ্বালাইয়া রাখতে হলো। দরজা বন্ধ থাকবে। এই কামরায়ই থাকতে হবে। কিছুই জানি না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সময় কাটবে কি করে? বই পত্র নাই, খবরের কাগজ দেওয়া হবে না। যে অফিসার আমার পাহারায় রত থাকবেন তার উপর হুকুম আছে—পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামরিক কোনো বিষয়ই আলাপ করতে পারবে না। তবে আবহাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে হাঁ বা না সূচক ভাষায় উত্তর দিতে বোধ হয় আপত্তি নাই। কথা বার্তা না বলে দু'জন লোক একই কামরায় নীরবে বসে থাকতে হবে। আর অফিসার ভদ্রলোকের কাজ হলো আমাকে চোখে চোখে রাখা যাতে আমি ভাগতে চেষ্টা না করি বা আত্মহত্যা করতে না পারি। ভাবতে লাগলাম এই অবস্থায় দিন কাটবে কি করে! আর কতকাল থাকতে

হয় ঠিক কি? এইভাবে থাকলে যে কোনো লোক পাগল হতে বাধ্য। তবুও তো থাকতে হবে। কারণ 'পড়েছি পাঠানের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

নাস্তা, দুপুর ও রাত্রের খাবার ঠিক সময় মতো এসে হাজির হয়। তবে দু'বেলাই রুটি। মহা সমস্যা। আমি আমাশয়ের রুগি। পেটের ব্যাথাও শুরু হয়ে পড়ল। জানতে পারলাম আমি যেখানে আছি এটা অফিসার মেস। আমার ঘরটা হলো গেস্ট হাউস। অফিসাররা যা খেয়ে থাকেন আমাকেও তাই খেতে দেওয়া হয়। সমস্ত কর্মচারীই হলো পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, তারা রুটিই খেয়ে থাকে। সাথে থাকে মাংস। রুটি মাংস ও ডাল খেয়ে আমার পক্ষে বাঁচা কষ্টকর। উপায় নাই। যতদিন চলে চালাতে হবে। আমার কাছে দুইখানা মাত্র বই ছিল। অন্য বইগুলি জেলখানায় রেখে এসেছি। ভুল করেছি বই না এনে। অফিসার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বই পড়তে আপত্তি আছে কিনা। তিনি বললেন, বই দেওয়ার হুকুম আপাতত পাই নাই। তবে আপনার কাছে থাকলে পড়তে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে বাইরে যান। আমি যে কড়িকাঠ গুনবো সে ব্যবস্থাও নাই। কারণ কড়িকাঠও দালানে নাই। আলো জ্বালানই ছিল। সুকর্ণর পতন সম্বন্ধে বই দু'টি পড়তে লাগলাম। কিন্তু মন বসছে না, নানা চিন্তা ঘিরে ধরছে। কি করব বসে বসে শুধু পাইপ খেতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম রাজনীতি এত জঘন্য হতে পারে! ক্ষমতার জন্য মানুষ যে কোনো কাজ করতে পারে। আমাকে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করতে কারো বিবেকে দংশন করল না। আমি তো ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি নাই। জীবনভর প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি করেছি। যাহা ভাল বুঝেছি তাই বলেছি। বক্তৃতা করে বেড়াইয়াছি, গোপন কিছুই করি না বা জানি না। সত্য কথা সোজাভাবে বলেছি তাই সোজাসুজি জেলে চলে গিয়াছি। কাহাকে ভয় করে মনের কথা চাপা রাখি নাই। যে পথে দেশের মঙ্গল হবে, যে পথে মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে তাহাই করেছি ও বলেছি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যাতে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে তার জন্য আন্দোলন করেছি। বার বার জেলে যেতে হয়েছে আর মামলার আসামী হতে হয়েছে। কিন্তু মনের কথা চাপা রাখি নাই। জেলে যেতে হবে জেনেও ছয় দফা জনগণের কাছে পেশ করেছিলাম। যদিও জানা ছিল শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর আঁতে ঘা লাগবে। ঝাঁপাইয়া পড়বে আমার ও আমার সহকর্মীদের উপর। অত্যাচার চরম হবে, তবুও গোপন করি নাই। আজ দুঃখের সাথে ভাবছি আমাকে গোপন ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করতে শাসকদের একটু বাঁধলো না! এরা তো আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভাল করে জানে। ভাবা ও চিন্তা করা ছাড়া কোনো কাজই যখন নাই যখন মনকে

বললাম, 'ভাবো যত পারো, কিন্তু পাগল করো না।' জীবনের বহু কথা মনে পড়তে লাগলো। খাতা কাগজ নাই যে কিছু লেখব। কলম আছে। কাগজ ও খাতা পাওয়ার কোনো উপায়ও নাই, আর অনুমতিও নাই।

আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করেছে কিনা? পূর্বে ২৮ জন গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন জেলে ছিল। ঢাকা জেলে প্রায় ২০/২২ জন ছিল। তাদেরও এখানে এনেছে কিনা? জানার উপায় নাই। কে কোথায় আছে কিছুই বলতে পারি না। পূর্বের ২৮ জন, আমি ছাড়াও নূতন গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা?

কামরার সামনে একজন রাইফেলধারী সিপাহি ও পিছনে একজন দাঁড়াইয়া আছে সর্বক্ষণের জন্য। মিলিটারি কাস্টডি কাকে বলে পূর্বে ধারণা ছিল না। প্রথম দিন এইভাবে কেটে গেল। পরের দিন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এলেন আমার কামরায়। তাকে আমি জানি না। তিনি আমাকে বললেন, কোনো অসুবিধা আছে কিনা? বললাম, জানলাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, না হলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে কি করে? তিনি জানলা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই অন্ধকার কামরায় বসে বসে খোদাকে ডাকা ছাড়া কি করতে পারি! রাত্রে আর একজন কর্মচারী এলেন তার নাম মেজর নাইম। এরা সকলেই প্রায় থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কর্মচারী। আমি এদেরই মেসে আছি। ইনি কুমিল্লা থেকে এসেছেন, সেখানেই তার পোস্টিং, যথারীতি পরিচয় হওয়ার পরে কোনো কথাবার্তা না বলে চুপ করে বসে থাকতে হয়। পাইপ খাওয়া বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক। কয়েক টিন তামাক আমার কাছে আছে। মাস দেড়েক চলতে পারে। ভাবলাম রেণু ও ছেলেমেয়েদের দেখা করতে দিবে না, তামাক আসবে কি করে! তাহারা নাও জানতে পারে আমি কোথায় আছি। আর জানলেও পাঠাবে কি করে? স্থির করলাম যে কয়েকদিন তামাক আছে খেতে থাকি, ফুরিয়ে গেলে ছেড়ে দিব। বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বাড়ির স্বজন-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ছেড়ে থাকতে পারি আর তামাক ছেড়ে থাকতে পারব না! দুই দিন পরে সকালে আর একজন ভদ্রলোক এলেন সাদা পোশাক পরিহিত। বললেন দু' একদিনের মধ্যে অফিসাররা আসবে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তারপর জনাব রিজভী ও ব্রিগেডিয়ার আকবর আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন। আমি তাকে যথারীতি ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

(পাঁচ মাস পরে খাতা পেয়েছি। তাই দিন তারিখগুলি আমার মনে নাই, ঘটনাগুলি যতদূর মনে পড়ে তাই লিখে রাখছি।)

পরের দিন সকাল ১১টার দিকে দু'জন ভদ্রলোক এলেন। তাদের জানি না, শুধু বুঝলাম সামরিক কর্মচারী হবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিছু জানি কিনা এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে। করাচিতে জনাব ফজলুর রহমান সিএসপিসহ নৌ-বাহিনীর কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিনা? ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থ সাহায্য করেছি কিনা? ঢাকায় জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএসপির সাথে একসাথে গোপন সভা করেছি কিনা? চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী মানিক চৌধুরীকে অর্থ সাহায্য করতে বলেছি কিনা? আমি বললাম, আজ ২১ মাস আমি দেশরক্ষা আইনে বন্দি। আপনারা বিশ্বাস করেন কেমন করে যে আমি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতে পারি? আমি কিছুই জানি না, কাহাকেও টাকা পয়সা দেই নাই। তাহারা চলে গেলেন, আমি খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় পড়ে রইলাম। রাত্রে খবর দেওয়া হলো মি. রিজভী ও ব্রিগেডিয়ার আকবর আগামীকাল সকাল বেলা আসবেন আমার সাথে দেখা করতে।

দু'টা বই ছিল পড়ে ফেলেছি। এখন উপায় কি? সময় কাটবে কি করে? এতদিন শরীর কিছু ঠিক রেখেছিলাম এবার বোধ হয় আর পারলাম না।

পরের দিন সকাল ১০টায় মি. রিজভী ও ব্রিগেডিয়ার আকবর মেসে বসে ডিউটি অফিসার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদ জাফরকে খবর দিলেন আমাকে মেসে নিয়ে যেতে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। সূর্যের আলো তো গায়ে লাগে নাই এই কয়দিন, তাই বের হয়ে গেলাম। এক মিনিটের বেশি সময় লাগলো না পৌঁছতে। রিজভী সাহেবের নাম আমি শুনেছি, কিন্তু আলাপ ছিল না। যথারীতি আলাপ পরিচয় হওয়ার পরে আমাকে নিয়ে রৌদ্রে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আমাকে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে? আপনারা তো আমার সম্বন্ধে জানেন। আমি তো গোপন ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। যাহা ভাল বুঝেছি তাহাই করেছি। স্বায়ত্তশাসনের দাবী তো ১৯৪৯ সাল থেকে আমি করতে শুরু করেছি। পার্লামেন্টে প্রাদেশিক আইন সভার বাইরে ও ভিতরে আমি প্রচার করেছি। তারপর ছয়দফা প্রোগ্রাম দিয়েছি ১৯৬৬ সালে। বই ছাপাইয়াছি, বক্তৃতা করেছি। আপনারা আমাকে ও আমার সহকর্মীদের দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে কতকগুলি মামলাও দায়ের করেছেন। আমি পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করি নাই। দুই অঞ্চলকে আলাদা করতেও চাই নাই। কারণ সংখ্যাগুরু অঞ্চল সংখ্যালঘুদের ভয়ে আলাদা হতে পারে না। আর এমন কোনো নজির ইতিহাসে নাই। আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে আপনারা রাজনীতি করতে দিবেন না। ঠিক আছে আপনারা আমার একটা চিঠি

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাহেবের কাছে পৌছাইয়া দিতে রাজি আছেন কিনা? কারণ যতদূর আমার জানা আছে তিনি অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী নন।

তাহারা বললেন, আমরা কি করব যদি অন্যান্য আসামিরা আপনার নাম বলে। আপনাকে এই মামলায় জড়িত আমরা করি নাই। অনেকেই আপনার নাম বলেছে। আপনি তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এবং অন্যকে দিতে বলেছেন।

আমি বললাম, যাহা হবার হবে, তবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে আমার পত্রটা পৌছাইয়া দেন। কারণ পাকিস্তান দুই ভাগ হয়ে যাক আমি চাই নাই। যদি চাইতাম তবে প্রকাশ্যে বলতাম। তিনি ইচ্ছা করলে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, কারণ আজ ২১ মাস আমি জেলে বন্দি। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া কারও সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না।

তাহারা বললেন, চিঠি আমরা নিতে পারব না। তবে যদি টেপরেকর্ডে আপনি কিছু বলতে চান বলে দিবেন—আমরা তাঁকে শুনাবো। রিজভী সাহেবকে আমার বাড়িতে খবর দিতে অনুরোধ করলাম যে আমি ভাল আছি এবং এখনও বেঁচে আছি। ব্রিগেডিয়ার আকবরকে বই দিতে অনুরোধ করলে তিনি ডিউটি অফিসারকে আমাকে বই পড়তে দিতে অনুমতি দিলেন, আর সন্ধ্যার পরে এক ঘণ্টা বাইরে বেড়াবার হুকুম দিলেন।

রিজভী সাহেব বললেন, "আপনার বাড়িতে আমি নিজেই যাবো এবং আপনার স্ত্রীকে বলে আসবো যে, আপনি ভাল আছেন। অসুবিধা নাই।" বললাম, "মেহেরবানি করে এই কাজটা করলে বাধিত হব।" খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হবে না, কারণ আইনে নাই।

তাহারা চলে গেলেন, আমিও কামরায় এসে ভাবতে বসলাম মানুষ স্বার্থের জন্য কিই না করতে পারে! শুনেছিলাম ভালবাসা ও রাজনীতিতে ভাল মন্দ বলে কোনো জিনিস নাই। আমি বিগ্রেডিয়ার আকবরকে বলেছিলাম, মনে রাখবেন এদেশের লোক বিশ্বাস করবে না আর করতে পারে না যে আমি ষড়যন্ত্র করতে পারি। আমার চরিত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা আছে। আমাকে জড়িত করে দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই করলেন। দরজা বন্ধ। ঘরের মধ্যে বসে মনে মনে ভাবলাম, রাজনীতি জঘন্য রূপ ধরেছে। এর আর শেষ নাই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে কোনো পন্থায় শেষ করার পথ অবলম্বন করেছে। লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদকে হুকুম দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার আকবর আমাকে বই দিতে। তিনি আমাকে একটা বই এনে দিলেন। রাত্রের ডিউটি

অফিসার মেজর নাইমও আমাকে একটা বই দিলেন। বইটা তার নিজের। মেজর নাইম কুমিল্লায় থাকতেন। ঢাকা এসেছেন কিছুদিনের জন্য আমাদের দেখাশোনা বা পাহারা দিতে। আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু পারতাম না। অনেকগুলি পাতা পড়ে ফেলেছি, কিন্তু কি যে পড়েছি মনে নাই। আবার নতুন করে পড়তে হয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। সমস্ত লাইট নিবাইয়া দেয়া হতো। যেখানে আমি হাঁটতাম তার দুই পাশে দুই সশস্ত্র সিপাহি পাহারায় রত থাকতেন। আর একজন অফিসার আমার সাথে হাঁটতেন। বড় দুঃখ হতো এই অফিসারটার জন্য, কারণ কথা বার্তা নাই, চুপচাপ আমার সাথে সাথে হাঁটতে হবে। সমস্ত দিন রাত্র দরজা বন্ধ। এই অবস্থায় কামরায় থাকার পরে যখন বাইরের হাওয়া গায়ে এসে লাগত তখন যে মনের অবস্থা কি হতো, কিভাবে প্রকাশ করব! বাইরের এই শীতল বাতাস আমার মনে যে কি আনন্দই না বয়ে দিত! তবুও মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম না। আবার চিন্তা এসে ঘিরে ধরতো। কর্মচারীদের আলোচনায় বুঝতে পারতাম কোর্ট মার্শালে বিচার করে সকলকে ফাঁসি বা গুলি করে মেরে ফেলবে। সকল কিছুই সম্ভব। মনে মনে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছিলাম। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই বলতে পারেন, 'পাকিস্তান আর্মি, এয়ারফোর্স ও নেভী আইনটা কি?' আমার তো কোনো ধারণা নাই। আমি সাধারণ নাগরিক, সামরিক বাহিনীর কর্মচারীও না। আমাকে কি করে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হলো।"

তিনি বললেন, আইনে আছে যদি কোনো নাগরিক সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের সাথে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে এই আইনে তাকেও গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

বুঝলাম, ব্যাপারটা কি। তিনি অন্য কিছু বলতে চাইলেন না। কারণ তাদের আলাপ করা নিষেধ।

দিন কি কাটতে চায়? আমি ছাড়াও আর কোনো আওয়ামী লীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে এনেছে কিনা– কোনো খবর নাই।

জনাব রিজভী ও ব্রিগেডিয়ার আকবর আমার সাথে আবার দেখা করতে এলেন। বললেন, চিঠি আপনি দিতে পারেন, আমরা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে পৌছাইয়া দিব।

আমি একটা খসড়া চিঠি লিখে রেখেছিলাম। তা পড়ে শোনালাম। তাহারা এই চিঠি নিতে রাজি হলেন না। বললেন, শেষের দিকে পরিবর্তন করলে নিতে পারি। বললাম, ঠিক আছে বলুন কি লিখতে হবে। ব্রিগেডিয়ার আকবর

বললেন, আমি লিখে নিলাম। তারপর আর একটা কাগজে নূতন করে লিখে তার হাতে দিলাম। তারা বললেন, পিন্ডি যেয়ে চিঠি প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছাইয়া দিব। তিনি কি বলেন তা আপনাকে জানাবো।

চিঠির শেষের প্যারাটা আমাকে বাধ্য করল লিখতে। না লিখে আমার উপায় ছিল না। ইজ্জতের ভয়তেই লিখতে হলো। আমাকে মিথ্যা মামলায় আসামী করে দেশের মঙ্গল হবে না। পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের কেহ বিশ্বাস করবে না। জনগণ বলবে, আমাকে অত্যাচার করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ৬দফা প্রস্তাব জনগণের সামনে পেশ করার পর থেকে সরকার আমার ওপর অত্যাচার চালাইয়া যাচ্ছে। ১২টা মামলাও দায়ের করেছে। আমার সহকর্মী খোন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দীন, আব্দুল মোমিন, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম, আমার ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণি ও আরও অনেকে ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে আছে এবং সকলের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

রিজভী সাহেব আমার বাড়িতে যেয়ে রেণুকে খবর দিয়ে এসেছেন, আর আমার বাড়িতে যে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ কিছু তামাকও নিয়ে এসেছেন। বললেন, আপনার বাড়ির সকলে ভাল আছে। আপনিও ভাল আছেন বলে এসেছি।

একটু নিশ্চিন্ত হলাম এই জন্য যে আমি যে কোথায় কি অবস্থায় আছি কেউই জানে না। একাকী কামরায় রাত্রদিন থাকা যে কি ভয়াবহ অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবে না। দিন কাটতে চায় না। বাইরে যেয়ে একটু হাঁটাচলা করবো তারও উপায় নাই। সূর্যের আলোও গায়ে স্পর্শ করার উপায় নাই। লুঙ্গি, জামা, গেঞ্জি নিজেরই ধুতে হয়। বিছানা নিজেরই করতে হয়। ধোপা কাপড় নিয়ে যায়, তবে ইচ্ছা মাফিক সময় লাগায়। আর আমি তো লুঙ্গিই পরি। নিজেই ধুয়ে নেই। কাপড় ধুবার সাবান যাহা ছিল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন কি করি। গেঞ্জি তো রোজই ধুতে হয়। সাবান কোথায় পাওয়া যাবে? সাবান যখন ফুরিয়ে গেল তখন গায়ে দেওয়া সাবান দিয়েই গেঞ্জি ধুতে আরম্ভ করলাম। একদিন মেজর গোলাম হোসেন চৌধুরী আমার উপর পাহারারত ছিলেন। বললাম, সাবান পেতে পারি কেমন করে। টাকা আমার আছে, কিনবার অনুমতি থাকলে কিনে দিবার বন্দোবস্ত করলে বাধিত হব। তিনি একটি সাবান আমাকে আনাইয়া দিলেন। আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম।

যেখানে থাকি সেখানকার আবহাওয়াও খুব ভয়াবহ বলে মনে হয়। মিলিটারি কাস্টডি কাকে বলা হয় তা তো পূর্বে জানতাম না। আমার থাকবার বন্দোবস্ত ভালই করা হয়েছে, কিন্তু যে খাবার দেয় তা খেতে আমার কষ্ট হয়। আমাশা রোগে অনেকদিন থেকে ভুগছি। রোজ রোজ গোস্ত ও রুটি খাই কেমন করে? পেটের ব্যথা শুরু হলো। ডাক্তার সাহেবরা আসেন ঔষধ দেন, কিছু দিন ভাল থাকি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। একদিন বললাম, রুটি আমি খেতে পারব না। আমাকে ভাত দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন। দু' একদিন পরেই ভাতের বন্দোবস্ত হলো। তবে গোস্ত চলল। অফিসার মেসে আমার খাবার বন্দোবস্ত, সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী—মাছ খেতে প্যারে না। এইভাবেই দিন চললো। তবে দিনে তিন চারবার চা খাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। চা না হলে আমার অসুবিধা হয়। এরপরে লেফটেন্যান্ট রাজা নসরুল্লা আজাদ কাশ্মীরের লোক, আমার কাছে ডিউটিতে আসতো। ভদ্রলোকের মনে খুবই দয়া। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। কারো কাছ থেকে কোনো দিন খারাপ ব্যবহার পাই নাই। খাবার কথা উঠলে তারা বলতো, কি করব আমরা যা খাই তাই আপনাকে দেই। আমার শরীর যে ভাল না, তা তারা বুঝতে পারতো। কোনো বদনা বা লোটা না থাকায় খুবই অসুবিধা হতো। একদিন ক্যাপ্টেন ওয়াহিদকে বললে তিনি নিজে টাকা দিয়ে একটা বদনা কিনে দিলেন।

আমিও কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করি না। এই মেসে আর কোনো বন্দি আছে কিনা বুঝতে পারছি না। দরজাটা সকলেরই বন্ধ। এই কামরাটার খবর ছাড়া কিছুই জানি না। কারো কোনো চিঠি পাই না। রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে কি অবস্থায় আছে? আব্বা মা ভাই বোন কোথায় কি করছে, কেমন আছে? এমনিভাবে একাকী দিন কাটছে। কোনো খবর নাই। শরীরও দিন দিন খারাপ হতেছে। একদিন একজন কর্মচারী বলল, দিনভর বসে আর শুয়ে থাকবেন না, ঘরের ভিতর যে জায়গাটুকু আছে সেখানে হাঁটাচলা করুন। কথাটা আমার মনে ধরল। যদিও ছোট্ট কামরা, ৩ ঘণ্টা সকালে দুপুরে বিকালে আপন মনে হাঁটতাম। খোদা ছাড়া কেইবা সাহায্য করতে পারে! দেশের কোথায় কি হতেছে? দুনিয়ায় কি ঘটছে? কোনো কিছুর খবর নাই। কাগজ পড়া নিষেধ। রেডিও শুনতে পারব না। কারো সাথে কথা নাই। দিন কাটাও। মনে মনে ভাবতাম, আমি তো ৭/৮ বৎসর জেল খেটেছি, আমার অবস্থাই এই। আর অন্য কাহাকে এনে থাকলে তাদের অবস্থা কি হয়েছে? এনেছে অনেককে গ্রেপ্তার করে। তবে কতজন এবং তারা কারা? ২৮ জনের নাম দেখেছিলাম কাগজে। নতুন কাকেও এনেছে কিনা! দিনগুলি কি কাটতে চায়! তবুও কাটাতে হবে। বই পেয়ে একটু রক্ষা পেয়েছিলাম।

অতিথিশালায় আমি থাকি, আর মেসে অন্য কোনো হতভাগা আমার মতো আছে কিনা, খবর নেওয়ার উপায় নাই। কেহ কিছু বলে না। সন্ধ্যার পরে আলো বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বাইরে কিছু সময় বেড়াবার হুকুম ছিল। আমি এই সময়টুকুর জন্য দিনভর অপেক্ষা করতাম। বাইরে যখন হাঁটতাম তখন দেখতে চেষ্টা করতাম কেহ আছে কিনা। একদিন দেখলাম তিনটা দরজা বন্ধ, অন্য দরজাগুলি খোলা। বুঝতে পারলাম বোধহয় আরও তিন হতভাগা এখানে আছে।

আমাকে সন্ধ্যার পরে আলো বন্ধ করে মেস এরিয়ার বাইরে একটা রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। একজন অফিসার আমার সাথে সাথে হাঁটতো আর দু'জন মিলিটারী রাস্তার দুইদিকে পাহারা দিত। কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারত না। রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হতো। কয়েকদিন বেড়াবার পরে আমার একটু সন্দেহ হলো। মেস এরিয়ার মধ্যে এত জায়গা থাকতে আমাকে বাইরে বেড়াতে নেওয়া হচ্ছে কেন? দু' একজনের ভাবসাবও ভাল মনে হচ্ছিল না। একটা খবরও আমি পেলাম। কেহ কেহ ষড়যন্ত্র করছে আমাকে হত্যা করতে। আমাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। তারপর বলা হবে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম, তাই পাহারাদার গুলি করতে বাধ্য হয়েছে। যেখানে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো জায়গাটা মেসের বাইরে। জনসাধারণ বা অন্য কাউকে দেখাতে পারবে যে আমি ভেগে বাইরে চলে গিয়াছিলাম তাই গুলি করা হয়েছে। আমি যে ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পেরেছি এটা কাহাকেও বুঝতে না দিয়ে বললাম, এরিয়ার বাইরে বেড়াতে যাবো না। ভিতরেই বেড়াব। ষড়যন্ত্রকারীরাও বুঝতে পারল যে আমিও বুঝতে পেরেছি। আমি অফিসারদের সামনেই বেড়াতাম। আর একটা খবরও পেয়েছিলাম পরে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নাকি বলে দিয়েছেন, আমার উপর যেন শারীরিক কোনো অত্যাচার না হয়। আমিও কথায় কথায় কর্মচারীদের জানাইয়া দিয়েছিলাম, আমার গায়ে যদি হাত দেওয়া হয় তবে আমি আত্মহত্যা করব। জানি ইহা একটি মহাপাপ। কিন্তু উপায় কি? মানসিক অত্যাচার যাহা করেছে তাহার চেয়ে গুলি করে মেরে ফেলা অনেক ভাল। দুই একজন ছাড়া থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সকলেই ভাল ব্যবহার করেছিল।

আমার সাথে আবহাওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিষয় কেহই আলোচনা করত না। একজন অফিসার সর্বক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। আমি কি করি, কি অবস্থায় থাকি। মাঝে মাঝে দুই একজন সাদা পোশাক পরিহিত সামরিক কর্মচারী আমার সাথে আলাপ করতে আসতেন জানবার জন্য। যাকে ইন্টারগেশন করা বলা হয়। আমার কোনো ধারণা নাই—কিছুই জানি না এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা সম্বন্ধে। তবে কথার ভিতর থেকে বুঝতে পারতাম

আমার স্ত্রী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, কিছুসংখ্যক সিএসপি অফিসার, দুই একজন পুলিশ অফিসার, একজন বিখ্যাত সাংবাদিককেও জড়িত করবার চেষ্টা চলছে। কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী সামরিক কর্মচারী একদম পাগল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। বিরাট কিছু একটা হয়ে গেছে। দেশকে রক্ষা করবার সমস্ত দায়িত্বই যেন তাদের উপরই পড়েছে। একটু গন্ধ পেলেই হলো, আর যায় কোথায়–একদম লাফাইয়া পড়ে অত্যাচার করার জন্য। তাদের ধারণা পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সকলেই রাষ্ট্রদ্রোহী। বুদ্ধি আক্কেল সকল কিছু পশ্চিম বাংলা থেকে চালান হয়ে ঢাকা আসে। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় পূর্ব বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সা জমিজমা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। দুই একজন আমাকে কথায় কথায় বলেছে এখনও বাঙালিরা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু কোথায় যে হিন্দুদের কর্তৃত্ব আমার জানা নাই। বর্ণ হিন্দুরা প্রায় সকলেই পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে গেছে, কিছুসংখ্যক নিম্ন বর্ণের হিন্দু আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটা কর্মচারীর ধারণা পূর্ব বাংলার লোক হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত।

কুর্মিটোলায় সামরিক বাহিনীর ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারই পূর্ব পাকিস্তানের হেডকোয়ার্টার। এখানে থাকলে বোঝা যায় যে কুর্মিটোলা একটা পাঞ্জাবি কলোনী। এখানে বাঙালি চোখে খুবই কম পড়ে। থার্ড পাঞ্জাব মেসে থাকতাম। সেখানে একজন মালি আর একজন বেয়ারা ছাড়া বাঙালি ওষুধ করতেও পাওয়া যায় না।

বাঙালি খানা এখানে পাওয়ার উপায় নাই। পাঞ্জাবি খানাই খেতে হতো আমাদের। বাবুর্চিও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি। কিভাবে যে এই খাওয়া খেয়ে বেঁচে আছি জানি না। জান বাঁচানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই খেতে বাধ্য হতাম। অনেক বলেও একজন বাঙালি বাবুর্চি রাখাতে পারলাম না।

তাদের কথা, সিকিউরিটির জন্য বাঙালি বাবুর্চি রাখা যায় না। একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। এমনভাবে মাসের পর মাস এদের সাথে থাকার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এখানে থাকবার সুযোগ পেয়ে দেখলাম বাঙালিদের তারা ব্যবহার করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিশ্বাস করতে রাজী নয়। আর বিশ্বাস করেও না। সকলকেই সন্দেহ করে। তাদের ধারণা প্রায় সকলেই নাকি আমার ভক্ত। মনে মনে সকলেই নাকি আলাদা হতে চায়। পূর্ব বাংলায় বাঙালির মুখ দেখতে পারি নাই কয়েকমাস এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করবে?

পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলায় কথা বলতে পারি নাই। কারণ কেহই বাংলা জানে না। ঢাকা রেডিও এরা শোনে না। হয় কলম্বো, না হয় দিল্লী—হিন্দি উর্দু গান শোনবার জন্য। বাংলা গান এরা বোঝে না বলেই শুনতে চায় না। বাংলা গান হলেই রেডিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। একজন বাঙালি ডাক্তার দেখতে আসতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা। নাম মেজর সফিক (ডা.)। তিনি কখনও একাকী আমাদের কামরায় আসতেন না। সাথে ডিউটি অফিসারকে নিয়ে আসতেন। কখনও বাংলায় কথা বলতেন না। ইংরেজি বা উর্দু। আমি তার চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি পূর্ব বাংলার লোক। বাংলায় আমি কথা বললে ইংরেজি বা উর্দুতে জবাব দিতেন। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, বোধ হয় বাংলা ভুলে গেছেন তাই উর্দু বলেন। তিনি বেহায়ার মত হাসতে লাগলেন। মনে হতো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। পরে তার সম্বন্ধে জানলাম তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে বিবাহ করেছেন। বাড়ির সাথে কোনো সম্বন্ধ নাই। নিজকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে ভয় পান। যদি কেহ মনে প্রাণে বাঙালি হয় তবে তার ভবিষ্যতের দরজা বন্ধ। এই ষড়যন্ত্র মামলা ইনকোয়ারী শুরু হওয়ার পরে যে কয়েকজন সামান্য বাঙালি কর্মচারী সামরিক বাহিনীতে আছেন তাদের অবস্থা বড় করুণ। কখন যে গ্রেপ্তার হবে কে বলতে পারে! তাই তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়।

থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কোনো বাঙালি কর্মচারী বা সিপাহি নাই। যে অফিসার মেসে আমাকে রাখা হয়েছে, সেখানে একজন বয় আছে যার উপর হুকুম আছে আমাদের কাছে আসতে পারবে না। আর একজন লোককে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি, মালি। তাই বাংলা কথা বলার উপায় নাই—পূর্ব বাংলার মাটিতে থেকেও—একেই বলে অদৃষ্ট! প্রাণটা আমার হাঁপাইয়া উঠছিল, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। বাংলা বই পাওয়ার উপায় নাই। অফিসার মেসের যে ছোট লাইব্রেরি আছে তাতে কোনো বাংলা বই নাই, সমস্তই প্রায় ইংরেজি ও উর্দুতে। হেডকোয়ার্টার লাইব্রেরি থেকে মেজর গোলাম হোসেন চৌধুরী আমাকে দু' একখানা এনে দিতেন। ভদ্রলোকও খুব লেখাপড়া করতেন। কোনো বাংলা বই বোধ হয় সেখানে নাই। খবরের কাগজ পড়া নিষেধ, তাই বাংলা কাগজ পড়ার প্রশ্ন আসে না। যে কয়েকজন অফিসার আছেন তারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, তারাই আমার ডিউটি করতেন। বাঙালিদের বোধ হয় ডিউটি দেওয়া নিষেধ ছিল। অন্য কোনো রেজিমেন্টে বাঙালি দুই একজন থাকলেও আমার কাছে আসার হুকুম নাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫)

১৯৫৫

৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.
>
> *[অনুবাদ : স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং*

সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।]

২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই তিনি চীনে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে

রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০

৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬২

৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন।

১৯৬৩

সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের

মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া কোন বিকল্প নেই'। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, *"একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।*

১৯৭০

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ

করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত,

বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :

> This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.
>
> [*অনুবাদ : এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।*]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি বার্তা পাঠান :

> পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের

মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশে সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিগামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানান হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে

বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিকব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড

কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল—দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারাখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল

আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১ মার্চ '৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর '৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালের হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড

বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচাপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হল।

১৫ আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে।*

* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এলবাম জাতির জনক, ৩য় প্রকাশ, ১৭ মার্চ ২০১০ থেকে উদ্ধৃত।

ব ঙ্গ ব ন্ধু

১১৯৬৯ সালে এদেশের জনগণ গভীর ভালোবাসায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। এর অর্থ, 'বাংলার বন্ধু'। জনগণ কর্তৃক এ ধরনের উপাধি প্রদান এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যগত রীতি। যেমন, দেশবন্ধু, শেরে বাংলা অথবা নেতাজী। তবে বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে নামটি আলংকারিক নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে জনগণের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের ভূমিকায় স্থিত করার লক্ষ্যেই এই অভিধা।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার একটি শান্ত, নিভৃত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মহকুমাকে জেলা শহরে উন্নীত করা হয়। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান স্থানীয় মুন্সেফ আদালতে সেরেস্তাদার হিসেবে কাজ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় জমিদার এবং নীলকরদের সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষের প্রতিরোধ সংগ্রামের গল্প শুনে বড়ো হন। এই জমিদার এবং নীলকরদের কারণে তাঁর পূর্বপুরুষের অনেকেই আর্থিক সমস্যা এবং হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। পরিবারের এসব নিগৃহীত হবার কাহিনি, ঔপনিবেশিক সামন্তবাদ এবং ভূস্বামী গোষ্ঠী কর্তৃক যাবতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁকে আন্দোলন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের সদস্য কর্তৃক তাঁদের গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে ৭ম শ্রেণিতে পড়ার সময় বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর হৃৎপি- এবং চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গ্লুকোমা রোগের জন্য তাঁর চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ মতো চার বছর তাঁর পড়াশুনা বন্ধ থাকে। ১৯৩৭ সালে নব উদ্দীপনায় তিনি স্কুলে ফিরে যান।

যৌবনের বছরগুলোয় শেখ মুজিবুর রহমান ভারতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সব ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করা শুরু করেন যে, ব্রিটিশ শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। যৌবনের প্রারম্ভিক বছরগুলোয় শেখ

মুজিবুর রহমান 'মুসলিম সেবা সমিতি'র সচিব হিসেবে সমাজসেবায় অংশ নেয়। এই সংগঠনটি দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করত।

১৯৩৮ সালে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের বাণিজ্য এবং শ্রমবিষয়ক মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শন করেন। তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের দায়িত্ব ছিল তাঁদের সংবর্ধনার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা। এই উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দীক্ষাদাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের শাখা এবং মুসলিম ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে বলেন। মন্ত্রীদের সফর উপলক্ষ্যে গঠিত মুসলিম লীগ সংবর্ধনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সংবর্ধনা-বিরোধী কংগ্রেস সদস্যদের যে সংঘর্ষ হয় তার জের ধরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে মিশন স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। যেহেতু তখন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু, সেহেতু একটি ভুল ধারণা জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয় যে হিন্দুরা মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থি।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে থাকা শুরু করেন। তিনি ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সাল নাগাদ ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরপর দু'বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইসলামিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। দেশভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের উন্নততর চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিষয়ক ডিগ্রি কোর্সের পড়া তিনি শেষ করতে পারেননি।

ছাত্র হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মধ্যম মানের। কারণ বিদ্যায়তনিক উৎকর্ষ অর্জনের বদলে রাজনীতিতেই তিনি বেশি সময় ব্যয়ে নিষ্ঠাবান ছিলেন। একটি বুদ্ধিমান, ধারালো এবং অনুসন্ধিৎসু মনের সুবাদে অবসর

সময়ে তিনি শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনের জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার শেষ দশক এবং পূর্ব পাকিস্তানের শুরুর দুই দশকের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার গভীর পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা দান করেছেন *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* শীর্ষক লেখায়। সেই পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে একজন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদর্শী এবং সক্রিয় সমর্থক হিসেবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে।

রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘ সময় কারান্তরিন থাকায় বিশেষত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আগ্রহের বিষয়সমূহের বই পড়ে এবং স্মৃতিকথা লিখে সময় অতিবাহিত করেছেন। একবার তিনি জেল থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে লেখা একটি চিঠিতে ইংল্যান্ডে যাবার এবং সেখানে ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অথবা এ. কে. ফজলুল হকের তুলনায়, যাঁদের প্রতি তাঁর ছিল গভীরতম শ্রদ্ধা, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন কলেজ গ্র্যাজুয়েট।

দুই অগ্রজ নেতার তুলনায় শেখ মুজিবের ভেতর যে বিরল গুণসমূহের সমাবেশ ঘটেছিল তা হলো প্রত্যুৎপন্নমতিতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং দর্শক-শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো বাচন ক্ষমতা। সত্যি বলতে রাজনৈতিক জীবনের গোড়াতেই তিনি জনসমাবেশে বক্তৃতা করার শিল্প এবং জনগণকে সংগঠিত করার কৌশল আয়ত্ত করেন। নিজের বেড়ে উঠার গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনজনের মতো মিশতে পারতেন। একাধারে জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শেখ মুজিবুর রহমান এমন এক রাজনীতিকের ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন যা একইসাথে গ্রামীণ এবং নাগরিক উভয় জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব করে।

উদ্দীপ্ত যৌবনে দীর্ঘকাল বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র কলকাতায় অবস্থান নানাভাবে শেখ মুজিবের জীবন গঠন ও পরিণত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় সহায়ক হয়। তিনিই পূর্ব বাংলার সর্বশেষ রাজনীতিক যার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা এবং গ্রামীণ পূর্ব-পাকিস্তানের সংযোগ-সূত্র ছিল। কলকাতার তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে যেমন তাঁর পরিচয় ছিল তেমনি দু'পক্ষের কিছু সংখ্যক নেতৃত্বের মধ্যে উদারতাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তবু তিনি দ্রুতই নেতাজীর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক

প্রত্যয়, হিন্দু-মুসলিম বোঝাপড়া তৈরির প্রচেষ্টা এবং তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানের জন্য তাঁর গভীর অনুরাগী হয়ে পড়েন। হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

কলকাতায় অবস্থানকালীন শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া তিনি এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, আবুল হাশিম এবং প্রগতিশীল মুসলিম নেতাদের অনেকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। সেই সঙ্গে নবাব এবং খান বাহাদুররা তো ছিলেনই। এঁদের মতো কলকাতায় বেশিরভাগ সময় কাটানোর চেয়ে মওলানা ভাসানীর ন্যায় নিজের গ্রামীণ পরিমণ্ডলের সাথে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখেন তিনি।

যৌবনেই শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় রাজনীতির ভুবনে পা রাখেন। ১৯৪০ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন' এবং 'অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগে'র কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একই সময়ে তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের মহকুমা শাখার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৪১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল সৌধ অপসারণের দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলনে অংশ নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই.এন.এ.)-র সমর্থনকারী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি একাত্মতা বোধ করেন। ১৯৪২-৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় গোপালগঞ্জে দুর্গত মানুষের সেবায় ফেরার সিদ্ধান্তের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে বিহার ও কলকাতার দাঙ্গায় মানুষকে বাঁচানো ও দুর্গত মানুষের সেবায় রাতদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকার দাঙ্গায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল একই রকম।

১৯৪৭-এর শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। দেশভাগের পরপরই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য তাঁর মোহমুক্তি ঘটায়। এছাড়া হিন্দুদের প্রান্তিকীকরণের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতিমালা এবং তাদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া করাচি থেকে প্রেরিত আদেশের ভিত্তিতে খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি পাকিস্তান অর্জনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মুসলিম লীগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নতুন সংগঠনের মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশে উদ্যোগী হন। তিনি 'গণতান্ত্রিক যুব লীগে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। একই সময়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি নবগঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি এই দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, দলকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৫৩ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নবগঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' যা আজকের আওয়ামী লীগের পূর্বসূরি।

শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে প্রবল আগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। সে সময় তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিদানকারী মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে এ বিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ চালান।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন এক ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়ায়। কারণ ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বাংলা লিখতে আরবি লিপি ব্যবহার করতে হবে এর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্রবিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ গুলি চালায় যার ফলে চারজন শহিদ এবং অনেকেই আহত হন। এই ঘটনার ফলে যে শক্তিশালী ভাষা আন্দোলন শুরু হয় তা বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উপাদানটিকে সংহত করে। এই আন্দোলনের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ তখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্ত ছিটকে পড়ছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি জেলে থাকা অবস্থাতেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং পূর্ব পাকিস্তানে সব ধরনের নিপীড়ন অবসানের দাবিতে অনশন শুরু করেন। ঢাকা কারাগারে তাঁর সঙ্গে ঢাকার ছাত্রদের যেন কোনো যোগাযোগ না হয় সেজন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। জনগণের প্রবল

চাপ অগ্রাহ্য করতে না পেরে তাঁকে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫৪ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৫ই মে ১৯৫৪ থেকে ৬ই জুন ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় সমবায়, ঋণ এবং গ্রামীণ পুনর্গঠন বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সালের জুনে তিনি পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য, শ্রম এবং শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান সেই দায়িত্ব পালন করেন। ৮ই আগস্ট তিনি মন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন, পূর্ণ সময় আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পালন করবেন বলে।

শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তাঁর দলের স্বার্থ মন্ত্রিত্বের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বোধ করেছিলেন যে মন্ত্রী হওয়ার স্বার্থ দলের স্বার্থের কাছে বিসর্জন দেওয়া উচিত। এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায়ই বাদানুবাদ হতো যা শেষাবধি দুই নেতার ভেতর অমোচনীয় বিভেদ তৈরি করে। যাহোক, মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক দায়িত্ব নির্বাহ করা শুরু করেন। যার ভেতর ছিল আইন পরিষদ বা সংসদে সংগঠন গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক সমাবেশের দায়িত্ব। কাজের সূত্রে দেশের ভেতরে নানা জায়গায় তাঁর প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। আর এই সুবাদে অসংখ্য মানুষকে তিনি দলে নিয়ে আসেন এবং দেশজুড়ে দলের অসংখ্য শাখা স্থাপন করেন। স্বভাবজাত বাগ্মিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিতা এবং সুস্পষ্টভাবে ভাবনা-চিন্তা ব্যক্ত করার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের নানা সভা এবং সম্মেলনে বিপুল জনসমাবেশ তৈরিতে সক্ষম হতেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে প্রায়ই গ্রেফতার হয়েছেন। ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৪-এর ১৪ই মার্চ নাগাদ তিনি চারবার গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার অব্যবহিত পরপরই তিনি পঞ্চম বারের মতো গ্রেফতার হন। ১৯৫৭

সালের ১২ই অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা শেখ মুজিবকে 'পূর্ব পাকিস্তান দুর্নীতি বিরোধী আইন ১৯৫৭' এবং ১৯৫৮ সালের অধ্যাদেশ-এর অধীনে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ভিত্তিহীন অভিযোগটি ছিল তাঁর আয়ের উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং বিসদৃশ বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন। এর পরপরই কঠোরতর 'জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ'-এর অধীনে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাঁর বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত অভিযোগ দায়ের করে। এই যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিল নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালির ন্যায্য অধিকারের জন্য দৃঢ় সংকল্প আন্দোলন পরিত্যাগে বাধ্য করা।

এরপর এলো শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন যা–সম্পদ বিতরণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সমতা; শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি এবং মুদ্রা ব্যতীত রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। এই বৈধ দাবি যার প্রতি বাঙালিদের পূর্ণ সমর্থন ছিল তা' পাকিস্তানি নেতৃত্ব এবং সামরিক বাহিনীর সাথে বাঙালিদের সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প তাঁকে গণমানুষের ভালোবাসা, প্রশংসা এবং অপ্রতিহত সমর্থন লাভে সাহায্য করে। আর এভাবেই এদেশের মানুষ গভীর ভালোবাসা এবং ঐকমত্যের সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় তাঁকে ভূষিত করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি করা এই যাবতীয় অন্যায় এবং অন্যায্য ব্যবহার চূড়ান্ত মাত্রা পেল যখন ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তাঁকে গ্রেফতার এবং কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তির ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করার দায়ে পুনরায় গ্রেফতার এবং ঢাকা সেনাছাউনিতে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা গেল না বটে তবে তাঁকে কারান্তরিন থাকতে হলো। অবশেষে ছাত্র-জনতার প্রবল বিক্ষোভের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করা হয়। হাজার হাজার হর্ষোৎফুল্ল সমথর্কদের এক সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। ইতঃপূর্বে পাকিস্তানের কোনো জন সমাবেশে এত মানুষ সমবেত হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান রাতারাতি হয়ে উঠলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।

বস্তুত স্বভূমির জনগণের দুর্দশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর এবং নিখাদ উদ্বেগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে অকুতোভয় সাহস তাঁকে আন্দোলন গড়ে তুলতে শক্তি জুগিয়েছে। তাঁর প্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব, কঠোর সংকল্প, গতিশীলতা এবং অভাবনীয় স্বতঃপ্রবৃত্ত শক্তি কোটি কোটি নর-নারী এমনকি শিশু অনুসারী সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। যাঁরা স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় তাঁকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে। আর এসবই শেখ মুজিবুর রহমানকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে সফল এবং বাঙালির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র গঠনের মহান নেতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ড. এনায়েতুর রহিম
ড. জয়েস রহিম

টীকা

অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) : কলকাতার ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৫ সালের পর আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তবে পরবর্তী জীবনে নানা বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক মতবাদে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ : *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*।

আজিজ আহমদ (১৯০৬-১৯৮২) : পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের উর্ধ্বতন অবাঙালি সদস্য। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি রূপে দায়িত্ব পালনকালে পূর্ব-বাংলার ভাষা-আন্দোলনসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ব-বাংলাকে সর্বতোভাবে দমনপীড়নে রাখার পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরনীতির অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী ছিলেন তিনি। এরই পুরস্কার হিসেবে তিনি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ভুট্টো সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন।

আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) : রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। আওয়ামী লীগ দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-এর অন্যতম সদস্য। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক। এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী এবং ১৯৫৬-৫৮ সময়কালে মুখ্যমন্ত্রী। পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি ১৯৬৯ সালে জাতীয় লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত বাকশালে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারে যোগ দিয়ে নয় মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ওজারতির দুই বছর*, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, *প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস*।

আবদুর রশিদ (১৯১২-২০০৩) : ১৯৪০-এর দশকে আলীপুর মহকুমার এসডিও ছিলেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিব হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) : আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্যমী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান (১৯৪৯)। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য (১৯৫৪) এবং মন্ত্রী। ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ত্যাগ। পরে আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন এবং কিছুদিন পরে আবার আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে করা পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেবের প্রধান কৌসুলি (১৯৬৯) ছিলেন।

আমেনা খাতুন (১৯২৭-১৯৮৯) : ১৯৫০ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৫৪ সালে কুমিল্লা-সিলেট মহিলা সংরক্ষিত আসনে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা। একই বছরের জুলাই মাস থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে দলের দুর্দিনে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে আদর্শচ্যুত হয়ে জনপ্রিয়তা হারান।

আলেক্সি কোসিগিন (১৯০৪-১৯৮০) : অর্থনীতি ও প্রযুক্তিবিদ আলেক্সি কোসিগিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠান্ডা যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রনায়ক ও দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৪-৮০)। বিশ্ব রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রধান কূটনৈতিক তৎপরতার এলাকা ছিল তৃতীয় বিশ্ব। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধাবসানের পর তাঁর উদ্যোগেই তাসখন্দ সম্মেলনে দুই দেশের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) : ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান তাঁকে পদচ্যুত করে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং বিদেশে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) : অবিভক্ত বাংলার দুইবারের প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭ ও ১৯৪১)। কিংবদন্তিপ্রতিম বাঙালি জননেতা। কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঋণ সালিসি বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মহাজনদের ঋণ থেকে মুক্ত করায় কৃষকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অন্যদিকে একই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও নিজ হাতে রাখায় বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্য থেকে নতুন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজি-আরবি-উর্দুসহ বহু ভাষায় দক্ষ এক সম্মোহন সৃষ্টিকারী বাগ্মী ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে উর্দু ভাষায় এক অসাধারণ বক্তৃতা করে 'শেরে বাংলা' খেতাবে ভূষিত হন।

এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) : বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর উপন্যাস *তেরেসা রেকুইন* (১৮৬৭) নানা কারণে আলোচিত-সমালোচিত। বঙ্গবন্ধু এই উপন্যাসটি জেলখানায় পড়েন বলে উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণ মেনন (১৮৯৬-১৯৭৪) : জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, কূটনীতিক, পার্লামেন্টারিয়ান, বাগ্মী, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সুদীর্ঘ বক্তৃতার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের তিনি অন্যতম স্থপতি। তরুণ বয়সে পেঙ্গুইন বুকসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। নানা গুণে গুণান্বিত পদ্মভূষণপ্রাপ্ত এই মানুষটি ১৯৭৪ সালে ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯-১৯৯৬) : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থি অংশের নেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নানা সন্দেহজনক ও বিতর্কিত কাজে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারের (১৯৭১-৭৫) বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মর্মান্তিক ও ষড়যন্ত্রমূলক হত্যায় তাঁর গোপন সমর্থন ও সহায়তা ছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৯৭৫-এ দেশদ্রোহী স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর তাঁকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসায়। ক্ষমতায় বসেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের কতক মৌলিক রাষ্ট্রীয় আদর্শের পশ্চাৎমুখী পরিবর্তন ঘটান। বাংলাদেশের এক নিন্দিত রাজনীতিবিদ।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০৫-১৯৮০) : দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। ১৯৫৫-১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-১৯৮০) : খ্যাতনামা সাংবাদিক। দীর্ঘকাল ঢাকার *দৈনিক সংবাদের* সম্পাদক ছিলেন। বিগত শতকের ষাটের দশকে পূর্ব-বাংলার প্রগতিশীল সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২-এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত *দৈনিক আজাদ* ও *কমরেড* (ইংরেজি) কাগজে কাজ করতেন। ১৯৪৭-এ ঢাকায় এসে ইংরেজি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগদান করেন। পরে *সংবাদের* সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। 'দরবার-ই জহুর' নামের জনপ্রিয় কলামের লেখক।

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ ডেপুটি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট কতক দেশদ্রোহী সেনা সদস্য কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর ঐ বছরেরই ৩রা নভেম্বর তাদেরই অনুসারীরা তাঁকে নেতৃত্বদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর তিন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে জেলখানায় ব্রাশফায়ারে হত্যা করে।

নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) : বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য ও স্পিকার এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তাঁর নির্দেশেই ছাত্রজনতার ওপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এবং তাতেই বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার প্রমুখ শহিদ হন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ পান।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) : বিশ্বনন্দিত ভারতীয় রাজনীতিক এবং জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আধুনিক ভারতের রূপকার। তাঁর বহুলপঠিত ও উচ্চ-প্রশংসিত বই *The Discovery of India* (1946)।

প্যাট্রিস লুমুম্বা (১৯২৫-১৯৬১) : আফ্রিকার বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেতা। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী (জুন-সেপ্টেম্বর ১৯৬০)। প্রথমে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা; ১৯৫৮ সালে গঠন করেন কঙ্গোর সারাদেশভিত্তিক জাতীয় রাজনৈতিক দল 'মুভমেন্ট ন্যাশনাল কঙ্গোলেইস' (Mouvement National Congolais)। ঐ বছরেই আক্রায় অনুষ্ঠিত প্যান আফ্রিকান সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে স্বাধীন কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোসে শোম্বে দেশটির একটি অংশ কাতাঙ্গাকে নতুন কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাঁর অনুগতরা লুমুম্বাকে হত্যা করে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) : রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশে জন্মলাভ করলেও রাজনীতির সূত্রপাত করেন আসামে। ১৯১৯ সালে কংগ্রেস দলে যোগদান করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও দশ মাসের কারাদ-ভোগ করেন। ১৯২৬ সালে আসামে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। ঐ বছর আসামে বাঙালি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে আসামে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালে মুক্তিলাভ করে পূর্ব- বাংলায় আগমন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন ও তার সভাপতি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল গণআন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক সভার সদস্য ছিলেন। শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রামের জন্য তিনি 'মজলুম জননেতা' হিসেবে পরিচিত।

মশিয়ুর রহমান (১৯২০-১৯৭১) : আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। যশোরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৮)। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সামরিক বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯) : তাঁর ডাক নাম মানিক মিয়া। মূল নাম তফাজ্জল হোসেন। বিখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তার প্রবক্তা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সাপ্তাহিক ও দৈনিক *ইত্তেফাকের* ভূমিকা ছিল তুলনারহিত। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাকে তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে গোটা পূর্ব-বাংলার জনগণের কাছে 'আমাদের বাঁচার দাবী' হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলেন। পাকিস্তানি সেনাশাসকদের পূর্ব-বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়ন এবং সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল ক্ষুরধার ও আপোষহীন। এ জন্য অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকারসমূহ তাঁকে বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের

পরোক্ষ সহায়তায় ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি হলে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ঢাকার প্রধান পত্রিকাসমূহে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) : পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক (১৯৫৮-৬০)। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি জানুয়ারি ১৯৫১-তে পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার ইন চিফ ও ১৯৫৪-৫৫ সময়কালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি সামরিক আইনে ও এরপর ১৯৬৯ পর্যন্ত নিজ প্রবর্তিত তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫২ সালে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের সময়ে এ অঞ্চলে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে এবং পরে পাকিস্তানের সামরিক শাসক হিসেবে বাঙালি জনগোষ্ঠী, তাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের অকুতোভয় নেতা শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর নানা লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি-মন্তব্য ছিল যেমন বিদ্বেষ ও অসূয়াপূর্ণ তেমনি তাঁর অজ্ঞতারও পরিচায়ক।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) : পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান নেতা। প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মতান্ত্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম গভর্নর জেনারেল হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় ছাত্রদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েন।

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) : ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা। যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর কতক নীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিমূলক বলে সমালোচিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) : বিখ্যাত বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'আঁধারের রূপ' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। সেই লেখারই উল্লেখ করেছেন লেখক।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) : বামপন্থি রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক। গণতান্ত্রিক যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয়তাবাদী। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান আমলে বহুবার রাজবন্দি হিসেবে কারাগারে কাটিয়েছেন। কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস *সারেং বউ* (১৯৬২), *সংশপ্তক* (১৯৬৫) এবং স্মৃতিকথা *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২)। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক সংবাদে*। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজাকার বাহিনীর হাতে শহিদ হন ১৪ই ডিসেম্বর। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম।

শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করে কারান্তরালে

পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। টাঙ্গাইলের এই নেতা মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্রার্থীকে উপনির্বাচনে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

শেখ ফজলুল হক মণি (১৯৩৯-১৯৭৫) : রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনে অবদান রাখেন। শেখ ফজলুল হক মণি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

সিরাজুদ্দীন হোসেন (১৯২৯-১৯৭১) : প্রথমে দৈনিক *আজাদ* ও পরে দৈনিক *ইত্তেফাকে* সাংবাদিকতা করেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৭১-এর শহিদ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ (১৯০০-১৯৮৬) : দিনাজপুরের খ্যাতনামা কৃষক নেতা ও রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাকশালে যোগদান করেন।

হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২) : রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক। ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সদস্য। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিরোধিতাকারী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) : বইতে পরবর্তী সময়ে তাঁকে 'শহীদ সাহেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় জননন্দিত বক্তা। যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৬)। তিনি পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাবা মায়ের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর বামে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তারপর শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে শেখ রেহানা শেখ কামাল এবং বঙ্গবন্ধুর কোলে শেখ রাসেল, ১৯৭২

লন্ডনে চিকিৎসারত বঙ্গবন্ধুর পাশে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

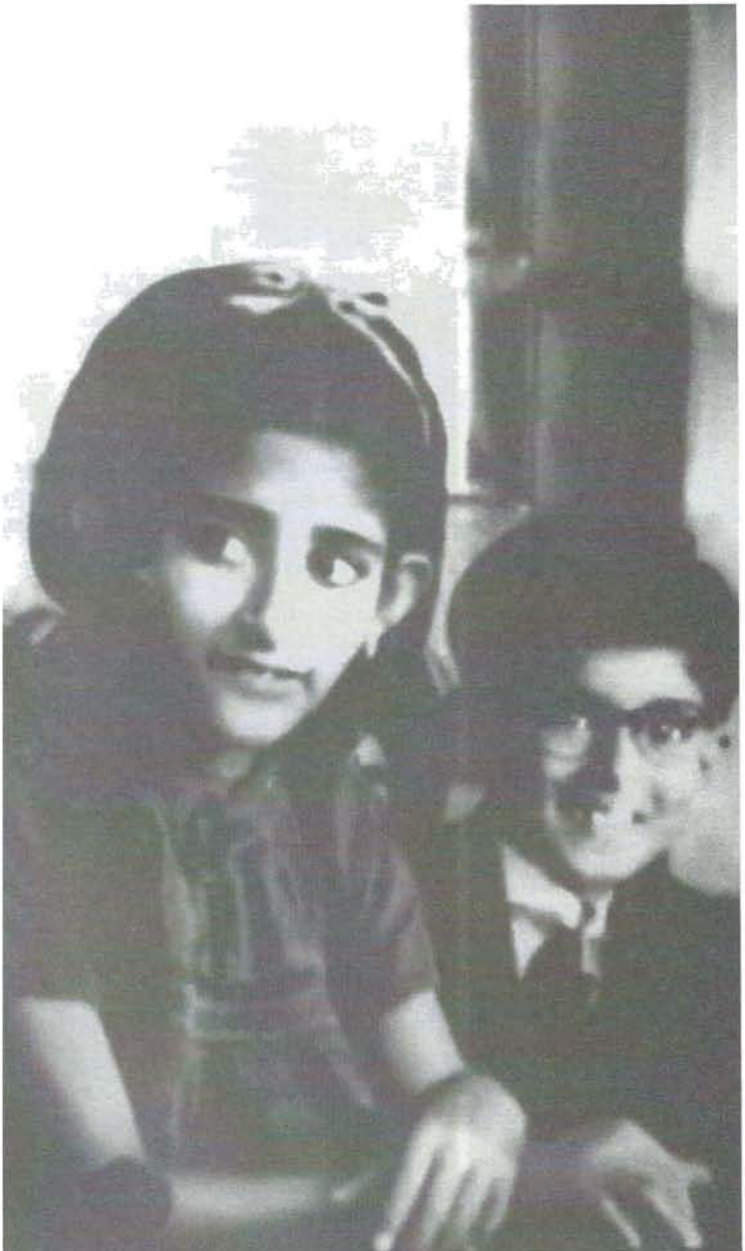

বাল্যকালে শেখ হাসিনা ও শেখ কামাল

শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ১৯৫৬

এ. কে. ফজলুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৬

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অমর একুশের প্রভাতফেরি

৬ দফার সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশের মঞ্চে শেখ মুজিবুর রহমান

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মালা পরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭২

১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর বামে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বোস প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ইয়ার মুহম্মদ খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ; শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আতাউর রহমান খানের উপস্থিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৬২

নিজ পাঠকক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পুরানা পল্টন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নির্বাচন-পরবর্তী আনন্দমুখর সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

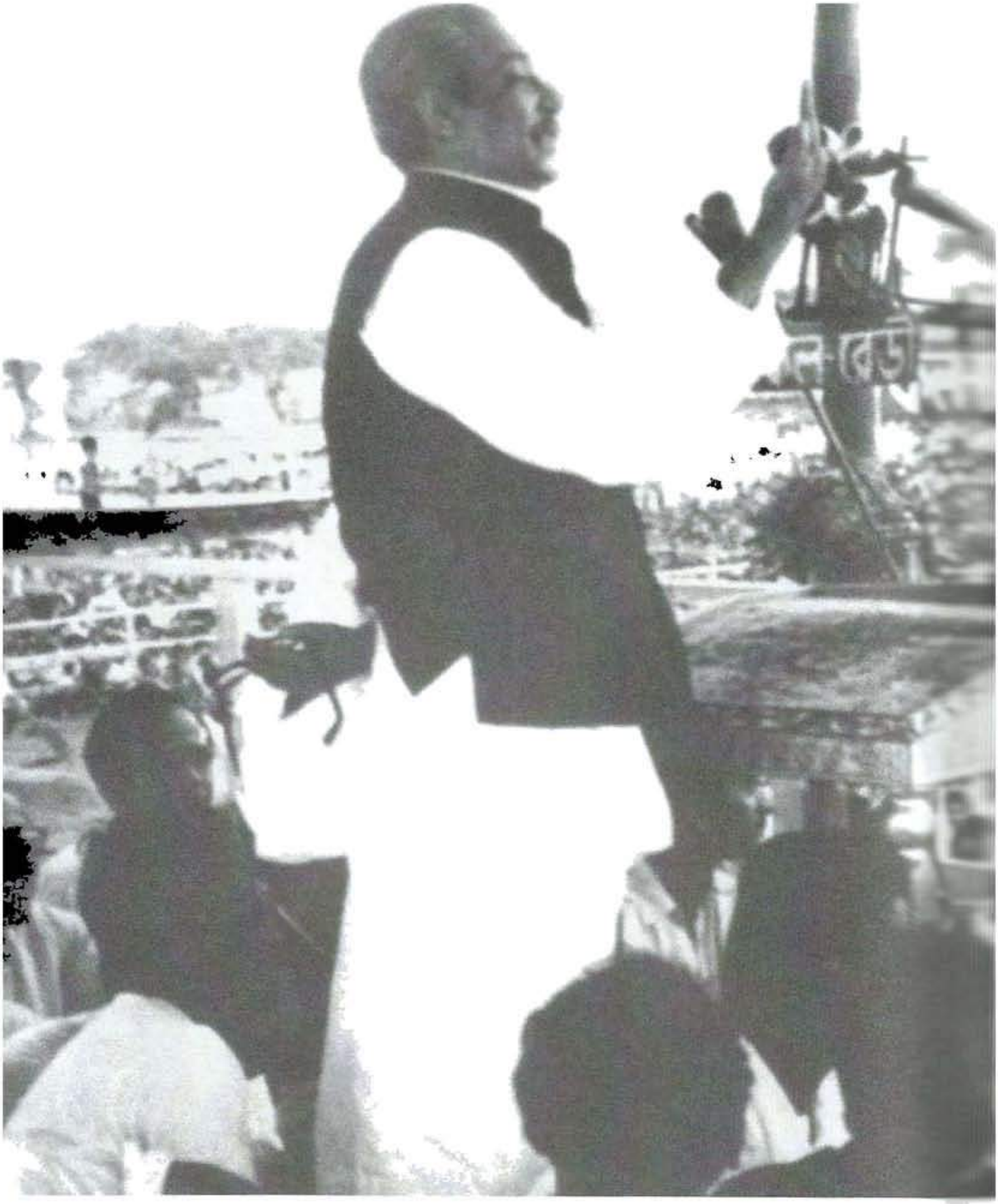

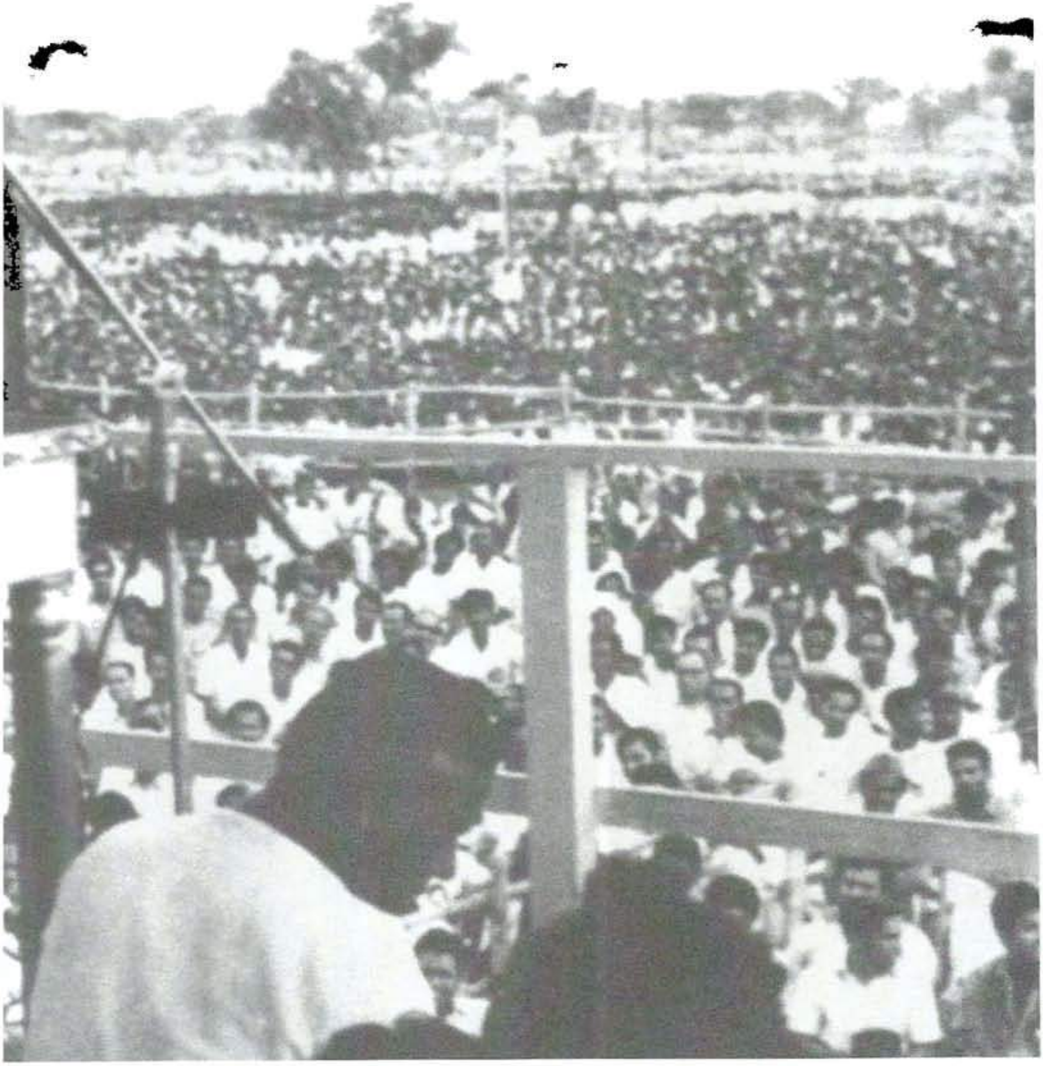

৬ দফার সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণরত শেখ মুজিবুর রহমান

বিতর্কিত এবডো আইনের বিপক্ষে আন্দোলনের এক পর্যায়ে বক্তৃতারত শেখ মুজিবুর রহমান, মঞ্চে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যরা, ১৯৬২

ঢাকার রাজপথে ৬ দফার সমর্থনে লড়াকু বাঙালি নারীদের মিছিল

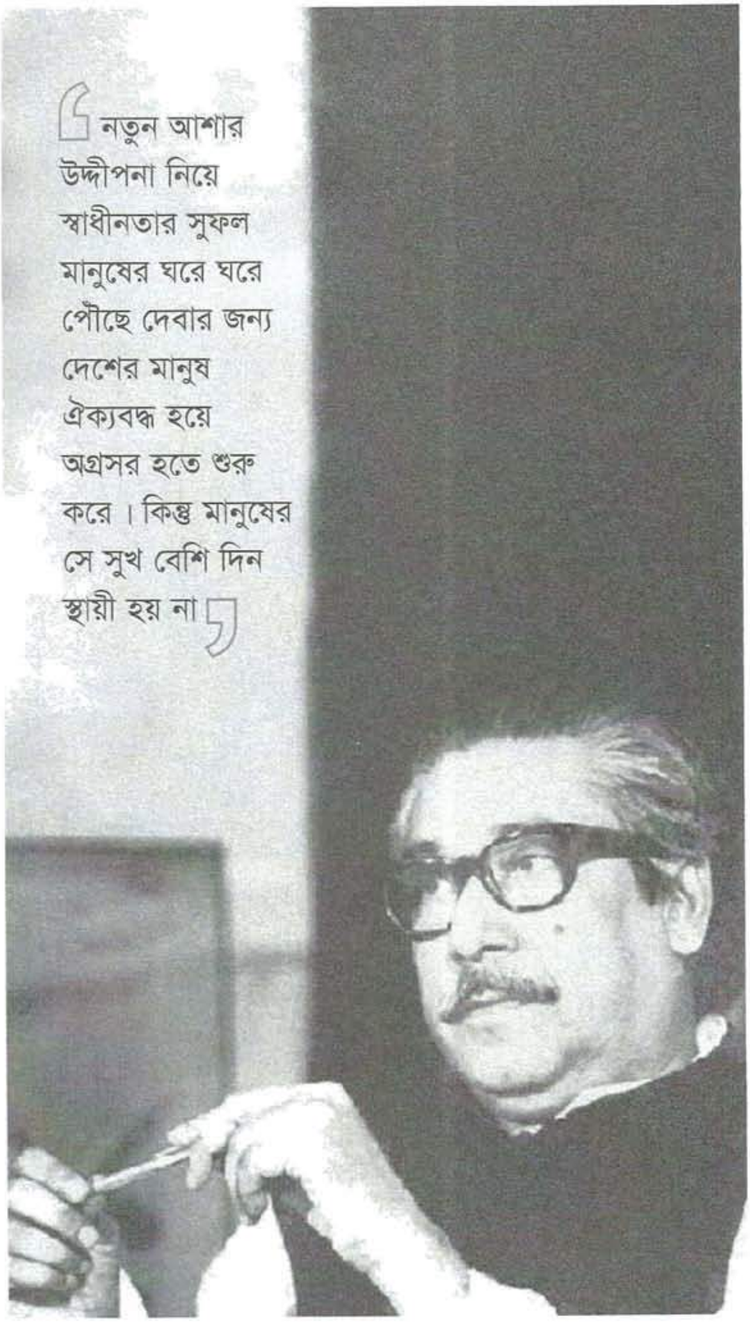
নতুন আশার
উদ্দীপনা নিয়ে
স্বাধীনতার সুফল
মানুষের ঘরে ঘরে
পৌঁছে দেবার জন্য
দেশের মানুষ
ঐক্যবদ্ধ হয়ে
অগ্রসর হতে শুরু
করে। কিন্তু মানুষের
সে সুখ বেশি দিন
স্থায়ী হয় না

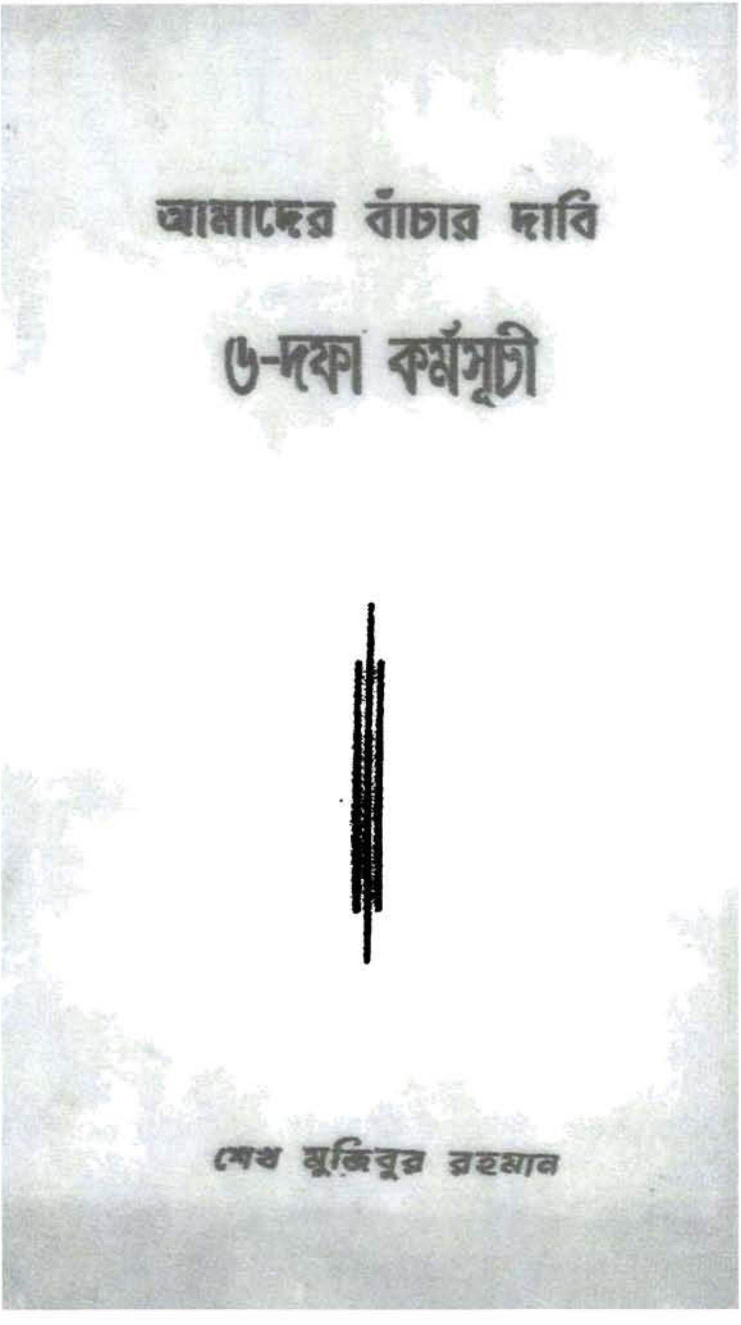
আমাদের বাঁচার দাবি
৬-দফা কর্মসূচী
শেখ মুজিবুর রহমান

আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচী

"আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছে। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি সনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয় শিক্ষা লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকদের দল ও তাহার দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি—তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থ শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনের ক্ষমতা অসীম, তাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনীর বেলায় এরা সকলে একজোট। এরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এরা ইতোমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্যই কর্তব্য। আশা করি, তাহারা সকলে অবিলম্বে

৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যমত প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে-এ সব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরনো দাবীরও পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাহারা আঁতকাইয়া ওঠেন, তাহারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থবাদী দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চাহেন।

এই দফার পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে তাহাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইনসভায়ই ভাল, এ বিচারভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন?

তাহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার–এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাহাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা–এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তান তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দেবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া স্টেট বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছেন যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ফেডারেটিং

ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাহাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেইবা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?"

৩ নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে, না আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলের দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি প্রকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাপে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলিবে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাহাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আজ যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাহাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাহাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না।

ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটি সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক রাখার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাহাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাহাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাহাতে 'ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল

ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দুইখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাংকের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফার ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউয়ে নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবে কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবে কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবে। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশংকাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবুও যে তাহারা এসব কথা বলিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগতস্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন অধিকার। তাহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলে সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাহারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাহারা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তাহার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তাহাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎ কাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি–

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে;

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে;

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা এই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে;

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতোই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে–

ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই–এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রপ্তানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকের কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালিরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীদের গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রপ্তানিকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রপ্তানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা

"এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ, ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবীও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তানকে আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে—এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের

পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাহাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবে জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করিবে– এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে–

এক.
তাহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবে।

দুই.
আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তাহার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুনে শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা—সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের

আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইতো তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইতো। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইতো না।

তিন.

আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইতো না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরং পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে—

১. প্রথম গণপরিষদে আমার মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম।

৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহীতার বদনাম ও জেল-জুলুমের তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বীদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহুদিন আগে পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহর দরবারে শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান "

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
প্রকাশক : আব্দুল মমিন
প্রচারে : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

নির্ঘণ্ট

অ

অবজ্ঞারভার ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭২, ১০৩, ১৫৪

অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ১৪২

অলি আহাদ ২০৭

আ

আইয়ুব খান ৬৬, ৮৩, ৮৯, ৯৫, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১২০, ১৩২, ১৫৩, ১৬৯, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৪, ২০৮, ২০৯, ২১৫, ২৬০, ২৬৫, ২৭০

আওয়ামী মুসলীম লীগ ২৭০

আওয়ামী লীগ ৫৬, ৫৮, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৩২, ১৩৩, ১৪৪, ১৫০, ১৫৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৯৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২২১, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩, ২৪৬, ২৫২, ২৫৩, ২৬০, ২৬২, ২৭০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮১

আকতার আহম্মদ খান ২২৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ২৫৯, ২৭৩

আজিজ আহম্মদ ২০৭

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ১৩৯, ১৮৪, ২৩৬, ২৭৩

আতাউর রহমান ১৫৭

আতাউর রহমান খান ২৩৬

আদমজী ২০২

আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট ৯৭

আফসার উদ্দিন আহম্মেদ ২৪৮

আফ্রো-এশীয় ১৬৮

আবদুর রব সেরনিয়াবাত ২৮০

আবদুর রশিদ ২২৬, ২৪২, ২৭২

আবদুর রহিম ২৩৬

আবদুর রহীম ১৯৪

আবদুল আজিজ ১৬২

আবদুল ওয়াদুদ ২০৭

আবদুল কাদের ব্যাপারী ২০২

আবদুল জব্বার ২০৫

আবদুল জলিল এডভোকেট ১৯৫

আবদুল নঈম খান রিন্টু ২৮১

আবদুল মাজেদ সরদার ৫৮

আবদুল মান্নান ৮৪, ১২৭, ১৪৩, ২১৫, ২২৩

আবদুল মালেক উকিল ১০৮

আবদুল মোনায়েম খান ৬৯

আবদুল মোমিন ২০২, ২২২, ২২৪

আবদুল মোমিন এডভোকেট ৫৬, ৬৮, ২৫২

আবদুল হালিম ১৪৩

আবদুস সবুর খান ১২৪, ১৬৪

আবদুস সালাম ২০৫

আবদুস সালাম খান ১৭৪, ২১৩, ২১৭, ২২৬, ২৩৬

আবুল বরকত ২০৫

আবুল মনসুর আহমদ ১৭০

আবদুল মাজেদ সরদার ৫৮

আবুল হোসেন ১৫৮, ২১১, ২২৬, ২৪২, ২৪৫

আবু সাঈদ এনতার ১৬২

আব্দুল ওয়াদুদ ২০৬

আব্দুল মালেক ১৯৩

আমদানী ১৬৪

আমজাদ হোসেন উকিল ২০৯
আমীর মোহাম্মদ খান ১৬৯
আমেনা বেগম ১৬৬, ২৩৮
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ১৩৪
আমেরিকা লবী ১৬০
আরজু মণি ২৮১
আলমগীর কবির ১৯২
আলি হোসেন ৪৬, ৪৭, ২১১
আলেক্সী কোসিগিন ৭৬, ১৯১
আশুগঞ্জ কমপ্লেক্স ২৭৯
আসলাম খান ১২১
আসাদুজ্জামান ১০৮
আহমেদুল কবীর ১২৫

ই

ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া ১৪১
ইউসুফ আলী এমএনএ ২৪৩
ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স ২৮১
ইন্দিরা গান্ধী ১০৩, ২৭৮
ইন্দোনেশিয়া ৫৭, ৬২, ৮৭, ১৪৯
ইপিআর ১৫২, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭
ইয়ার মহম্মদ খান ১২০
ইসকান্দার মীর্জা ১০৪
ইসলামাবাদ ১১১, ২১৭
ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৭৯
ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান ১৬৫
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ২৭৯
ইস্কান্দার মির্জা ১৭১, ২৭০
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৮৯
ইস্ট পাকিস্তান স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্স ৬১

ঈ

ঈদ ২০১, ২০২, ২০৩, ২১২, ২৫২

উ

উত্তর ভিয়েতনাম ১৬০, ১৭৪
উর্দু ১৭৭

এ

এ. কে. ফজলুল হক ১১৯, ২৩১
এডওয়ার্ড হীথ ২৭৮
এডভোকেট মাহমুদুল্লা ২০৮, ২২০
এডভোকেট মোহাম্মদউল্লাহ ১৮৩
এডভোকেট রব ১৫৮, ২১১, ২১২
এডভোকেট সালাম সাহেব ২০১, ২০৮
এ. বি. এম. খায়রুল হক ২৮১
এম আর খান ২৩৬
এম এ আজিজ ১৩৩, ২২৪, ২২৬
এম. এ. হান্নান ২৭৭
এমদাদুল্লা ২০৯
এমিল জোলা ২০১
এস এম হোসেন ৯২

ঐ

ঐক্যজোট ২২৬, ২২৭
ঐক্যফ্রন্ট ২৩৮, ২৭৯

ও

ওবায়দুর রহমান ৫৬, ৬৮, ১১৩, ২০২,
২১৩, ২২৩, ২২৭, ২৬৩
ওয়াশিংটন ১০৩

ক

কংগ্রেস ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৯, ১৫৯
কঙ্গো ৫৯
কনভিক্ট ওভারশিয়ার ২৮, ২৯
কনভেনশন মুসলিম লীগ ১২১
কনভোকেশন ২০৬

কনসর্টিয়াম ১৫৬
কমর ইদরিস ১৬২
কমিউনিজম ১৪৯
কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৯
কম্বল ফ্যাক্টরী ৩৫
করাচী ৫৭, ৬৫, ৯৯, ১১১, ২১৭
কর্নেল জামিল আহমেদ ২৮১
কর্নেল শের আলি বাজ ২৫৭
কলকাতা ২২২
কাজী গোলাম মাহবুব ২০৭
কাজী গোলাম রসুল ২৮১
কাদলু লোহানী ২১১
কামরুজ্জামান এমএনএ ২৪৩
কামাল ১৫৯, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২৪৭, ২৫৪, ২৮০
কায়েদে আজম ২০৬
কারফিউ ২৭৩
কারবানক্যুল ২০১
কার্জন হল ৭০
কালা-ঝুপী ১২৯
কাশ্মীর ১৫৯, ১৬০, ১৮৬, ২৬৪
কুর্মিটোলা ২৫১, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৬
কৃষ্ণ মেনন ১০৭
কে এস পি ১০৪
কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১১৯
কোয়ালিশন সরকার ১০৪, ১৪২, ২৭০, ২৭৫
কোর্ট মার্শাল ২৬২
কেসটাকোল ৩০
কোহিস্তান ১৫২
ক্যান্টনমেন্ট ২৫৬
ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ ২৬৪
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ২০৯
ক্যাপ্টেন সামাদ ১৮৩
ক্যু ২৮১
ক্রুগ মিশন ১১০
ক্ষুদিরাম ১৮০

খ

খরচ ৪১, ৪৪, ৫১, ৫২, ৫৮, ৭৯, ৮৫, ৮৬, ৯০, ১১০, ১১১, ১১৬, ১৪৪, ১৬২, ১৮১, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৬, ২১৫, ২৩৯
খলিফা শাহনেওয়াজ ১৬২
খাজা আহম্মদ সাফদার ১৬২
খাজা খয়ের উদ্দিন ২৩৬
খাজা নাজিমুদ্দীন ৬৫, ১২৫, ২০৭
খাজা মহম্মদ রফিক ১২০
খাজা মহীউদ্দীন ১২৫, ১৩৯
খাজা সিদ্দিকুল হাসান ১৬১
খালেক নেওয়াজ ২০৭
খিচুড়ি সংগ্রাম পরিষদ ২৩৪
খোন্দকার মোশতাক আহমদ ৭৮, ১৫৭, ২১৩, ২২০, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭

গ

গণতন্ত্র ৮৩, ৯২, ৯৩, ১৯৩, ২২৬, ২৪৫, ২৭১, ২৮১
গোপীনাথ সাহা ১৮০
গোয়ালন্দ ১২৯
গোর্কি ২৭৪
গোলটেবিল বৈঠক ২৭৩
গোলাম আজম ২৩৬
গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর ২২৬
গ্যাং কেস ১৬৫, ১৭৫
গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ১০০, ১০৮, ১১৭, ১৩২, ২৫৪

ঘ
ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৬২
ঘোড়াশাল সার কারখানা ২৭৯

চ
চটকল ফেডারেশন ১২৭, ১৪৩
চটকল শ্রমিক ফেডারেশন ৮৪, ১৬০, ২৮২
চিত্ত সুতার ৮৫, ৯০, ১১৮, ১৩৮, ১৯৫
চৌ এন লাই ১৩৪
চৌকি দফা ৩১, ৩২
চৌধুরী কলিমুদ্দিন ১৬১
চৌধুরী নিজাম ২১১
চৌধুরী মহম্মদ আলি ২৩৬
চৌধুরী মহম্মদ হোসেন ১৬২

ছ
ছয় দফা ৫৭, ৯৬, ১৩২, ১৬৮, ১৭২, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ২১১, ২২২, ২৪১
ছাত্র ইউনিয়ন ২০২
ছাত্রলীগ ২০২, ২১১
ছোটলাট ১৬৯

জ
জওহরলাল ১০৭
জজকোর্ট ২১৩, ২১৭
জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২৭১, ২৭৩
জনসন সান্ডন স্যারনমি ১৮৭
জলভরি দফা ৩২
জহিরউদ্দিন ২১৭
জহুর আহম্মদ চৌধুরী ২২৪
জহুর হোসেন চৌধুরী ৫৭
জাকির হোসেন ৫৬, ১৬৪, ১৯৩
জাতিসংঘ ১৪৯
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ২৩৬, ২৭১
জাতীয় শোক দিবস ২৮২
জাতীয় সরকার ১২৭
জামাতে ইসলামী ২৩৬
জামাল ২৩৪, ২৪১, ২৪৭
জালাল উদ্দিন আহম্মদ ১৯৪
জিন্না ১৪১, ১৪২
জীবন ঘোষ ১৮০
জুলফিকার আলী ভুট্টো ১০৪, ২৭৫, ২৭৮
জুলিও কুরী ২৭৮
জেনারেল ইয়াহিয়া ২৭৩, ২৭৫
জেনারেল জিয়াউর রহমান ২৮১
জেনারেল মোবুতু ৫৯
জেনেভা ২৭৮
জেলগেট কোর্ট ২৪৫
জেল হাসপাতাল ২৩৭, ২৪০
জেলের আইজি ২০৪
জোহা চৌধুরী ২১১

ঝ
ঝাড়ু দফা ৩২

ট
টাইমস ১৬৭
ট্যাক্স হলিডে ৮৫

ড
ড. এম. নূরুল হুদা ১২২
ডন ১০১, ১৪৬, ১৫৮
ডা. গোলাম মওলা ২৪৮
ডান্ডাবেড়ি ১৪৪, ১৭৪, ১৭৫
ডিক্রি এলাকা ২৪৫
ডিপিআর ৬১, ৬২, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৯৭, ১১৩, ১২০, ১৬০, ১৭৮, ১৮১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬,

২০৯, ২১২, ২১৫, ২১৮, ২২৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৪০
ডি পি আর রুল ৬১
ডিবেটিং ক্লাব ৭৬
ডিভিশন বেঞ্চ ২৩৯
ডেথ রেফারেন্স ২৮১

ঢ
ঢাকা ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৯৩, ৯৮, ১১৩, ১১৯, ১২০, ১২৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৬, ১৬৯, ১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯৫, ২০৩, ২০৬, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২২৪, ২২৭, ২৩১, ২৩৩, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৫, ২৬০, ২৬২, ২৬৬, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ১০২, ১১৯, ১৯৯, ২৫১, ২৭২
ঢাকা গ্যাং ডাকাতি ১৬৪
ঢাকা জেল ৭৮, ১৬১, ২০৪, ২২০
ঢাকা জেলা জজ ২৩৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২২, ১২৮, ২৭৬, ২৭৮
ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ ২০৯

ত
তফাজ্জল হোসেন ৯৫, ৯৭, ১০৮, ১১৭, ১৩৭, ১৪৫
তমদ্দুন মজলিস ২০৬
তাজউদ্দীন আহমদ ১৭৪, ২৭৭
তারকেশ্বর ১৮০
তাসখন্দ ৬২
তেরেসা রেকুইন ১০১
তোজাম্মেল ২৫২
তোফাজ্জল আলি ২৩৬
তোকায়েল মোহাম্মদ ২৩৬

থ
থরো ২২৬

দ
দরজী খাতা ৩৬
দাউদ কারানী ১১১
দাঙ্গা ২৭২
দি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস ১০৩
দেওয়ান ফরিদ গাজী ২৪৯
দেওয়ানী ওয়ার্ড ২১০, ২৪০, ২৪৭
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৯
দৈনিক আজাদ ৯২
দৈনিক ইত্তেফাক ১০৮
দৈনিক পাকিস্তান ১০০, ১০১, ১৫৪

ধ
ধনতন্ত্রবাদ ১৩৪
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক ২৭৬

ন
নঈমুদ্দীন ২০৭
নওয়াই ওয়াক্ত ১৫৪
নজরুল ইসলাম ২২৬
নবাব কালাবাগ ১৪৫, ১৭১
নবাবজাদা নসরুল্লাহ খাঁ ১২০, ১৫৯, ২২৬, ২৪৩, ২৪৬
নয়া ডিকটেটোরিয়াল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১৬৩
নাইজেরিয়া ১৮৭
নাইটগার্ড ২৮, ২৯

নাজিমুদ্দীন ২০৬
নারায়ণগঞ্জ ৫৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৮, ৮৪, ১০৫, ১২৫, ১২৭, ১৩২, ১৩৮, ১৫২, ১৫৩, ১৭৭, ২১৩, ২২৭, ২৪১, ২৪৭, ২৪৯, ২৭২
নিউজউইক ১৬৭
নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস ১০৮, ১১৪, ১১৬, ১৩৭
নিখিল পাক সংবাদপত্র সমিতি ১৩৬
নিখিল ভারত মুসলীম লীগ ২১৩, ২৩১
নিজামে ইসলাম ১০৪
নিয়ামতুল্লা ৫৩, ২০৪
নূরু ১৫৫
নূরুল আমীন ৬৫, ৬৭, ৯২, ১৩৩, ১৬৮, ১৭২, ১৮৪, ২০৭, ২৩৬
নূরুল ইসলাম ১৫৮, ১৯৪, ২০২, ২১৩, ২২৩, ২২৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৪১, ২৪৩, ২৪৮, ২৬৩
নূরুল ইসলাম চৌধুরী ৭৮, ১৭১, ১৭৪, ২২০, ২২৪, ২৪২
নূরে আলম সিদ্দিকী ১৯২, ২০২, ২১২, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৪০, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮
নেজামে ইসলাম ২৩৬
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৮৯
নেহেরু রিপোর্ট ১৪১
নোয়াখালী ১২১, ২৩৩, ২৫২
নৌ-বাহিনী ২৩৭, ২৫৩, ২৬০
ন্যাপ ৫৭, ৯৯, ১০৪, ১৪৩, ১৭০, ১৭১, ১৮৫, ১৯৪, ২১৫, ২২৬, ২২৯, ২৪৩

প
পঞ্চাশ জানালা বাড়ি ২৯
পয়গাম ১৫৪
পল্টন ময়দান ২১৭, ২৩০, ২৪৬, ২৬৯
পশ্চিম পাকিস্তান ৫৭, ৬৫, ৭৩, ৮২, ৮৩, ৮৯, ১১১, ১২০, ১২১, ১২৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ২০২, ২০৭, ২১৫, ২১৭, ২২৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৫
পাক-ভারত যুদ্ধ ৬২, ১০৩, ২১৭
পাকিস্তান ৩৮, ৪২, ৫৭, ৬২, ৭৯, ৮২, ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৮, ১১১, ১১৭, ১২০, ১২১, ১৩৪, ১৩৭, ১৪০, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৬৬, ১৮০, ১৮৭, ১৯৬, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, ২৬১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
পাকিস্তান অবজারভার ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭২, ১০৩, ১৫৪, ২৩৮
পাকিস্তান আইন পরিষদ ২৪৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ২৩৮
পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন ১০২, ২৩০
পাকিস্তান পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন ১৩৪
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ২৭৫
পাকিস্তান প্রস্তাব ২১৩
পাকিস্তান শাসনতন্ত্র ২৩১
পাকিস্তান সমিতি ৯২
পাগলখানা ৬৪
পাগল খাতা ৩৫
পাগল দফা ৩৩
পাগলা গারদ ৬৪, ৯৭, ১৫১, ২০৪, ২১৮
পাগলা ঘণ্টা ২৯, ১৪৬

পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ২৫৯, ২৬৫, ২৬৭
পানি দফা ৭৫
পার্লামেন্টারি পার্টি ১০৪, ১৭০
পাসবান ১৫৪
পি. এম শাহাবুদ্দীন ৩০, ৩১
পিকচার্স হাউস ১৭০
পিডিএমএ ২৪১, ২৪৩
পিন্ডি ৫৭, ৮৫, ১০০, ১২৪, ১৮৪,
২১৭, ২৪৩, ২৬৩
পিপলস কংগ্রেস ১৪৯, ২৭৫
পিলখানা ২৭৬
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১১৩, ২০৬, ২০৭
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ৭৬
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ২০৬
পূর্ব পাকিস্তান সরকার ৬২
পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫১
পূর্বাণী ১০২, ১০৮
প্যামফ্লেট ৬৬, ১৫৮, ১৮৬
প্যারি নগরী ১৬১
প্যারোল ৭৭, ২১৬, ২৭৩
প্রতাপউদ্দিন সাহেব ২১৩
প্রতীক ধর্মঘট ১০৮, ১৩৬
প্রফেসর ইউসুফ আলী ৬২
প্রভাতী পত্রিকা ১৩৬
প্রেস কোর্ট অব অনার ৯৭

ফ

ফজলুর রহমান সিএস পি ২৫৩, ২৬০
ফজলে আলী ১৯২, ১৯৩
ফতুল্লা থানা ২৪৭
ফরিদ আহম্মদ ২৩৬, ২৫৫
ফরিদপুর ৩৩, ৪১, ৪২, ৪৪, ৯৮, ১২৯,
১৫৩, ১৯৬, ২০৫, ২০৬, ২১০
ফায়জালাবাদ (লায়ালপুর) ২৭৭
ফালতু ৭৭, ৮০, ১১৫, ১১৬, ১২৮,
১৪৬, ২৩৫
ফেডারেল ফর্ম ১৪০
ফেডারেল শাসনতন্ত্র ১৪১, ১৪২
ফেডারেল সরকার ১৪২, ২৩৬
ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ১৩৬, ১৪৫
ফেলু ময়াল ১৭৫
ফৌজ ১২৬, ১৪৬

ব

বগুড়া ৯৮, ১৭৭
বঙ্গবন্ধু ২৬৯-২৮১
বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকার ২৭০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৯, ২৬৯,
২৭০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৫,
২৭৭, ২৮০, ২৮১
বজলুর রহমান ২০২, ২৪৯
বদিউল আলম ২২৩
বন্দুক দফা ৩৩
বরিশাল ৪৬, ৮৫, ১০৯, ১৩০, ১৯১
বাংলাদেশ ১১১, ১১২, ১১৯, ১২১, ১৪১,
২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮,
২৭৯, ২৮০, ২৮১
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ২৮০
বাংলা নববর্ষ ২২২
বাংলার মাটি ১৩০, ১৬৪, ২১৫, ২৩১,
২৪৪, ২৫৬, ২৬৭
বাঁশের ধনুক ২১৯
বাঙালি জওয়ান ২৭৭
বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার ৮৫, ১০৬, ১১৮, ১৯৫,
২০২, ২০৯, ২২৩
বাবু সুধাংশু বিমল দত্ত ২০৯
বাস্তিল কারাগার ১৬১
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২৮১

বিনাশ্রম কারাদ- ২৩০
বিপ্লবী সরকার ২৭৭
বিশ সেল ৫৮, ৭৪, ৮৬, ৯০, ১২৫, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ২০৫, ২১০, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২২, ২২৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৪০
বিশ্বব্যাংক ১৬০
বৃটেন ৯২
বেগম ফজিলাতুননেছা ২৮০
বেঙ্গল পুলিশ ১৫২
বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৭৭
বেবী সেরনিয়াবাত ২৮০
বৈদেশিক নীতি ১০৪, ১০৮, ১৩২, ১৬৯, ১৭০
বৈদ্যনাথতলা ২৭৭
বৈরুত ২৭১
ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ১৮০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৮২
ব্রিগেডিয়ার আকবর ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ২৭৮

ভ

ভারতবর্ষ ৮২, ৯৬, ১৪০, ১৪২, ১৫৯
ভাষা আন্দোলন ৬৫, ৭৯, ২০৬
ভাষা দিবস ২০৬
ভাসানী ৫৭, ৬৫, ১০০, ১০৪, ১৩২, ১৩৩, ১৬৯, ১৭০, ২০৮
ভি. ভি. গিরি ২৭৮
ভিয়েতনাম ১৬০, ১৭৪
ভিলেজ এইড ২৭০

ম

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ২৭২
মওলানা ওবায়দুল্লা ২৪৪
মওলানা মওদুদী ২৪১, ২৪২
মওলানা মহম্মদ আলি ১৪২
মওলানা হজরত সোহানী ১৪১
মতিয়ার রহমান ১৩০
মতিলাল নেহেরু ১৪১
মহম্মদ আলী ১৬৪
মহম্মদ ইসমাইল ১৬১
ময়মনসিংহ ৪৬, ৫৭, ৫৯, ৬৫, ৭৭, ৮২, ৮৮, ৯৮, ১৮২, ১৯৬, ২১২, ২১৩, ২২৪, ২৩৩, ২৪১, ২৫২, ২৭২
ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ ৬৫
মর্নিং নিউজ ৫৭, ৬৬, ১০১, ১০৩, ১২০, ১২৪, ১৫৪
মশিউর রহমান ৯৯
মহম্মদ তোয়াহা ২০৭
মহাখালী টিবি হাসপাতাল ১৮৩
মহীউদ্দিন (খোকা) ২০২
মহীউদ্দিন আহম্মদ ২২৭
মাজেদুল হক ২৪৯
মানিক চৌধুরী ২৪৯, ২৬০
মানিক মিয়া ৯৬, ৯৭, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১
মার্কসবাদ ১৪৯
মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ৯৯
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ১০৩
মার্কিন পাইলট ১৭৪
মালয়েশিয়া ৫৭
মালিক গোলাম জিলানী ১২০, ১৬১, ২২৬
মালিক সরফরাজ ২২৬
মাহবুব মোস্তফা ১৬২
মাহমুদ আলি ১৬৪
মাহমুদ আলী ২৪৩
মাহমুদ আহমেদ সিন্ধী ১৬২
মাহমুদউল্লাহ ১৯৪

মিজানুর রহমান চৌধুরী ৮৫, ১১৭, ১৩৭, ২০২, ২১৩, ২২২, ২২৩, ২২৭, ২৪১
মিত্রবাহিনী ২৭৮
মিন্টু রোড ১১৯
মিয়া মমতাজ দৌলতানা ২৩৬
মিয়া মানজার বশীর ১৬১
মিলিটারী একাডেমী ২৩৭
মিশর ১০৪, ১৭১
মিস জিন্নাহ ১৬৭
মীর জাফর আলি খাঁ ১১১
মুচি খাতা ৩৬
মুজিবর রহমান (রাজশাহী) ২৪২
মুসলিম লীগ ৩০, ৬৫, ৬৬, ৯৯, ১০৪, ১১৯, ১২১, ১২৪, ১৪১, ১৪২, ১৫৮, ২৩১, ২৭০
মুসলিম লীগ কোয়ালিশন ১০৪
মুসলীম লীগ ২০৬, ২১৩
মুসাফির ১১৬
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৪১, ১৪২
মেজর গোলাম হোসেন চৌধুরী ২৬৩, ২৬৭
মেজর নাইম ২৫৯, ২৬১, ২৬২
মেট ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৫, ৪৬, ৫৫, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৮, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৬, ১৩১, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৯, ২৩৫
মেডিকেল কলেজ ৩৭, ১৮৩, ২০৬, ২০৭, ২৪৩
মেডিকেল ডাইট ৩৭, ৩৮
মেহেরপুর ২৭৭
মোঃ ফজলুল করিম ২৮১
মোঃ রুহুল আমিন ২৮১
মোক্তার বাবু ১২৯
মোনায়েম খাঁ ৫৯, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৭
মোনেম খান ১৯২, ২২১, ২৩৫
মোমিন সাহেব ৫৬, ১১৩, ১৩৮, ২১৩, ২২৪, ২২৫, ২৪১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪
মোল্লা জালালউদ্দিন ১৬৬, ২০২, ২০৭, ২২২, ২২৭
মোস্তফা সারওয়ার ৫৬, ৬৮, ১১৩, ১৩৮, ১৯৪
মোহাম্মদ আলি মোক্তার ৮৮
মোহাম্মদ উল্লাহ ১৬৩
মোহাম্মদ সুলতান ২২৭
মৌলানা জনাব ওবায়দুল্লা ১৫১
মৌলানা সৈয়াদুর রহমান ২২২

য
যুক্তফ্রন্ট ১৩২, ১৬৮, ২২৬, ২২৭
যুক্তরাষ্ট্র ৭৬, ১০৩

র
রংপুর ৯৮, ৯৯, ১৯৫
রণেশ দাশগুপ্ত ১০৮, ২২৩
রণেশ মৈত্র ৮৫, ৯০, ১১৮, ১৩৮, ১৫৭, ১৬১
রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া ৬৫
রাইটার ২৮, ৩১, ৩৬, ৩৯
রাইটার দফা ৩১
রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ১৪২
রাওয়ালপিন্ডি ৯৯, ১১১, ১৩৪, ১৬৯, ২৭৩
রাজমাবাদের যুদ্ধ ১১১
রাজশাহী জেল ২১৩, ২২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৬
রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল ২৫২

রামকৃষ্ণ রায় ১৮০
রামললিত ১৬১
রাশিয়া ১১০, ১৬০, ১৬২
রাশিয়ার চিঠি ১৬৭
রাশেদ খান মেনন ২০২
রাশেদ মোশাররফ ৫৬, ৯৩, ১১৩, ১৩৭, ১৬৪, ১৭৩, ১৯৪
রাষ্ট্রভাষা ৭৩, ৭৪, ১৭৬, ২০৬, ২০৭, ২৭০
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ৬৫, ২১১
রাষ্ট্রভাষা বাংলা দিবস ২০৬
রীট পিটিশন ১৩৩, ১৫৮
রুহুল আমিন ২০২, ২১৩, ২৪১
রুহুল কুদ্দুস সিএস পি ২৫৩, ২৬০
রেজিমেন্ট ২৫৯, ২৬৫, ২৬৭, ২৭৭
রেণু ৯৩, ৯৪, ১২৬, ১৩৫, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৯, ১৭৩, ১৮০, ১৮১, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৩, ২২২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৪০, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪
রেফারেন্ডাম ২৭০
রেশনিং প্রথা ১৪৭
রেসকোর্স ময়দান ২০৬, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮
রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা ২৩৬
রেহানা ৯৩, ১৮৮, ১৯৪, ২৩৪, ২৪৭
রোজী জামাল ২৮০
র‌্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৪২

ল
লছমি ৯৪
লাঠি চার্জ ৪০, ৬৯, ৭২, ২০৬
লালবাগ ফোর্ট ১০৯
লাহোর ১৪০, ১৪১, ১৪২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২৩১, ২৩২, ২৪২, ২৪৬, ২৭১, ২৭২
লাহোর প্রস্তাব ১৪০, ১৪২, ২১৪, ২৩১, ২৩২
লিন্ডন বি জনসন ১০৩
লিয়াকত আলী খান ৪০
লুমুম্বা ৫৯
লেনিনবাদ ১৪৯
লেফটেন্যান্ট জাফর ইকবাল ২৫৬
লেফট্যানেন্ট ওয়াহিদ জাফর ২৫৭, ২৬০, ২৬১
লেফট্যানেন্ট রাজা নসরুল্লা আজাদ ২৬৪

শ
শয়তানের কল ৩৫, ৩৬
শরৎচন্দ্র ৮০
শহীদ দিবস ৯২, ২০৭
শহীদ মিনার ২০৭
শহীদুল্লা কায়সার ৬৩
শামসুল হক ৪০, ৫৮, ৬৮, ১১৩, ১১৪, ১৩৭, ২০২, ২০৬, ২৪৯
শায়েস্তা খান ১০৯
শাহজাহানপুর ২০২
শাহ মোয়াজ্জেম ২০২, ২১২, ২১৩, ২১৮, ২২৩, ২২৪, ২২৭, ২৩৫, ২৪০, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮
শাহাবুদ্দিন চৌধুরী ৫৬, ৬৬, ৬৮, ৮৩, ১১৩, ১৫২, ১৬৪, ১৭৩, ১৯৪
শেখ কামাল ২৮০
শেখ জামাল ২৮০
শেখ নাসের ৭৭, ৭৮, ২৮০
শেখ ফজলুল হক মণি ২০২, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২২৩, ২৩৫, ২৪০, ২৪১,

২৪৮, ২৬৩, ২৮০
শেখ মুজিবুর রহমান ৯২, ১২০, ১৯৯, ২৫১, ২৫৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২
শেখ মোহাম্মদ আলি ২৪৯
শেখ রাসেল ৯৩, ৯৪, ১৪৯, ১৫৯, ১৮৮, ১৯৪, ২০১, ২১০, ২১১, ২২১, ২৩৪, ২৪১, ২৪৬, ২৪৯, ২৮০
শেখ সাহেব ৫৮, ১৬৩, ২৫৪
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১১৯, ২১৩, ২৩১, ২৩২, ২৫৫
শ্রীহট্ট ৭৭
শ্রীহরি বিক্রম-আদিত্য ১১১

স

সত্যেন সেন ১০৮
সরদার মহম্মদ জাফরুল্লা ১৬১
সরদার শওকত হায়াৎ ১৬২
সর্বজনীন ভোটাধিকার ২৩৬
সর্বদলীয় ঐক্য ২২৬
সর্বদলীয় কনফারেন্স ১৪১
সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট ১৩২
সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২৭২
সর্বদলীয় সম্মেলন ১৪১
সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ ১৩৬
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ৬২, ৭২, ১৩০, ১৩৭, ২৪৫
সংশপ্তক ৬৩, ৬৪
সফি ২০২
সহিদ (তেজগাঁও) ২০২
সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ১৪৬, ২৩০, ২৩৩, ২৪৪
সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস ১০২, ১০৮
সামন্ততন্ত্র ১৮৯
সামন্তবাদ ১৮৯
সামারী কোর্ট ৭০
সালাউদ্দিন শেখ ১৬২
সাহাবুদ্দিন চৌধুরী ১০৫
সিআইএ ৯৯, ১০০
সিকম্যান ৩৬, ৩৭
সিকান্দার হায়াত ১৬১
সিনিয়ার ডিপুটি জেলার ১১২
সিভিল সাপ্লাই ২০৪
সিরাজউদ্দিন ২২৭, ২৪৯
সিরাজুল হোসেন খান ২১৫, ২২২
সিলেট ৩০, ৫৩, ৭৭, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৯৮, ১৮১, ১৮২, ১৯৪, ২১২, ২১৩, ২২৪, ২৩৩, ২৪৯, ২৫২, ২৭২
সিলেট গণভোট ৩০
সীমান্ত প্রদেশ ১২৪, ১৪১
সুকর্ণ ১৪৯
সুপারেনটেনডেন্ট ৩২, ৩৬, ৩৮, ৫৩, ৫৫, ২৫৫
সুলতানা কামাল ২৮০
সূর্য সেন ১৮০
সেলের পাগল ২০৩
সৈয়দ আলতাফ হোসেন ২১৫, ২২২
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৮৫, ২৩৮, ২৪২, ২৭৭
সৈয়দ মকসুদ ১৬২
সৈয়দ মজহারুল হক (বাকী) ২০৭
সৈয়দ শরীফুদ্দিন পীরজাদা ১৭৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৬২, ২৭৭, ২৭৮
সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ৭৬, ১৯১
সোসালিস্ট ব্লক ১০৪
স্টিম রোলার ১০৫
স্ট্রেচার ২০১
স্পিকার ৭৬, ১০৮, ১৩৪, ১৫৪

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ২০৮
স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ২৭১
স্বায়ত্তশাসন ৫৭, ৯২, ৯৯, ১২৫, ১৩২, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪১, ১৫৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২২৬, ২২৭, ২৩১, ২৩৬, ২৩৭, ২৬০, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩
স্যার মহম্মদ সফি ১৪২

হ

হাইফং ১৫৩, ১৫৪
হাওয়াই জাহাজ ১২৪
হাচিনা ১৪৯, ১৯৪, ২৪০, ২৪৬
হাজী হেলালউদ্দিন ১২০
হাজী মোহাম্মদ দানেশ ২১৫
হাতকড়ি ১৪৪
হাতিশালা ১০৯
হাতেম আলি খান ২১৫, ২২২
হানিফ খান ২২৩
হাফেজ মুছা ৫৬, ৬৮, ১১৩, ১৩৭, ১৪৬, ১৭৩, ১৯৪
হাবিবুল হক চৌধুরী ২৩৬
হারুনুর রশিদ ৫৬, ২৪৯
হালিম ১৪৩, ২০২, ২১৩, ২২৩
হাসেম মিয়া ১৩০
হেবিয়াস করপাস ৮৮, ১৭৪
হেলাল আহম্মদ শেখ ১৬২
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯৬, ১০৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮৯, ২৫৫, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪
হ্যানয় ১৫৩, ১৬০
হ্যারিকেন ৮৬, ১২২

A

Awami League ১২২, ২৩৮, ২৪২

C

Consortium Aid ১২২
Constitution ১৪২, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৬৯

E

East Pakistan's Case ৮৮

F

Federal principles ১৪২
Finance Minister ১২২

I

Indian Republic ১৪১

N

Nawabjada Nasrulla ২২৭

P

Pakistan ১২২, ১৮৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৮, ২৪২, ২৬৯, ২৭৬
Provincial Autonomy ১৪১

R

Reader's Digest ১৩৬, ১৬৭

S

Six Point Programme ১২২
Solitary Confinement ৮৩, ৯১, ১৫৮

U

United States of America ১৪১

কারাগারের রোজনামচা

শেখ মুজিবুর রহমান

“তাঁর জীবনের এত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। এ ডায়েরি পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার উৎস খুঁজে পাবে।

আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধে আব্বা লিখতে শুরু করেন। যতো বার জেলে গেছেন আমার মা খাতা কিনে জেলে পৌঁছে দিতেন আবার যখন মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে নিজে সযত্নে রেখে দিতেন। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা যদি না থাকতো তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে পারতাম না।”